অগ্নিযুগের চট্টগ্রাম ও আন্দামান স্মৃতি

কালীপদ চক্রবর্তী

অগ্নিযুগের চট্টগ্রাম ও আন্দামান স্মৃতি

কালীপদ চক্রবর্তী

জাতীয় সাহিত্য প্রকাশনী

প্রচ্ছদ : অশোক কর্মকার

প্রথম প্রকাশ : ফাল্গুন ১৩৯৫, ফেব্রুয়ারী ১৯৮৯

মূল্য : (শোভন) পঁচাত্তর টাকা / (সুলভ) পঞ্চাশ টাকা

প্রকাশক : মফিদুল হক, জাতীয় সাহিত্য প্রকাশনী, ৫১ পুরানা পল্টন, ঢাকা-১১০০

মুদ্রক : মোতাহার হোসেন, প্যাপিরাস প্রেস, ১৪২ আরামবাগ, ঢাকা-১০০০

সাম্রাজ্যবাদ-বিরোধী জাতীয় মুক্তি সংগ্রামে
নিবেদিত-প্রাণ বীর সংগ্রামী
বিপ্লবী কমরেড অমর সেনের
স্মৃতির উদ্দেশে

ভূমিকা

ভারতবর্ষের স্বাধীনতা সংগ্রামের রক্তাক্ত ইতিহাসে চট্টগ্রামের বিপ্লবীদের নেতৃত্বে ১৯৩০-এর এপ্রিলের বিস্ময়কর অসম-সাহসী সহিংস বৈপ্লবিক অভ্যুত্থানের ঘটনা এক সাড়া জাগানো ইতিহাস হয়ে আছে। সেদিন মাস্টারদা' সূর্য সেনের নেতৃত্বে যে অভ্যুত্থান সংঘটিত হয়েছিল তার উদ্দেশ্য ছিল, চট্টগ্রামের সরকারী অস্ত্রাগার দুটি দখল করে নিয়ে এবং অন্যান্য এলাকা থেকে চট্টগ্রামকে বিচ্ছিন্ন ও স্বাধীন করে ইংরেজদের বিরুদ্ধে সত্যকার যুদ্ধে অবতীর্ণ হওয়া। তাঁদের আশা ছিল, তাঁরা সফল হতে পারলে তারই অনুপ্রেরণায় সারা ভারতবর্ষ সশস্ত্র মুক্তি সংগ্রামে এগিয়ে যাবে এবং ফলে ব্রিটিশ বাহিনীর পক্ষে তার মোকাবেলা করা আর সম্ভব হবে না।

মাস্টারদা'র নেতৃত্বে তরুণ বিপ্লবীরা বহুদিনের পরিকল্পনা ও প্রস্তুতি নিয়ে ১৯৩০ সালের ১৮ এপ্রিল অতর্কিত আক্রমণে শহরের দুটি অস্ত্রাগার দখল করে নেন এবং টেলিফোন, টেলিগ্রাফ যোগাযোগ ব্যবস্থা বিপর্যস্ত করে ও রেল লাইন উপড়ে ফেলে চট্টগ্রামকে অন্যান্য জায়গা থেকে বিচ্ছিন্ন করে ফেলেন। ইণ্ডিয়ান রিপাবলিকান আর্মি প্রচারিত ইস্তাহারে চট্টগ্রামের স্বাধীনতা ঘোষণার সঙ্গে সঙ্গে যুবক ও ছাত্রদের ভারতীয় প্রজাতন্ত্রী বাহিনীতে যোগদানের আহ্বান জানানো হয়। ব্রিটিশ শাসন সাময়িকভাবে ভেঙ্গে পড়ে। সাম্রাজ্যবাদী ব্রিটিশের পতাকা নামিয়ে উত্তোলন করা হয় জাতীয় পতাকা।

কিন্তু প্রাথমিক বিপর্যয়ের ধাক্কা সামলে নিয়ে সরকারী বাহিনী ক্রমে সক্রিয় হয়ে ওঠে। ২২শে এপ্রিল তারিখে জালালাবাদ পাহাড়ে উভয়পক্ষের সশস্ত্র মোকাবেলা ঘটে। ঐ রক্তাক্ত যুদ্ধে মাস্টারদা'র নেতৃত্বে বিপ্লবীরা ১২ জন সহযোদ্ধার আত্মাহুতির বিনিময়ে দুঃসাহসী অসম লড়াইতে ইংরেজ শক্তির মোকাবেলা করে ভারতের সশস্ত্র বিপ্লবের ইতিহাসে এক অমর অধ্যায় রচনা করে গেছেন। যুব বিদ্রোহীরা অহেতুক রক্তক্ষয় এড়াতে শেষ পর্যন্ত পশ্চাদপসরণ করেছিলেন। কিন্তু এরপর ব্রিটিশ সরকার প্রচণ্ড দমননীতি চালানো সত্ত্বেও চট্টগ্রাম বিদ্রোহের যবনিকা টানতে তাদের আরও চার বছর চেষ্টা চালাতে হয়েছিল।

সেই দিনগুলিতে অল্প সংখ্যক নওজোয়ান মোকাবেলা করেছিলেন রাইফেল, বেয়নেট, মেশিনগানে সজ্জিত এক সংগঠিত নিয়মিত বাহিনীকে, অসম লড়াইতে শত্রুর নির্মম গুলির মুখে তাদের সহযোদ্ধা ঢেলেছেন অজস্র রক্ত। তাদের অনেকে বরণ করেছেন বীরের মৃত্যু; চির বিশ্রাম নিয়েছেন স্বদেশভূমির মাটিতে। যারা বেঁচে আছেন তাঁদের দাঁড় করানো হয়েছে আসামীর কাঠগড়ায়। লোহার গরাদে ঘেরা কুঠরিতে তাঁরা হয়েছেন এক যন্ত্রণাক্লিষ্ট জীবনের শিকার। এবং তাদের কাউকে কাউকে বরণ করে নিতে হয়েছে যাবজ্জীবন নির্বাসন দণ্ড কিংবা জীবনের শেষ মুহূর্তগুলো তাদের কেটেছে কারাপ্রকোষ্ঠে, ঘাতকের প্রতীক্ষায়।

স্বদেশভূমির এই সব বীর সন্তানেরা সাম্রাজ্যবাদী থাবা থেকে মাতৃভূমির মুক্তির জন্যে লড়াই করেছেন। শত্রুর পরিবেষ্টনের ভেতরে থেকে, প্রতিটি মুহূর্তে শত্রুর হামলার আশঙ্কায় সজাগ উৎকণ্ঠায় তাঁদের এগুতে হয়েছে। প্রতিটি পদক্ষেপের সামনে ছিল গুরুতর বিপদ, এমন কি মৃত্যু। এবং তা' সত্ত্বেও অনেকেই নিঃশঙ্কচিত্তে গুলির সামনে বুক পেতে দিয়েছেন, প্রাণ-শক্তিতে ভরপুর দেহ হয়েছে বুলেট জর্জরিত, রক্তাপ্লুত।

যাঁরা মৃত্যুকে এড়াতে পেরেছেন সৌভাগ্যক্রমে, তাঁদেরকে ধরার জন্য শত্রু তাড়া করে ফিরেছে। তাঁরা শত্রুকে এড়িয়ে গোপন তৎপরতায় সামিল থেকেছেন, এক সময় ধরা পড়ে নির্যাতীত হয়েছেন। কিন্তু যেখানেই থাকুন না কেন, স্বদেশভূমির মুক্তিস্বপ্ন ও মুক্তিপণ তাদেরকে সর্বদা বিভোর করে রেখেছে।

আমাদের জীবনে প্রোজ্জ্বল ও অনুপ্রেরণাময় হয়ে আছে তাঁদের দেশ-প্রেম, ত্যাগব্রত, সংগ্রামশীলতা এবং সুদৃঢ়, অনমনীয় মানস ও চিত্রময় বীর-কীর্তি।

যে-সব বীর নওজোয়ান চট্টগ্রাম যুব-বিদ্রোহের ইতিহাস-গাথা রচনা করেছিলেন তাঁদেরই একজন হলেন এ-কালের প্রবীণ বিপ্লবী কালীপদ চক্রবর্তী। কিশোর বয়সেই তিনি ব্রিটিশ বিরোধী স্বাধীনতা আন্দোলনে সামিল হয়েছিলেন। চট্টগ্রাম অভ্যুত্থানের কার্যক্রমের অংশ হিসেবে তিনি চট্টগ্রাম টেলিফোন এক্সচেঞ্জ বিকল অপারেশনে অংশ নিয়েছিলেন। অস্ত্রাগার দখল অভিযানে তিনি ছিলেন অস্ত্র ও বিস্ফোরক সামগ্রী তত্ত্বাবধানের দায়িত্বে। ঐতিহাসিক জালালাবাদ যুদ্ধেও তিনি অসীম সাহস ও দৃঢ় চিত্তে ইংরেজদের মোকাবেলায় অংশ নিয়েছিলেন। পরে মাস্টারদা' সূর্য সেনের পরিকল্পনা ও নির্দেশ অনুসারে সহযোদ্ধা রামকৃষ্ণ বিশ্বাসের সঙ্গে চাঁদপুর স্টেশনে বাংলার পুলিশ প্রধান ক্যাপ্টেন ক্রেইগ হত্যার অপারেশনে অংশ নেন এবং কুয়াশাচ্ছন্ন ভোরে ক্রেইগ মনে করে ভুলক্রমে রেলওয়ে ইন্সপেক্টর

তারিণী মুখার্জীকে গুলি করে মারেন। পরে চট্টগ্রাম ফেরার পথে রামকৃষ্ণ বিশ্বাস ও তিনি পুলিশের হাতে ধরা পড়েন। তাঁকে নির্বাসন দণ্ড দিয়ে আন্দামান সেলুলার বন্দীশিবিরে পাঠিয়ে দেওয়া হয়।

১৯৩৩ সালে আন্দামান সেলুলার জেলের বন্দীরা তাঁদের কারাকুঠরি জীবনের নিরন্তর দুঃসহ যন্ত্রণা কিছুটা লাঘব করার দাবিতে যে ঐতিহাসিক আন্দামান অনশন সংঘটিত করেন, কালীপদ চক্রবর্তী ছিলেন সেই আন্দোলনের একজন অগ্রণী সৈনিক।

তা ছাড়া, সেলুলার জেলে রাজনৈতিক পাঠচক্র ও বিপ্লবী বিশ্ববিদ্যালয় গড়ে ওঠার প্রক্রিয়ার ভেতর দিয়ে রাজবন্দীদের জীবনে সন্ত্রাসী বিপ্লববাদ থেকে শ্রমিক শ্রেণীর আন্তর্জাতিক কমিউনিস্ট মতাদর্শগত বিপ্লববাদে উত্তরণের যে অভাবিতপূর্ব অধ্যায় রচিত হয়েছিল কালীপদ চক্রবর্তী ছিলেন সেই অধ্যায়েরও একজন অগ্রণী বিপ্লবী কণ্ঠস্বর। কারাজীবন থেকে মুক্তি লাভের পরেও তিনি জনগণের স্বাধীনতা ও মুক্তির আন্দোলন সংগ্রামে অংশ নিয়েছেন, এবারে নব উত্তরণের মধ্য দিয়ে সন্ত্রাসী বিপ্লববাদ পরিত্যাগ করে এবং কমিউনিস্ট বিপ্লবী হিসেবে।

ছিপছিপে চেহারার শান্ত, বিনয়ী, সদা হাস্যোজ্জ্বল কালীপদ চক্রবর্তী তার চিন্তা, কাজ ও প্রতিজ্ঞায় সবসময় সকলকে মোহিত করেছেন। কবি সুকান্ত ভট্টাচার্য কলকাতায় পার্ক স্ট্রিট-এর রেড এড-কিওর হোমে রোগশয্যায় থাকাকালে সদ্য কারামুক্ত বিপ্লবীদের সঙ্গে কালীপদ চক্রবর্তীর সাহচর্যে এসেছিলেন। কালীপদ চক্রবর্তীর সাহচর্য যে তাঁকে কতটা মোহিত করেছিল তার উল্লেখ আছে সে সময়ে লেখা তাঁর একটি চিঠিতে। ৩রা অক্টোবর ১৯৪৬ সালে মাসতুতো ভাই ও বন্ধু ভূপেন ভট্টাচার্যকে লেখা এক চিঠিতে তিনি লিখেছিলেন, "আমি তোকে ডেকেছিলুম শুধুমাত্র তোর সান্নিধ্য পেতে নয় সদ্যমুক্ত চট্টগ্রাম অস্ত্রাগার লুণ্ঠনের বীর কালী চক্রবর্তীর সঙ্গে তোর আলাপ করিয়ে দেবার জন্যে। শিশুর মতো সরল ঐ লোকটির সঙ্গে পরিচয় তোর পক্ষে আনন্দের হত। আমার সঙ্গে তো ওঁর রীতিমত বন্ধুত্বই হয়ে গেছে। বাস্তবিক এইসব বীরদের প্রায় প্রত্যেকেই শিশুর মতো হাসি-খুশি, সরল, আমোদ প্রিয়।"

দেশ বিভাগের পর কমরেড কালীপদ চক্রবর্তী পূর্ব বাংলার জনগণের মুক্তির লক্ষ্যে গণতন্ত্র ও সমাজতন্ত্রের জন্য সংগ্রামে আত্মনিবেদন করেন, অংশ নেন স্বৈরাচার সাম্প্রদায়িকতা বিরোধী সংগ্রামে। প্রগতিশীল আন্দোলন সংগ্রামে অংশ নেওয়ার জন্য পাকিস্তানী স্বৈর ও জঙ্গি শাসকদের হাতে তাঁকে বেশ কয়েকবার কারাবরণ করতে হয়, যেতে হয় আত্মগোপনে। বাংলাদেশের স্বাধীনতা সংগ্রাম ও স্বাধীনতা পরবর্তী পুনর্গঠনের কাজেও তাঁর সক্রিয়

ভূমিকা ছিল।

দীর্ঘদিনের আন্দোলন সংগ্রাম-জনিত চাপ ও পরিশ্রম বিশেষ করে কারাভোগ ও নির্যাতন হয়তো তাঁর স্বাস্থ্যের উপর নেতিবাচক প্রভাব ফেলে থাকবে। তাই নানা রোগে ভুগে তিনি দুর্বল হয়ে পড়েছেন, প্রচণ্ড অর্থকষ্ট, ও প্রতিকূল পরিবেশ এবং বাস্তুভিটা দখলের জন্য স্বার্থলোলুপ গোষ্ঠীর চাপ তাকে বিব্রতকর অবস্থায় ফেলেছে কিন্তু এসবসত্ত্বেও তিনি মনোবল হারান নি। তাঁর সমসাময়িক ও পরবর্তীকালের অনেক রাজনীতি-বিদের পদস্খলন ঘটেছে কিন্তু মানবমুক্তির পথ সমাজতন্ত্রে তাঁর আস্থা ও বিশ্বাস এখনও ধ্রুবতারার মতো অটল।

বিপ্লবী কালীপদ চক্রবর্তী এই গ্রন্থে তাঁর কৈশোর ও যৌবনের এক চমকপ্রদ অধ্যায়ের স্মৃতিচারণ করেছেন। এতে রয়েছে চট্টগ্রাম অভ্যুত্থান ও জেলজীবনের দিনগুলোর উদ্দীপনা উত্তেজনা, দ্বিধা-সংকট, সাফল্য ব্যর্থতা ও মনোজাগতিক রূপান্তরের উজ্জ্বল আলেখ্য; এতে রয়েছে সেইসব সংগ্রামী বিপ্লবী সহযোদ্ধাদের মুক্তি স্বপ্ন ও সংগ্রামের বীরত্ব কাহিনী, যারা ব্রিটিশ শাসকদের বিরুদ্ধে গৌরবময় স্বাধীনতা সংগ্রামে সামিল হয়েছিলেন, শত নিপীড়নেও মাথা নোয়ান নি এবং প্রস্তুত ছিলেন জনগণের মুক্তির জন্য নিজেদের আত্মদানে। এতে আরও রয়েছে সেলুলার বন্দীশিবিরে নির্যাতন নিপীড়নের মুখে দুর্বার প্রতিরোধের কাহিনী এবং সন্ত্রাসী বিপ্লববাদ থেকে সাম্যবাদী ভাবধারায় মানসরূপান্তরের সেই সব দিনগুলির খণ্ডচিত্র। বস্তুত: এই বইয়ের পাতার পর পাতা জুড়ে আছে এক তরুণ বিপ্লবীর সংগ্রাম-মুখর জীবনের উত্তাল রোমাঞ্চকর স্মৃতিময় দিনগুলো। স্বাধীনতা-হীনতা থেকে মুক্তির আকাঙ্ক্ষা যে কিশোরটিকে দুর্বার হৃদয়াবেগে ইণ্ডিয়ান রিপাবলিকান আর্মির পতাকাতলে সমবেত হয়ে পরাক্রমশালী ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদের নিপীড়ক শক্তির বিরুদ্ধে এক অসম লড়াইয়ে অংশ গ্রহণে উদ্বুদ্ধ করেছিল এ বইটি তাঁরই জীবনের স্বপ্নসাধ, সুকঠিন বাস্তবতা ও অতুলনীয় সংগ্রামের এক অকপট স্মৃতিচিত্র।

এরকম একটি বইয়ের সম্পাদনা ও ভূমিকা লেখার সুযোগ পেয়ে আমি সৌভাগ্যবান ও আনন্দিত। ইতিহাস যেখানে কারো জীবন-কাহিনীর ভূমিকা লেখা ও সম্পাদনার দায়িত্ব নিজের হাতে তুলে নেয় সেখানে স্মৃতি-কথা সম্পাদকের ভূমিকা নিতান্তই তুচ্ছাতিতুচ্ছ ব্যাপার। এই অতি তুচ্ছ কাজটুকু করার সুযোগ পেয়ে আমি অত্যন্ত কৃতজ্ঞ ও ধন্য।

চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয় কলেজ, চট্টগ্রাম
১৪-১-১৯৮৯

মাহবুবুল হক

মুখবন্ধ

'অগ্নিযুগের চট্টগ্রাম ও আন্দামান স্মৃতি' নামে আমার এই লেখাটির প্রথমাংশ ১৯৬৪ সালে 'অগ্নিযুগের স্মৃতি' নামে প্রথম প্রকাশিত হয়। শ্রমিক শ্রেণীর সাপ্তাহিক পত্রিকা 'প্রভাতী' কাগজে তা সাতাশ সংখ্যা পর্যন্ত ধারাবাহিক-ভাবে প্রকাশিত হয়েছিল। পরে তদানীন্তন পাকিস্তান সরকার ঐ সাপ্তা-হিকীটির প্রকাশনা বন্ধ করে দেয়। ফলে লেখাটির বাকি অংশ আর প্রকাশিত হতে পারে নি।

এরপর দীর্ঘদিন পাণ্ডুলিপিটি পড়েছিল ছাপার অপেক্ষায়। নানা জনের তাগিদ সত্ত্বেও বইটি প্রকাশ করা সম্ভব হয় নি। প্রায় পনেরো বছর পর ১৯৭০ সালের দিকে চট্টগ্রামের একটি বই বিপণন ও প্রকাশনা সংস্থা 'সৃজনী'র স্বত্বাধিকারী বখতেয়ার নোথানী ও অমল নাথের তাগিদ ও উৎসাহে পাণ্ডুলিপিটি প্রকাশের উদ্যোগ নেওয়া হয়েছিল। কিন্তু ইয়াহিয়া সরকারের বর্বর আক্রমণের মুখে তা প্রেসে দেওয়া অসম্ভব হয়ে ওঠে। এরপর শুরু হয় মুক্তিযুদ্ধ। এবং সে সময়ে ধারণা করা হয়েছিল যে পাণ্ডু-লিপিটি চিরতরে হারিয়ে গেছে।

বানান সংশোধন ও ভাষাগত পরিমার্জনার জন্য আমার স্নেহভাজন সুহৃদ মাহবুবুল হককে এটি দেওয়া হয়েছিল। মুক্তিযুদ্ধে অংশগ্রহণের জন্য তিনি চট্টগ্রাম ত্যাগ করেন। পাক-বাহিনীর হামলার মুখে তাদের পরিবারের সকলকেই নিজেদের বাসস্থান ত্যাগ করতে হয়। কিন্তু সৌভাগ্যবশত স্বাধীনতার পর পাণ্ডুলিপিটি সযত্নে রক্ষিত অবস্থায় পাওয়া যায়। এ জন্যে আমি ঐ পরিবারের সদস্যবৃন্দ বিশেষ করে মাহবুবুল হকের মা হাজেরা খাতুনের কাছে কৃতজ্ঞ। কারণ, দখলদার পাক-বাহিনীর অত্যাচারের মুখে যতবারই তাঁরা বাসা বদল করেছেন ততবারই কিছু মূল্যবান বইয়ের সঙ্গে এই পাণ্ডুলিপি রক্ষা করার জন্যে তাঁর ভাবনা ও প্রয়াসের অন্ত ছিল না।

আমার এই লেখাটির পেছনে অকৃত্রিম সুহৃদ ও চট্টগ্রামের বিপ্লবী কমিউনিস্ট নেতা কমরেড অমর সেনের উৎসাহ ও প্রেরণা ছিল সবচেয়ে বেশি। তাঁর প্রেরণা ছাড়া এটি আদৌ লেখা হতো কিনা সন্দেহ। এই

লেখাটি সম্পর্কে সে সময়ে 'প্রভাতী' পত্রিকায় যে সম্পাদকীয় ভূমিকা লেখা হয়েছিল তা আত্মগোপন অবস্থায় তিনিই লিখেছিলেন।

লেখাটির দ্বিতীয় অংশ অর্থাৎ আন্দামান পর্ব আমি পরবর্তীকালে বিশদভাবে লিখতে চেষ্টা করেছি। 'আন্দামান মৈত্রী সংঘ' উদ্যোগ নিয়ে 'মুক্তিতীর্থ আন্দামান' নামে যে সংকলনটি প্রকাশ করেন তা থেকে কিছু কিছু তথ্য নিয়ে আমি আন্দামান প্রসঙ্গটুকু আরও একটু সমৃদ্ধ করতে চেষ্টা করেছি। আমি সবিনয়ে তাঁদের কাছে আমার ঋণ স্বীকার করছি।

এ বইখানা শুধু আমাদের দেশের তরুণ-তরুণীদের জন্যে নয়, সবার জন্যেই লেখা। কয়েক যুগ আগে হোঁচট খেতে খেতে কীভাবে সন্ত্রাসমূলক বিপ্লববাদ থেকে সমাজতন্ত্রের ভাবধারায় আমার উত্তরণ ঘটলো, তা এতে লিপিবদ্ধ করা হয়েছে। আন্দামান জেল-জীবনে আমার চেতনায় যে বিপ্লব ঘটেছিল, সন্ত্রাসমূলক বিপ্লববাদ পরিত্যাগ করে নতুন মতাদর্শ সমাজতন্ত্রের ভাবধারায় আন্দামানের রাজনৈতিক বন্দীরা কীভাবে উদ্বুদ্ধ হয়ে উঠেছিলেন—সেই ঐতিহাসিক পর্যায়টুকু দেশবাসীর সামনে তুলে ধরবার আগ্রহটুকু আমি সম্বরণ করতে পারি নি।

এই বইটিতে বর্ণিত ঘটনাবলির সঙ্গে প্রত্যক্ষভাবে জড়িত ছিলাম বলে বইটিতে খানিকটা আমিত্বভাব ফুটে ওঠার ঝুঁকি রয়েছে। কিন্তু ঐ আমিত্বটুকু বাদ দিয়ে আমার পক্ষে এ লেখা তৈরি করা ছিল খুব কঠিন ব্যাপার। তাই বইটিতে এ ধরনের ত্রুটি থেকে গেল। আশা করি, বিষয়টি অনুধাবন করে সহৃদয় পাঠক আমাকে ক্ষমা করবেন।

এ প্রসঙ্গে সকলের কাছে আমার একটি বিনম্র নিবেদন আছে। আমি সাহিত্যিক বা লেখক নই। শুধু সহজ কথায় আমি বাস্তব ঘটনাকে তুলে ধরার চেষ্টা করেছি মাত্র। চট্টগ্রাম যুব বিদ্রোহ ও তার পরের ঘটনাবলি বাস্তবে যেমন দেখেছি, যেমন জেনেছি, তাকেই সাদামাটাভাবে তুলে ধরতে চেষ্টা করেছি। তাছাড়া, যাঁরা ঐ সব ঘটনার সঙ্গে প্রত্যক্ষভাবে জড়িত ছিলেন তাঁদের সবার সঠিক ও যথার্থ মূল্যায়ন করাও আমার পক্ষে সম্ভব হয় নি। কিন্তু তাই বলে আমার অনুভূতি, ধারণা ও অভিমত যে আমি খোলাখুলিভাবে ব্যক্ত করতে দ্বিধা করি নি তা নয়। তাই স্বাভাবিকভাবেই নানা দোষ ত্রুটি থাকতে পারে। আমার কোন কোন অভিমত কারো কারো পছন্দ নাও হতে পারে। সে জন্যে সবিনয় অনুরোধ—আমার সীমাবদ্ধতা বিবেচনায় রেখে সবাই যেন এ লেখাটি সহানুভূতির সঙ্গে দেখেন।

এ বইটি যে শেষ পর্যন্ত প্রকাশিত হতে পারলো, তার আনন্দ ভাষায় প্রকাশ করার ক্ষমতা আমার নেই। এর জন্যে আমি জাতীয় সাহিত্য

প্রকাশনীর কর্ণধার জনাব মফিজুল হকের কাছে অত্যন্ত কৃতজ্ঞ। তিনি নিজে এসে এ বই প্রকাশে তাঁর আগ্রহ ব্যক্ত না করলে এবং প্রকাশনার সকল দায়িত্ব সানন্দে মাথায় তুলে না নিলে এটি এভাবে প্রকাশিত হত কিনা সন্দেহ।

আমার গ্রন্থের পাণ্ডুলিপির বিভিন্ন অংশ বিভিন্ন সময়ে লেখা। যখনই সময় পেয়েছি তাতে নানা কিছু যোগ করেছি। ফলে লেখাটি হয়ে পড়েছিল বিক্ষিপ্ত, অবিন্যস্ত ও অপরিমার্জিত। সেই বিশৃঙ্খল, খাপছাড়া ও সঙ্গতিসূত্রহীন পাণ্ডুলিপিটি যথেষ্ট শ্রম ও সময় দিয়ে সম্পাদনা করেছেন স্নেহভাজন অধ্যাপক মাহবুবুল হক। স্মৃতি-কাহিনীর বিভিন্ন অংশে তিনি শিরোনাম ও উপ-শিরোনাম বসিয়ে এবং প্রয়োজন মত পরিমার্জনা ও সংশোধন করে বইটিকে বেশ আকর্ষণীয় করে তুলেছেন। তাঁর সম্পাদনার গুণেই বইটি এখন আমার কাছেই বেশ ভালো লাগছে। এজন্যে আমি তাঁর কাছে ঋণী। অবশ্য, এ বইটি প্রকাশের ব্যাপারে তাঁর নিজের উদ্যোগ-তাগিদও কম ছিল না। আমার বিশ্বাস, এ বইয়ের প্রকাশনা আমার মত তাঁর জন্যও অত্যন্ত আনন্দের।

প্রকাশনার ব্যাপারে সিদ্ধান্ত হবার পর পাণ্ডুলিপিটি আনুপূর্বিক পাঠ করে সম্পাদনার ব্যাপারে মূল্যবান পরামর্শ ও মতামত দিয়ে সাহায্য করেছেন ডঃ মমতাজ উদ্দিন পাটোয়ারী ও ডঃ জাহাঙ্গীর চৌধুরী। বিভিন্নভাবে সাহায্য করেছেন ডাঃ কামাল এ. খান। এই সুযোগে আমি তাঁদের কাছেও ঋণ স্বীকার করছি। স্নেহভাজন মৃদুল সেন, প্রদীপ দেওয়ানজী, আশীষ সেন ও খোকন কায়সার এ বই প্রকাশনার ব্যাপারে নানাভাবে আমাকে সাহায্য করেছেন। এদেরকেও আমি আন্তরিক ধন্যবাদ ও শুভেচ্ছা জানাই।

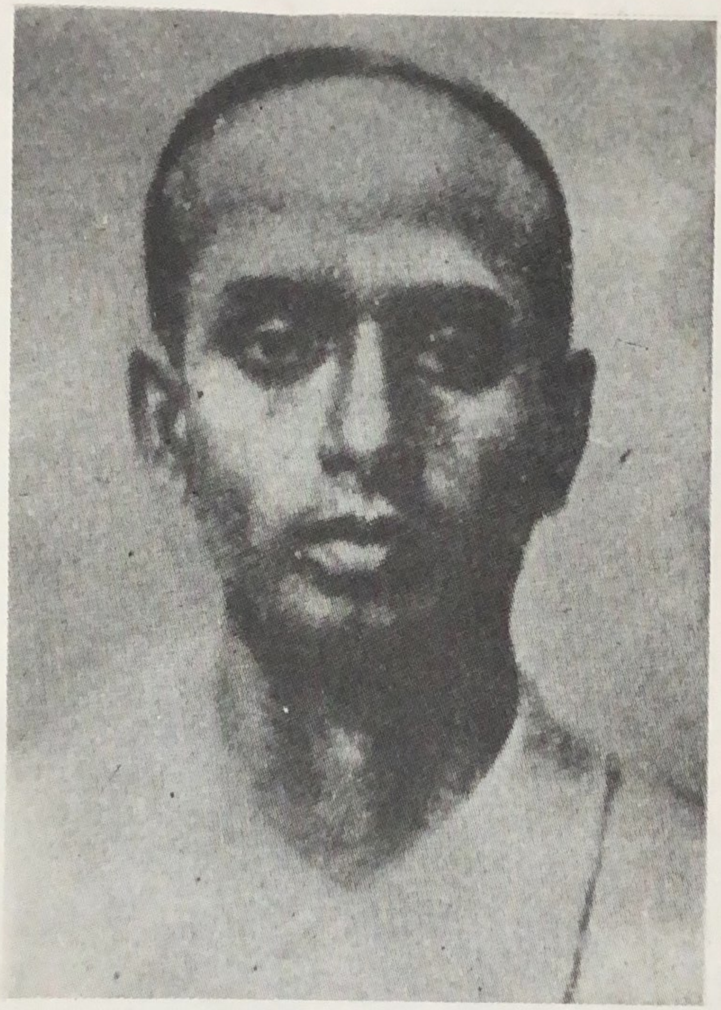
সবশেষে আরো একটি নিবেদন, স্মৃতিচারণমূলক এ লেখায় স্মৃতির দুর্বলতায় যদি অজ্ঞাতে কোন ভুল তথ্য পরিবেশিত হয়ে থাকে তবে অনুগ্রহ করে তা আমাকে জানানোর অনুরোধ করি। সম্ভব হলে তা ভবিষ্যতে সংশোধনের চেষ্টা করবো।

আজকের দিনটি আমার জীবনে এক গভীর স্মৃতি বিজড়িত দিন। এই দিনে মাস্টার দা সূর্য সেন স্বাধীনতার জন্য জীবন উৎসর্গ করেছিলেন। তার মৃত্যুর ৫৪তম বার্ষিকীতে তাঁর প্রতি গভীর শ্রদ্ধা জানাই।

১২ জানুয়ারী ১৯৮৯ — কালীপদ চক্রবর্তী

বৃন্দাবন আখড়া, চট্টগ্রাম

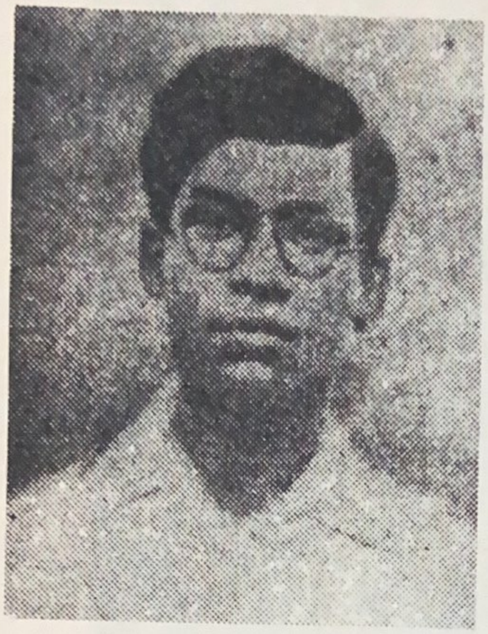
সূচীপত্র



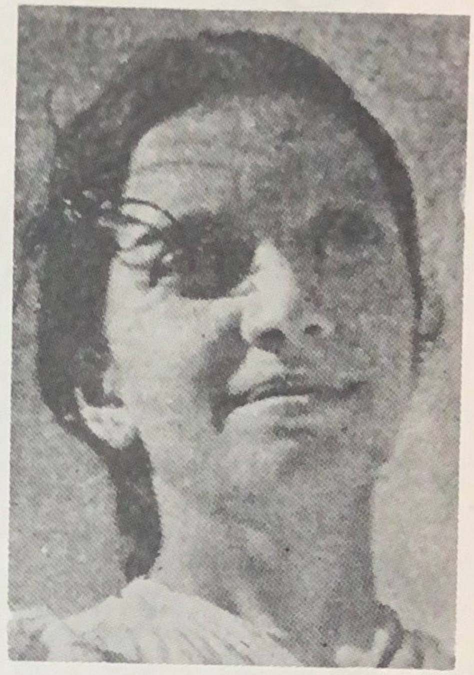
মাস্টারদা' সূর্য সেন



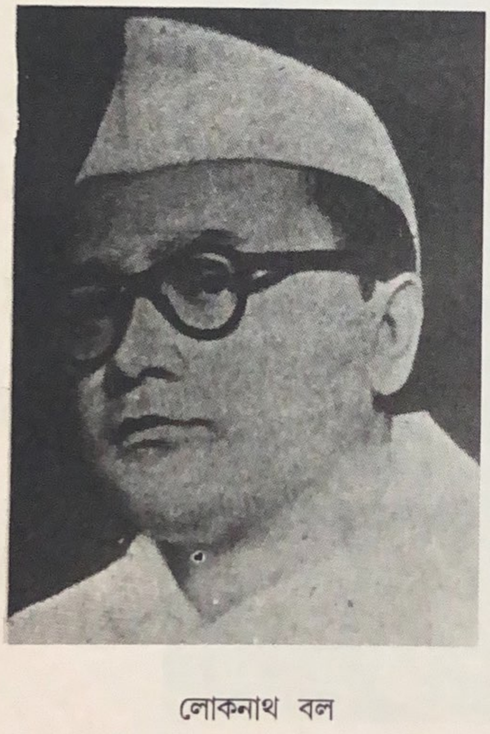
প্রীতিলতা ওয়াদ্দেদার



রামকৃষ্ণ বিশ্বাস



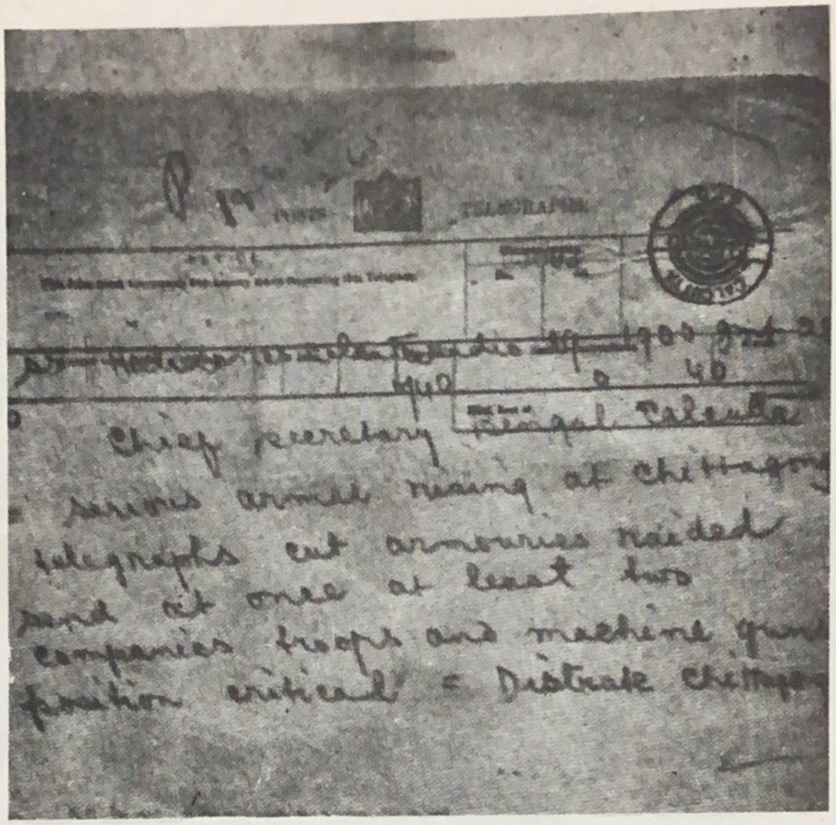
কল্পনা দত্ত



লোকনাথ বল



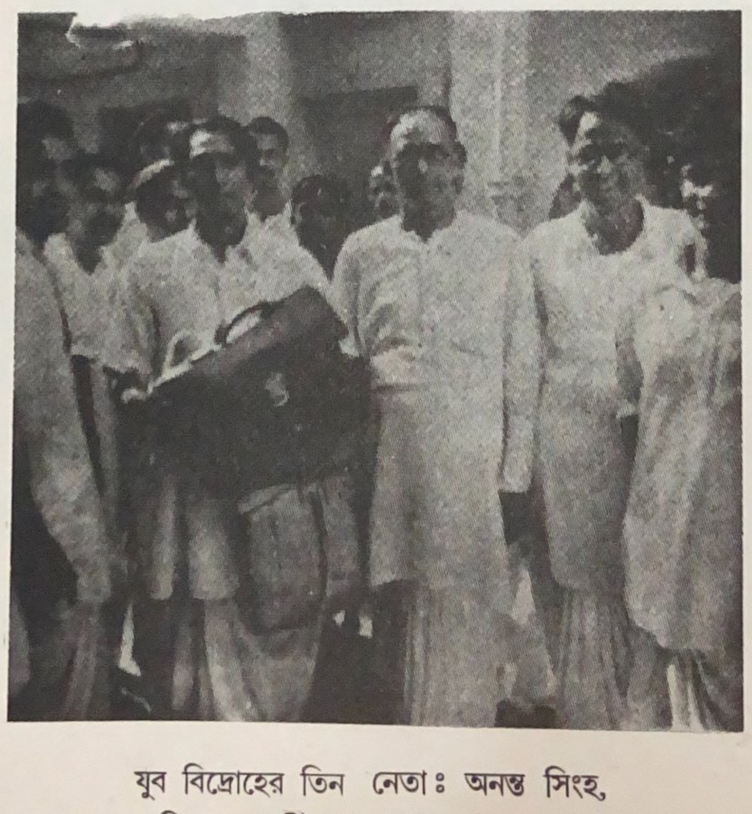
নির্মল সেন



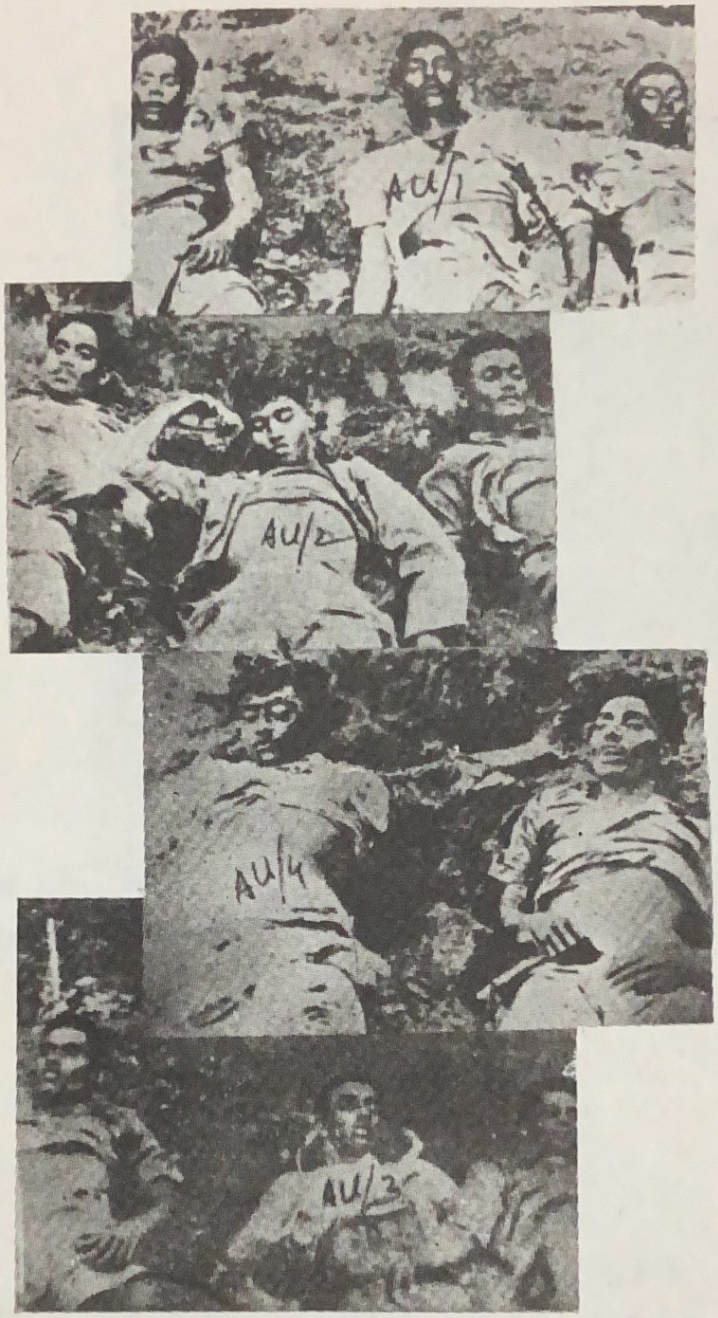
TELEGRAPHS

Chief Secretary Bengal Calcutta
serious armed rising at Chittagong
telegraphs cut armouries raided
send at once at least two
companies troops and machine guns
position critical = District Chittag

অস্ত্রাগার অভিযানের বার্তাবহ চট্টগ্রামের ম্যাজিস্ট্রেটের টেলিগ্রাম

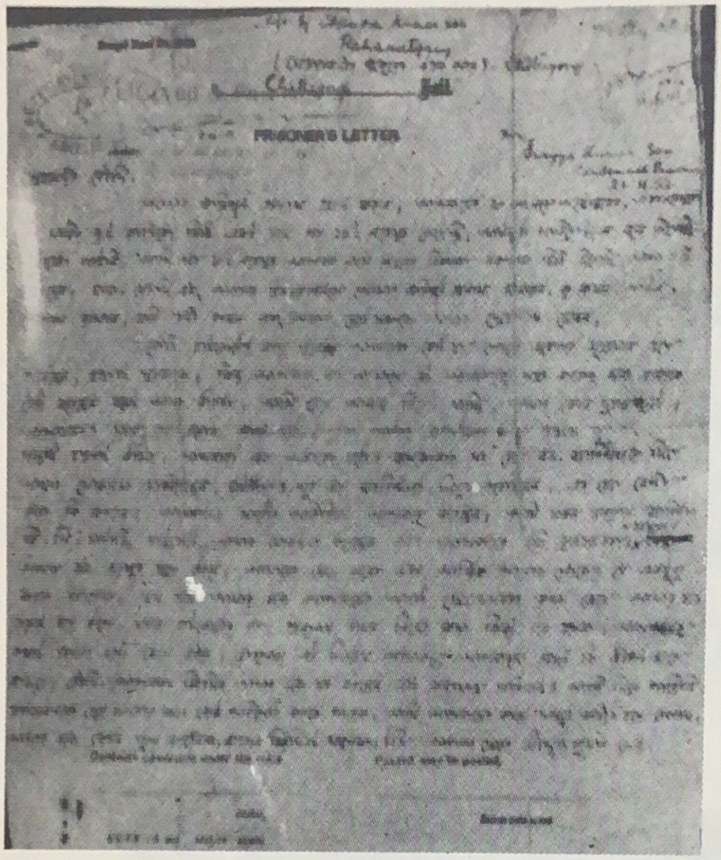


যুব বিদ্রোহের তিন নেতাঃ অনন্ত সিংহ,
অম্বিকা চক্রবর্তী ও গণেশ ঘোষ



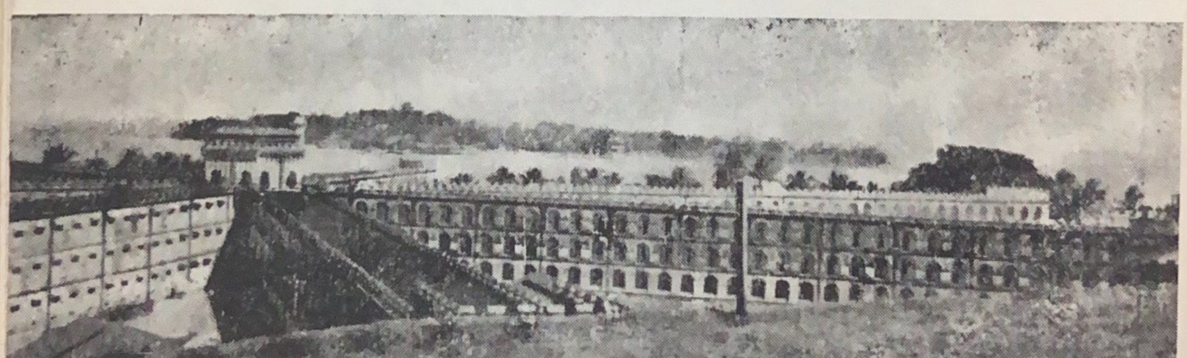
জালালাবাদের শহীদঃ উপরে বাঁ দিক থেকে

১। জীতেন দাশগুপ্ত, মধু দত্ত, পুলিন ঘোষ
২। নরেশ রায়, ত্রিপুরা সেন, বিধু ভট্টাচার্য
৩। হরিগোপাল বল (টেগরা), মতি কানুনগৌর
৪। প্রভাস বল. শশাঙ্ক দত্ত. নির্মল লালা



PRISONER'S LETTER

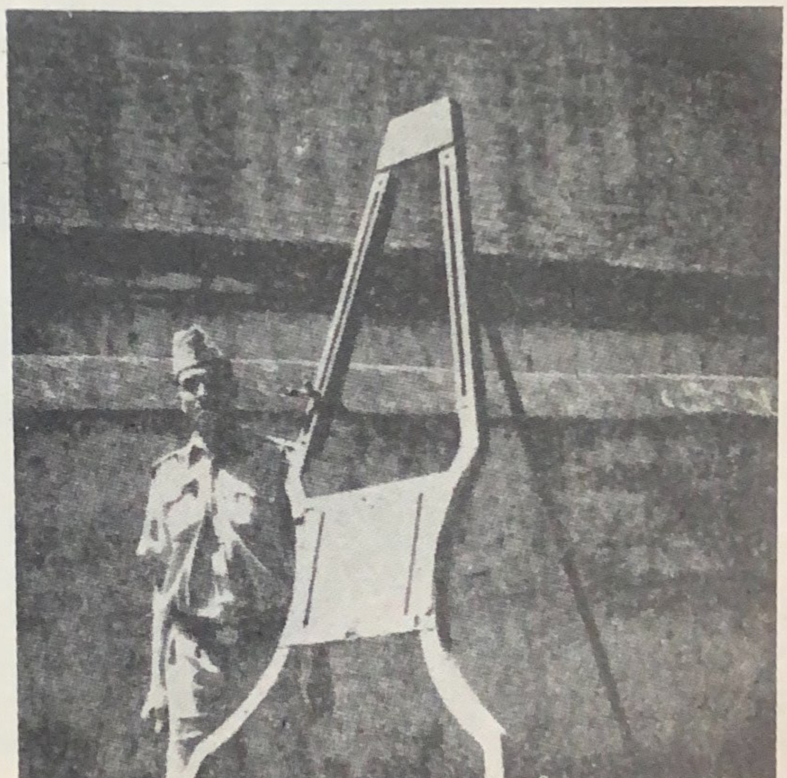
জেল থেকে
লেখা সূর্য সেনের চিঠি



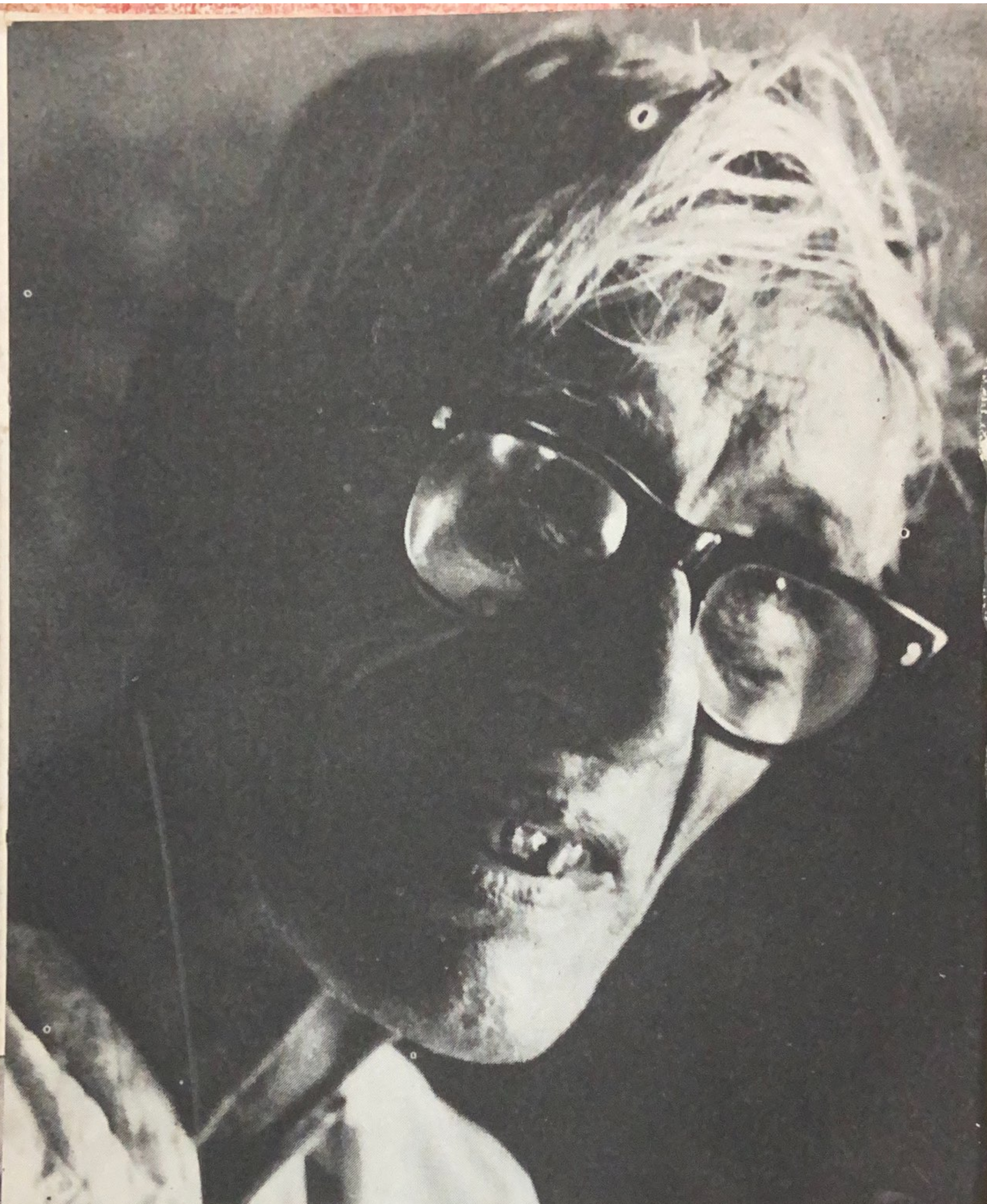
সাত-মহলা সেলুলার জেল



মহাবীর সিং



দণ্ডিতদের
চাবুক-মারার বেদী



কালীপদ চক্রবর্তী

এক

সেই সময়

১৯১৪ সালের রক্তক্ষরা প্রথম সাম্রাজ্যবাদী বিশ্বযুদ্ধ এসে পৌঁছেছে তার শেষ পাদে। ভারতবর্ষে তখন সর্বাত্মক সংকট মাথাচাড়া দিয়ে উঠেছে, বিক্ষোভ দানা বাঁধতে শুরু করেছে। তার প্রতিফলন ঘটলো পাঞ্জাবে গদর পার্টির অভ্যুদয়ে, সৈন্যদলে বিদ্রোহ সংঘটিত হওয়ার ভেতর দিয়ে, কংগ্রেসে নরম ও চরমপন্থীদের পারস্পরিক সমঝোতা এবং কংগ্রেস ও মুসলিম লীগের মধ্যে গুরুত্বপূর্ণ এক চুক্তির মাধ্যমে। তার প্রতিফলন ঘটেছিল তিলকের জোরদার 'হোম রুল' আন্দোলন এগিয়ে নেয়ার প্রয়াসে।

এর কিছুকাল পরই ১৯১৭ সালে রাশিয়ায় সর্বহারা বিপ্লব সংঘটিত হল। সেই বিপ্লবী ঝঞ্ঝার আঘাতে সাম্রাজ্যবাদী গোষ্ঠী হল আতঙ্কিত। বৃটিশ তাড়াহুড়ো করে ভারতকে একটা 'সংস্কার' দেবে বলে ঘোষণা করে বসলো। আরও কিছুদিন পর পার্লামেন্টে এই ঘোষণা করা হলো যে, ভারতে দায়িত্বশীল সরকার গঠনের উদ্দেশ্যে স্বায়ত্তশাসিত প্রতিষ্ঠানগুলোর ক্রমবিকাশ সাধনই হল ব্রিটিশ সরকারের একমাত্র লক্ষ্য। সেই লক্ষ্য বাস্তবায়িত করার উদ্দেশ্যে ভারতকে এক দ্বৈত-শাসনতন্ত্র দেওয়া হবে বলে পার্লামেন্টে ঘোষণা করা হল। পার্লামেন্টে এ সংক্রান্ত বিল পাশ হলে তিলক এর বিরুদ্ধে প্রতিবাদ করলেন। বিলটিকে আখ্যায়িত করলেন 'সূর্যহীন প্রভাত' বলে।

সাম্রাজ্যবাদী ব্রিটিশ একদিকে দেখালো সংস্কারের প্রলোভন, আবার অন্যদিকে শুরু করলো আন্দোলন দমন করবার দমনমূলক ব্যবস্থার আয়োজন। কিন্তু ভারতের পরিস্থিতি তখন সম্পূর্ণ বদলে গেছে, সংস্কারের প্রলোভন ভারতকে রুখতে পারলো না।

১৯১৯ সালের প্রারম্ভে রাউলাট আইন পাশ হল। ভারতবাসী এই বিলটিকে অভিহিত করলো কালা বিল। এই আইনের বলে পুলিশ ও আমলাতন্ত্র যাকে যতদিন খুশি বন্দী করে রাখার ক্ষমতা পেল। তাই

বিলটিকে রুখবার জন্য দিল্লীর জনসাধারণ ১৩ই মার্চ হরতাল পালন করলেন। বিলের বিরুদ্ধে ৬ই এপ্রিল সাধারণ হরতাল পালনের ডাক দিলেন গান্ধীজী। জনতাকে শান্ত রাখার জন্য কংগ্রেস নেতৃবর্গ গান্ধীজীকে আমন্ত্রণ জানালেন দিল্লীতে। কিন্তু দিল্লীর পথেই তাঁকে গ্রেপ্তার করা হল। ফলে জনসাধারণ হয়ে উঠলো আরও বিক্ষুব্ধ। রাউলাট অ্যাক্ট ও পুলিশের অন্যায়-অত্যাচারের প্রতিবাদে হরতাল, ধর্মঘট, শোভাযাত্রা, বিক্ষোভ ও দাঙ্গা-হাঙ্গামা শুরু হল। দেশের বিভিন্ন অংশে নিপীড়নের বিরুদ্ধে চললো হিন্দু-মুসলিম মিলিত প্রতিরোধ। আন্দোলনের রূপ দেখে আন্দোলনের উদোক্তা গান্ধীজীও আতঙ্কিত হয়ে পড়লেন। ১০ই এপ্রিল পাঞ্জাব নেতা ডাঃ সত্যপাল ও কিচলুকে পাঞ্জাব থেকে বহিষ্কারের আদেশ দেওয়া হল। এর বিরুদ্ধে জনসাধারণ প্রতিবাদ করলো। জনতার উপর পুলিশ গুলি চালালে বহু লোক হল হতাহত। মৃতদেহ নিয়ে মিছিল করলো জনতা, অনেক ইংরেজকেও দিতে হল প্রাণ।

বৃটিশ সাম্রাজ্যবাদ প্রতিরোধ স্পৃহায় মরিয়া হয়ে উঠলো।

জেনারেল ডায়ারের চরম অত্যাচার ও নিপীড়ন হল শুরু। প্রতিবাদে জালিয়ানওয়ালাবাগে প্রতিবাদ সভা ডাকা হল। সরকার নিষেধাজ্ঞা জারি করলেন; কিন্তু জনতা বেপরোয়া, মানলো না নিষেধাজ্ঞা। হিংস্র হায়েনার মতো জেনারেল ডায়ার নিষ্ক্রমণের পথবিহীন দেওয়াল ঘেরা জায়গায় নিরস্ত্র জনতার শান্তিপূর্ণ সভার উপর চালালো সশস্ত্র হামলা। মেশিন-গানের গুলিতে রক্তস্রোত বয়ে গেল। ৩৭৯ জন প্রাণ দিল, ১১৩৭ জন হল আহত। অমৃতসরে বিভিন্ন জায়গায় সামরিক আইন হল জারি। অত্যাচার ও নিষ্পেষণের রথচক্র চললো জনগণকে গুড়িয়ে মাড়িয়ে, পিষে দলে।

ঐ নৃশংস হত্যাকাণ্ডের খবর চাপা রাখার চেষ্টা চললো। কিন্তু কোন খবর চাপা রইলো না। ঐ হত্যাকাণ্ডের বিরুদ্ধে সারা ভারতে তীব্র প্রতিবাদের ঝড় উঠলো। বিক্ষোভে টগ্‌বগ্‌ করে ফুটতে লাগলো সমগ্র ভারত।

বীরত্বের জন্য ইংলণ্ড জেনারেল ডায়ারকে জানালো সংবর্ধনা। তাকে পুরস্কার হিসেবে দেওয়া হল বিশ হাজার পাউণ্ড। আর ঐ নৃশংস হত্যা-কাণ্ডের প্রতিবাদে কবি রবীন্দ্রনাথ ঘৃণাভরে নাইট খেতাব বর্জন করলেন। জাতীয় অনুসন্ধান কমিটি সিদ্ধান্ত ঘোষণা করলেন যে, আধুনিক যুগে ঠাণ্ডা মাথায় হিসাব করে নির্দোষ, নিরপরাধ, নিরস্ত্র স্ত্রী-পুরুষ ও শিশুদের হত্যা করার এমন হৃদয়হীন কাপুরুষতাব্যঞ্জক পশুত্বের আর কোন তুলনা মেলে না।

অসহযোগ আন্দোলনের সূচনা

ক্রোধের বহ্নিশিখা জ্বলে উঠলো সারা দেশে—বিস্ফোরণোন্মুখ ভারতবর্ষ। কলকাতা কংগ্রেস অধিবেশনে অসহযোগ আন্দোলনের প্রস্তাব হল পাশ। গান্ধীজী ঘোষণা করলেন এক বছরের মধ্যে স্বরাজ চাই। কংগ্রেস অধিবেশনের সভাপতি লালা লাজপত রায় ডাক দিলেন দেশবাসীকে আন্দোলনে ঝাঁপিয়ে পড়তে। আন্দোলনের পুরোভাগে এসে দাঁড়ালেন দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন ও গান্ধীজী।

গান্ধীজী ঘোষণা করেছিলেন, এক বছরের মধ্যে স্বরাজ চাই। ইংরেজকেও ঐ মর্মে এক চরমপত্র তিনি দিয়েছিলেন। ইংরেজ কিন্তু স্বরাজ দিল না। বরং পরিবর্তে দেখালো অবহেলা, ঔদ্ধত্যের রক্তচক্ষু ও ভ্রূকুটি। ফলে আন্দোলনে নতুন গতি সঞ্চার হল। হাতে হাত মিলালো খিলাফত আন্দোলন, শুরু হল হিন্দু-মুসলিম দুর্বার মিলিত আন্দোলন। বয়কট হল স্কুল-কলেজ, কোর্ট-কাছারি, বিলাতি কাপড়-চোপড়। প্রিন্স অব ওয়েলস্-এর ভারত আগমনের বিরুদ্ধে সারা দেশে হরতাল হল সফল। জনগণকে রাজতন্ত্রের মোহমুগ্ধ করে রাখার ব্রিটিশ কারসাজি হল ব্যর্থ। অসহযোগ আন্দোলনের প্রবল স্রোত দ্রুত ছড়িয়ে পড়লো সারা ভারতবর্ষে। আন্দোলনের স্রোতে চট্টগ্রামও উত্তাল হয়ে উঠলো।

আন্দোলনে চট্টগ্রাম

এর কিছু দিন আগে থেকেই চট্টগ্রামে বুলক ব্রাদার্স স্টিমার কোম্পানি নামে এক ব্রিটিশ কোম্পানির বিরুদ্ধে ধর্মঘট ও আন্দোলন চলছিল। মিছিলের পর মিছিল বের হচ্ছিল। দেশপ্রিয় যতীন্দ্রমোহন সেনগুপ্ত ছিলেন মিছিলের পুরোভাগে। পুলিশ আক্রমণ করে বসলো এই মিছিল, সেনগুপ্ত হলেন গ্রেফতার। আবালবৃদ্ধবনিতা বেরিয়ে এল রাস্তায়, সারারাত কাটিয়ে দিল জেল গেটে। পরদিন বাধ্য হয়ে ম্যাজিস্ট্রেট ছেড়ে দিল দেশপ্রিয় যতীন্দ্রমোহনকে। আর বিদেশী কোম্পানিটাও নতি স্বীকারে হল বাধ্য।

সারা ভারতব্যাপী যখন অসহযোগ আন্দোলনের প্রস্তুতি চলছে তখন চা বাগানের শ্রমিকরা ব্রিটিশ মালিকদের বিরুদ্ধে আন্দোলনে সামিল হয়ে চাঁদপুর স্টেশনে এসে জড়ো হচ্ছিল। তাদের উপর চালানো হল বেপরোয়া আক্রমণ, সঙিনের গুঁতো, গুলির ফোয়ারা চললো তাদের উপর। মৃত ও আহতদের ছুঁড়ে ফেলা হল নদীতে। চট্টগ্রামে এই বর্বরতার বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়ালেন যতীন্দ্রমোহন। চা-বাগান শ্রমিকদের দাবী-দাওয়ার সমর্থনে

শুরু হল আসাম বেঙ্গল রেলওয়ে ধর্মঘট। ঐ ধর্মঘটের পেছনে এসে দাঁড়ালেন সূর্য সেন প্রমুখ বিপ্লবীরা। ধর্মঘট চললো প্রায় নব্বই দিন ধরে। সমর্থনে ছাত্ররাও নামলো ধর্মঘটে। ঐ সব ধর্মঘটের নেতৃত্ব দিচ্ছিলেন চট্টগ্রামের কংগ্রেস নেতৃবর্গ—যতীন্দ্রমোহন সেন, কাজেম আলী মাস্টার, মহিম দাস, ত্রিপুরা চৌধুরী প্রমুখ। এরা সবাই গ্রেফতার হলেন। এই আন্দোলন দেখে গান্ধীজী বললেন, সবার আগে চট্টগ্রাম।

ঐতিহাসিক সেই ১৯২১ সাল। শৈশব ছেড়ে আমি সবে মাত্র কৈশোরে পদার্পণ করেছি। হঠাৎ একদিন দেখলাম আমাদের গ্রামের স্কুলের ছাত্ররা ধর্মঘট করে পথে নেমে পড়েছে। অন্যান্য স্কুল কলেজের ধর্মঘটী বয়স্ক ছাত্ররাও দলে দলে 'গান্ধীজী কি জয়', 'মহম্মদ আলী-শওকত আলী কি জয়' ইত্যাদি শ্লোগান সহকারে গ্রাম প্রদক্ষিণ করছে। কী মনে হল, আমিও ধর্মঘটীদের সঙ্গে যোগ দিলাম, ভেসে চললাম আন্দোলনের জোয়ারে। রাজ-নৈতিক বুঝ কিছুই ছিল না বললেই চলে। ইংরেজ যে বিদেশী অত্যাচারী—এইটুকুই মাত্র বুঝেছিলাম। বুঝেছিলাম, এ দেশ থেকে তাদের তাড়ানোই একমাত্র কাম্য। আন্দোলনের জোয়ারে মিশে ঐ উপলব্ধিটুকুই ক্রমে আরও গভীর ও ব্যাপক হয়ে উঠেছিল।

আন্দোলন স্তব্ধ

ভারতের কোন কোন জায়গায় শ্রমিকেরাও তখন ধর্মঘট করেছিল। আন্দোলনকে করে তুলেছিল জোরদার। আন্দোলনের স্রোতোধারা ক্রমেই আরও প্রবলতর হয়ে ছুটে চলছিল দিকে দিকে। ব্রিটিশ ভারতের শাসন কাঠামো টলমল করে উঠেছিল। দেশ যেন এগিয়ে চলছিল বিদ্রোহের পথে। পরিস্থিতি এমন হতে চললো যে, ১৯২২ সালে গোরক্ষপুর জেলার চৌরীচোরার অহিংস জনতা জালিয়ানওয়ালাবাগ হত্যাকাণ্ডের প্রতিশোধ নিতে চাইলো। বয়কট আন্দোলনের প্রবল স্রোতে বিদ্রোহ তরঙ্গ এমন দুর্বার হয়ে উঠতে লাগলো যে, অহিংসা মন্ত্র জনতাকে রুখতে পারলো না। ক্রুদ্ধ জনতা চৌরীচোরা থানা আক্রমণ করলো। পুলিশ সাব-ইন্সপেক্টর সহ একুশ জন পুলিশকে আগুনে পুড়িয়ে মারা হল। অবস্থা বেগতিক দেখে দমননীতি শুরু করলো ব্রিটিশ সরকার। চললো জেল, গুলি। নিপীড়নের শত পন্থা চাপিয়ে দেওয়া হল জনগণের উপর। আসাম উপত্যকা, বাংলা, বিহার, সংযুক্ত প্রদেশ, উড়িষ্যায় কৃষকেরা বিক্ষুব্ধ ও ক্রুদ্ধ হয়ে উঠলো। খিলাফত আন্দোলন তাগিদ দিতে শুরু করলো অহিংসা নীতি বাতিল করার জন্য। আতঙ্কিত গান্ধীজী বলতে লাগলেন, আন্দোলনে পচন গন্ধ বেরিয়েছে।

'দেশ তৈরি নয়'—এ অজুহাতে গান্ধীজী আন্দোলন দিলেন বন্ধ করে। আন্দোলন স্তিমিত ও স্তব্ধ হয়ে গেল। গান্ধীজী গ্রেফতার হলেন। হতাশা ও অনৈক্যে দেশ ছেয়ে গেল।

আন্দোলনে ভাটা পড়লে সহপাঠী ও বহু বয়স্ক ছাত্র আবার স্কুলে হাজির হল। কাউকে কাউকে ক্ষমা চেয়ে ঢুকতে হল স্কুলে। আমি ও আরও কয়েকজন আগের স্কুলে আর গেলাম না। শ্যাম রায়ের হাটে সদ্য-প্রতিষ্ঠিত জাতীয় বিদ্যালয়ে ভর্তি হলাম। মাস কয়েক স্কুলটা কোন রকমে খুঁড়িয়ে খুঁড়িয়ে চলেছিল। শেষ পর্যন্ত আর্থিক টানাটানিতে বন্ধ হয়ে গেল। ফলে আমরা মুশকিলে পড়ে গেলাম। মানসিক দ্বন্দ্ব—কি করব, কোথায় পড়ব? মনের ঐ নিদারুণ অবস্থায় শেষ পর্যন্ত সিদ্ধান্ত নিলাম যে, ইংরেজিই পড়বো না। তখন ভালো-মন্দ উপলব্ধি বা বিচার করার মতো জ্ঞান আমার যেমন ছিল না, তেমনি উপদেশ দিয়ে সাহায্য করার মতোও কেউ ছিলেন না। বাবা ছিলেন সংস্কৃত শাস্ত্রের পণ্ডিত। আমার নিজস্ব সিদ্ধান্তকে তিনি বাস্তব রূপ দিলেন। সংস্কৃত টোলে পড়া শুরু করলাম। ইংরেজি শিক্ষায় শিক্ষিত হবার স্বপ্ন চিরতরে বিসর্জন দিতে হল। ঝাঁপ দিলাম মধ্যযুগীয় শিক্ষার আবর্তে।

এরই কিছুদিন পর নিদারুণ রোগে ভুগে বাবা মারা গেলেন। কয়েক বছর আগে মা-ও মারা গিয়েছিলেন। পিতৃমাতৃহীন অবস্থায় শহরে এসে টোলে ভর্তি হয়ে কেমন-একটা মানসিক অশান্তি ও অতৃপ্তি নিয়ে পড়াশোনা চালিয়ে যাচ্ছিলাম সত্য কিন্তু আমার ভবিষ্যৎ কী ধরনের হবে তার হদিস পাচ্ছিলাম না।

এভাবে অবচেতন মনের দ্বন্দ্বের ভেতর দিয়ে ১৯২২ সালকে দিলাম বিদায়।

দুই

বিপ্লবী আন্দোলনে দীক্ষা

১৯২৩ সাল হল শুরু। টোলের এক সহপাঠীর সংস্পর্শে আসার আমার সৌভাগ্য ঘটলো। তিনিও অসহযোগ আন্দোলনে অংশগ্রহণ করেছিলেন। স্কুল ছেড়ে সবেমাত্র সংস্কৃত পড়তে শুরু করেছেন। তিনি যে বিপ্লবী দলের সাথে যুক্ত ছিলেন তা আমার কাছে ছিল অজানা। তিনি হলেন বাবু যতীন্দ্র রক্ষিত (যতীন দা')। যতীন দা'র সংস্পর্শে আসার পর থেকে একটু একটু করে দেশের প্রকৃত অবস্থার কথা উপলব্ধি করতে শুরু করি। ঐতিহাসিক ব্যক্তিদের জীবন নিজের জীবনে রূপায়িত করার আকাঙ্ক্ষা জাগিয়ে তুলতে তিনিই আমাকে সাহায্য করেছিলেন। সিপাহী বিদ্রোহের নায়ক তান্তিয়া তোপী, নানা সাহেব, লক্ষ্মী বাই-এর বিদ্রোহ-কাহিনী, বাঁশের কেল্লা গড়ে ইংরেজদের বিরুদ্ধে তিতুমীরের লড়াই এর বীরত্বগাথা, ক্ষুদিরাম, কানাইলাল, কর্ত্তার সিং ও অন্যান্য বীরদের ফাঁসির কাহিনী, বালেশ্বরের বুড়িবালামের তীরে ইংরেজ ফৌজদের বিরুদ্ধে বাঘা যতীনের লড়াই ও আত্মদানের অমর কাহিনী তাঁর কাছেই আমি শুনেছি। আজ স্মৃতিচারণ করতে গিয়ে মনে পড়ছে সেই যতীন দাকে। তিনি ছিলেন দুর্বার সাহসী, সহজ ও সৎ প্রকৃতির লোক। ব্রিটিশ আমলে কয়েকদফা জেলও খেটেছেন। কংগ্রেসের একজন একনিষ্ঠ কর্মী ও নেতা হলেও দল নিরপেক্ষ-ভাবে প্রগতিশীল ধারার সাথে তিনি ছিলেন যুক্ত। ভিন্ন মত পোষণ করলেও তাঁর সাথে শেষ পর্যন্ত ছিল আমার গভীর সৌহার্দ্য। ১৯৬৮-৬৯ সালের আয়ুব বিরোধী আন্দোলনে যখন আমি চট্টগ্রাম জেলে বন্দী তখন হঠাৎ শুনলাম হৃদক্রিয়া বন্ধ হয়ে তাঁর মৃত্যু ঘটেছে। মনে হয়েছিল কি যেন হারিয়ে ফেলেছি, কয়েকটা যুগের ইতিহাস যেন হারিয়ে গেছে।

যা হোক, কীভাবে বিপ্লবীদের নানা তৎপরতার খবর আমাকে বিপ্লব পন্থায় আকৃষ্ট করেছিল এবার সে প্রসঙ্গে আসি।

১৯২৩ সালের ডিসেম্বরের মাঝামাঝি। একদিন হঠাৎ শুনতে পেলাম, চারজন যুবক ইংরেজ রেল কোম্পানির সশস্ত্র প্রহরীদের নিরস্ত্র করে প্রায়

সতেরো হাজার টাকা ছিনিয়ে নিয়ে সরে পড়েছে। সবাই বলাবলি করতে লাগল এ বিপ্লবীদের কাজ। ক'দিন পরেই বহদ্দার হাটে এবং তার কাছাকাছি নাগরখানা পাহাড়ে বিপ্লবী দলের কয়েক জনের সাথে ব্রিটিশ সৈন্যের সশস্ত্র লড়াইয়ের কথা শোনা গেল। শুনলাম লড়াইয়ে সূর্য সেন ও অম্বিকা চক্রবর্তী বেশ জখম হয়ে ধরা পড়েছেন। গাড়ী করে তাদের শহরে আনা হচ্ছে বলে খবরও শুনলাম। শহরে ঐ ব্যাপারে দারুণ হৈ চৈ পড়ে গিয়েছিল।

ওঃ! সেদিন যে কী আনন্দ পেয়েছিলাম তা ভাষায় ব্যক্ত করা আজ আমার পক্ষে অসম্ভব। কৈশোর ছেড়ে সবেমাত্র যৌবনে পদার্পণ করেছি। তখন ঐ ধরনের খবর! অন্তরের স্বত:উচ্ছল আনন্দে যখন সমগ্র সত্তা ভরপুর থাকে তখন ঐ ধরনের চমকপ্রদ ঘটনাবলি অসম্ভবকে সম্ভব করে তোলার সঙ্কল্পই জাগ্রত করে তোলে। জীবনের ঐ মুহূর্তে আমার মনেও তাই এসেছিল। মনে হয়েছিল ভবিষ্যৎ যেন আমায় হাতছানি দিয়ে ডাক দিয়ে গেল।

কিছুদিন পর শুনলাম অনন্ত সিংহ ধরা পড়েছেন। সকলের বিরুদ্ধে মামলা চলছে। দেশপ্রিয় সেনগুপ্ত ঐ মামলা পরিচালনা করছিলেন। সওয়াল-জবাবে ও অকাট্য যুক্তির আঘাতে প্রতিপক্ষ হয়রান ও বেকায়দায় পড়েছে বলে মনে হল। পরের ঘটনা অতি সংক্ষিপ্ত। বিচারে সবাই বে-কসুর খালাস পেলেন। খবর শুনে খুবই ভাল লাগলো, খুবই আনন্দ পেলাম।

পত্রিকার নিয়মিত পাঠক ছিলাম না। মাঝে মাঝে এক আধটু পড়তাম। হঠাৎ একদিন চোখে পড়ে গেল পত্রিকার শিরোনামায় বড় বড় হরফে লেখা,—'কলিকাতার বুকে গোপীনাথ সাহা কর্তৃক ডে সাহেবকে হত্যা'। পড়ে জানলাম গোপীনাথ আসলে হত্যা করতে গিয়েছিলেন দুর্দান্ত পুলিশ কমিশনার টেগার্ট সাহেবকে। কিন্তু, মোটর আরোহীকে টেগার্ট বলে ভুল করে ডে সাহেবকে হত্যা করে বসেছেন। ব্রিটিশ সরকার ভাবলো, আবার বিপ্লবী দলের কাজ শুরু হয়েছে। তাই ঐ ঘটনা সংঘটিত হবার সাথে সাথে বাংলাব্যাপী ধর-পাকড় হল শুরু। প্রায় বারো শো তরুণ কারারুদ্ধ হল। আমাদের জেলা থেকেও অনন্ত সিংহ, গণেশ ঘোষ, অম্বিকা চক্রবর্তী, লোকনাথ বল, নির্মল সেন, যশোদা চক্রবর্তী, চারু দত্ত ও অনিল গুহ প্রমুখ কয়েকজনকে গ্রেপ্তার করা হয়েছিল। কিন্তু মাস্টার দা ছিলেন পলাতক।

আনন্দ যেমন লেগেছে, বিষাদও কম লাগে নি। অত্যাচারী বিদেশী শোষক বা তাদের ভাড়াটেদের হত্যা বা ধরাপৃষ্ঠ থেকে মুছে ফেলার জেহাদে যেমন আনন্দে ভরপুর হয়ে উঠেছি তেমনি এই দেশব্যাপী গ্রেপ্তারের

হিড়িক এবং বিচারে গোপীনাথের ফাঁসিতেও কম ব্যথা পাই নি। আনন্দ ও বিষাদ যেন পরস্পর হাত ধরে চলেছে।

ঐ সময়ে অসহযোগ আন্দোলনের ধৃত বন্দীরা সবাই জেল থেকে মুক্তি পেয়েছেন। কিন্তু সারাদেশ হতাশায় ছেয়ে গেছে। আন্দোলনে ব্যর্থতার দরুন হিন্দু-মুসলিম মধ্যবিত্ত শ্রেণী তখনও হতাশাগ্রস্ত। খিলাফত ও অসহযোগের সময়কার দিনগুলো মনে হল এক একটা স্বপ্নময় দিবস। হিন্দু-মুসলিম মিলনের এক দীপালি মহোৎসব যেন নিভে গেছে। আন্দোলন থামিয়ে দেবার জন্য মুসলিমরা দোষারোপ করে বসলো গান্ধীজীর ওপর, তথা কংগ্রেসের উপর। তার ক্রমপরিণতি ঘটলো সাম্প্রদায়িক বিদ্বেষের অভ্যুদয়ে। আবার কংগ্রেসের ভেতরেও প্রবল মতদ্বৈধতা মাথাচাড়া দিয়ে উঠলো। দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন দাশের নেতৃত্বে স্বরাজ্য পার্টি গঠিত হল। তাঁরা পরিষদ নির্বাচনে অংশগ্রহণ ও পরিষদে প্রবেশ করলেন। কিন্তু গান্ধীজী দাঁড়ালেন ঐ নীতির বিরুদ্ধে।

১৯২৪ সালের দিকে দেশের সাম্প্রদায়িক আবহাওয়া বিষাক্ত হয়ে উঠলো। কলিকাতা, কোহাটে ভীষণ সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা শুরু হল। শত শত নিরপরাধ লোক হল নিহত ও আহত। এর বিরুদ্ধে গান্ধীজী করলেন অনশন; হিন্দু মুসলিম ঐক্য বৈঠক ডাকা হল। কিন্তু বৈঠক ফলপ্রসূ হল না, হল ব্যর্থ।

দাঙ্গার সময় খুব দুঃখ পেয়েছিলাম। কিন্তু তখনও এ চেতনা আমার হয় নি যে, এ দাঙ্গার পেছনে বৃটিশদের হাত ছিল এবং পুঁজিবাদ ও সাম্রাজ্যবাদী শক্তি সাম্রাজ্যরক্ষার প্রচেষ্টায় 'ভেদ ও শাসন' নীতির আশ্রয় নিয়ে সুকৌশলে সাম্প্রদায়িক উস্কানি দিয়ে দাঙ্গা হাঙ্গামা বাঁধিয়ে জনতার আন্দোলনকে থামিয়ে দিয়েছিল।

ঐ ভাবেই ১৯২৪ সাল শেষ হল। এল ১৯২৫ সাল।

বিপ্লবীদের দলে

আমি তখনও শিক্ষানবিসি স্তর অতিক্রম করতে পারি নি। রাজনৈতিক বইপুস্তক পড়ে চলেছি—ভিন্ন পরিবেশে উদ্ভূত মহান জীবনগুলোর আদর্শ ও তাদের জীবনের গতিধারা এবং আনন্দমঠের মত বইগুলো অনুপ্রেরণা জাগাতো। অতীত থেকে সম্পূর্ণ আলাদা পরিবেশে সম্পূর্ণ আলাদা ধরনের শত্রুর বিরুদ্ধে যে কঠোর সংগ্রাম চালিয়ে যেতে হবে তা উপলব্ধি করতাম। গান্ধীজীর সহিংসনীতির প্রতি আদৌ বিশ্বাস ছিল না। অবশ্য গান্ধী ও কংগ্রেসের মূল নেতৃত্ব যে সম্পদশালীদের স্বার্থরক্ষার তাগিদে আন্দোলনের

সহিংস পন্থাকে ভয় পেয়ে অহিংসনীতি বেছে নিয়েছিলেন এবং তার ফলে আন্দোলন স্তব্ধ হয়ে গিয়েছিল—এমন চিন্তাও তখন মনে জাগে নি। যা হোক ক্ষমতা গর্বে গর্বিত উদ্ধত ইংরেজ-রাজশক্তির মোকাবেলা একমাত্র সহিংসনীতিতেই সম্ভব বলে বিশ্বাস করতাম। অহিংসনীতি মনে হত অক্ষমতারই নীতি। তাকে পরাজয় বরণ করার নীতি বলে ধরে নিয়েছিলাম। তাই, সহিংস সংগ্রামই একমাত্র পন্থা হিসাবে উপলব্ধি করেছিলাম। তরুণ-দেরকে এর উপযোগী করে তোলার ক্ষেত্রে দৃষ্টিভঙ্গি ছিল এই যে, ব্রিটিশ বিরোধী সংগ্রামে দৃঢ়তা অর্জন করতে হলে এবং দিনের পর দিন কঠোর বিপ্লবী জীবন যাপন করতে হলে নৈতিক ও চারিত্রিক শক্তির বিশেষ প্রয়োজন। এই শক্তি একমাত্র অর্জন করা যেতে পারে ধর্মীয় মনোভাব অনুশীলনে ও সংযত জীবনযাপনের মাধ্যমে। এই ভিত্তির উপরই বিপ্লবী-দের আদর্শ দৃঢ়ভাবে দাঁড়াতে পারে, ইংরেজের বিরুদ্ধে অবিচলিত কঠোর সংগ্রাম করার পথে অবিচল দৃঢ়-সঙ্কল্প ব্যক্তি হিসেবে গড়ে উঠতে পারে। তাই, আমিও একদিকে যেমন বিপ্লববাদে উদ্বুদ্ধ হয়ে বিপ্লবাত্মক বই-এর নায়ক ক্ষুদিরাম, কানাইলাল প্রমুখের জীবনাদর্শে অনুপ্রাণিত হয়ে উঠে-ছিলাম এবং আইরিশ বিদ্রোহ ও তার নায়ক ড্যানব্রিন ইত্যাদির মরণপণ সংগ্রামের রূপরেখা আবিষ্কারের সাফল্যে নির্মল আনন্দ পেতাম তেমনই নিষ্কাম আদর্শের অনুসরণ প্রচেষ্টায় ও রামকৃষ্ণ সেবাশ্রম ইত্যাদির সেবা ধর্মের মাধ্যমে নিজের বৈপ্লবিক শক্তির ভিত্তি গড়ে তুলছি বলে মনে কর-তাম। এক কথায় বলতে গেলে ঈশ্বরে দৃঢ় বিশ্বাস—এই ভিত্তির ওপরই ইংরেজের বিরুদ্ধে নির্মম সংগ্রামের অটল সংকল্প আমার মনে দানা বেঁধে উঠতে থাকে। এই জগাখিচুড়ি ভাবাদর্শ নিয়ে আমি গড়ে উঠতে থাকি।

আমার এই শিক্ষানবিসির শেষ দিকে বন্ধুবর পূর্ণেন্দু দস্তিদারের সঙ্গে আমার পরিচয় ঘটে। দেব পাহাড়ের নির্জন একটা জায়গায় আমরা ব্যায়াম চর্চা করতাম। আমি যে বিপ্লবীদলের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট তা তিনি জানতেন না। মেলামেশা চলতে থাকে খুব ঘনিষ্ঠভাবে। তাঁর চন্দনপুরাস্থ বাসায়ও আমার খুব যাতায়াত ছিল। স্বদেশপ্রেমে উদ্বুদ্ধ শহীদদের ইতিহাস তিনি আমার চোখের সামনে তুলে ধরতেন। তিনি তুলে ধরতেন অতীত বিপ্লবী কর্মকাণ্ডের রক্তাক্ত ছবিগুলো। তাঁর কাছেই শুনেছিলাম চট্টগ্রাম পার্টির ইতিহাস। ১৯১৮ সালে সূর্য সেন, অনুরূপ সেন, নগেন সেন, অম্বিকা চক্রবর্তী ও চারুবিকাশ দত্তকে নিয়ে কীভাবে বিপ্লবী কেন্দ্র তৈরি হয়েছিল। অনন্ত সিং, আফসার উদ্দিন, নির্মল সেন, প্রমোদ চৌধুরী প্রমুখ ছিলেন তখনকার বুনিয়াদি সদস্য। পরের দিকে ১৯২১ সালে পার্টি-কৌশল নিয়ে চারু দত্তের সাথে মতানৈক্য দেখা দেয়।

অনুশীলনের গিরিজাশঙ্কর চৌধুরীর পরামর্শে চারু দত্তের নেতৃত্বে প্রমোদ চৌধুরী সহ অন্যান্যদের নিয়ে চট্টগ্রামে আলাদা পার্টি হিসেবে অনুশীলন সমিতি গড়ে ওঠে। অন্যদিকে সূর্য সেনের নেতৃত্বে অম্বিকা দা' ও অনন্ত দা' প্রমুখকে নিয়ে বাংলার অন্যান্য বিপ্লবী দল থেকে সম্পূর্ণ আলাদা একটা বিপ্লবী দল গড়ে ওঠে। এর নাম হল, ইণ্ডিয়ান রিপাবলিকান আর্মির চট্টগ্রাম শাখা। এ পার্টি যুগান্তর পার্টির সাথে সম্পর্ক রেখে কাজে অগ্রসর হচ্ছিল। ১৯২৩ সালের ১৪ই ডিসেম্বরের রেলওয়ে ডাকাতি এই দলেরই এক দুঃসাহসিক কাজ।

পূর্ণেন্দু দস্তিদার যখন একদিন জানতে পারলেন যে আমিও বিপ্লবী দলের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট, তখন যেমন বিস্মিত হয়েছিলেন তেমনি খুব খুশীও হয়েছিলেন। তাঁর সঙ্গে প্রথম পরিচয়ের পর আমি যে আনন্দের আতি-শয্যে দলের সাথে আমার সম্পর্কের ব্যাপারটা তার কাছে প্রকাশ করে দেই নি সেজন্যেও তিনি আনন্দ প্রকাশ করেছিলেন। আজ এই স্মৃতিচারণ করতে গিয়ে বার বার তাঁর কথা মনে পড়ছে। তিনি আজ আমাদের মাঝে নেই। ১৯৭১ সালে মুক্তিযুদ্ধের সময় দুর্গম পাহাড়ী এলাকা অতিক্রম-কালে রোগ ও ক্লান্তিতে হৃদক্রিয়া বন্ধ হয়ে তিনি মৃত্যুবরণ করেছেন। আমাদের দেশের মুক্তি সংগ্রামে অংশ নিয়ে তিনি যে আত্মত্যাগের পরিচয় রেখে গেছেন তা অনুকরণীয়, অনুসরণীয়। পঁচিশ বছর কি তারও বেশি সময় ধরে বৃটিশ ও পাকিস্তানী কারাগারে তিনি জেলজুলুম ভোগ করেছেন। এবং মৃত্যুর শেষ দিনটি পর্যন্ত সংগ্রাম করে গেছেন শোষণ ও নিপীড়নের বিরুদ্ধে। মৃত্যুর কিছুদিন আগ পর্যন্তও আমি তার সঙ্গে খুব অন্তরঙ্গভাবে জড়িত ছিলাম। তাঁর সঙ্গে পরিচয় হবার পর বিপ্লবীদের সঙ্গে আমার সম্পর্ক দ্রুত নিবিড় হয়েছিল। বিপ্লবী কর্মকাণ্ডের শিক্ষানবিসি স্তরটি তাঁর সাহায্যেই আমি দ্রুত অতিক্রম করতে পেরেছিলাম।

সে সময় বাস্তবে একটা কিছু করার চিন্তায় আমি বার বার চঞ্চল হয়ে উঠছিলাম। কোথায়, কীভাবে, কী ধরনের কাজ শুরু করবো—সে প্রশ্ন আমাকে আকুল করে তুলেছিল। তাই একদিন শহরের ভারপ্রাপ্ত বন্ধুর সাথে দেখা হতেই তাকে জানালাম— আমি এবার কাজে নামতে চাই। বোমা তৈরির ব্যাপারটা আমাকে শিখিয়ে দিন। বোমা মেরে মেরে ইংরেজদের শাসনের ভিত চুরমার করে দেব। তিনি হেসে বললেন—আগে আগের কাজ কর। সংগঠন গড়ে তোল, তরুণ ছাত্রদের রিক্রুট কর, সংগঠনকে আরো জোরদার কর। তারপর, তারপরই আসবে তোমার সেই ঈপ্সিত কাজের পালা, শুরু হবে স্বাধীনতার যুদ্ধ, ইংরেজদের রক্তে ধুলি ধুসর রাজপথ লাল হয়ে উঠবে। সেদিন বিস্ময়ে অভিভূত হয়ে পড়েছিলাম।

ক্লাব সংগঠন তখনও গড়ে ওঠে নি। গোপনে গোপনে যুযুৎসু, বকসিং ইত্যাদি শিখে নিচ্ছি। খোলাখুলিভাবে শিখতে গেলে গোয়েন্দাদের নজরে পড়ার ঝুঁকি ছিল। তাই সতর্ক গোপনীয়তা।

একদিনের কথা আজ বেশ মনে পড়ে। আমি ও বসন্ত দা' (বসন্ত দাস) জামাল ইঞ্জিনিয়ারিং অফিসের বাঁধানো বারান্দায় সন্ধ্যার সময় বসে আলাপ করছিলাম। সে জন্য আমরা যুযুৎসু অভ্যাস করতে পারি নি সেদিন। কী একটা ঘটনা ঘটেছিল। বোধ হয় দেশপ্রিয় চিত্তরঞ্জন দাশের মৃত্যু। আলাপ হচ্ছিল বসন্ত দা'র সঙ্গে। তিনি তখন বলে চলেছিলেন অসহযোগ আন্দোলনে তাঁর বিরাট ভূমিকা ও পরের দিকের ত্যাগোচ্ছল কীর্তিগুলো। আবার সাথে সাথে সমালোচনাও করেছিলেন স্বরাজ্য পার্টি গড়ে কাউন্সিলে যোগ দেওয়া থেকে শুরু করে গোপীনাথের ফাঁসি পর্যন্ত। কাউন্সিলে প্রবেশ সম্পর্কে বলতে গিয়ে বসন্ত দা' বলছিলেন যে, 'গান্ধীজী মনে করেন কাউন্সিলটা হল ব্রিটিশ একনায়কত্ব কার্যকরী করার একটি যন্ত্র বিশেষ। মনে হয় গান্ধীজীর কথাটা খুবই খাঁটি। আর কাউন্সিলে যোগ দিয়ে তার মাধ্যমেই দেশীয় প্রতিনিধিরা বৃটিশ শোষণ ও নিপীড়নের স্বরূপ দেশবাসীর সামনে তুলে ধরতে পারবেন বলে দেশপ্রিয় চিত্তরঞ্জন কাউন্সিলে যোগ দেওয়ার কৌশল নিয়েছেন। তবে আমাদের কাউন্সিলে যোগ দেওয়া না-দেওয়া দুই-ই সমান। আমাদের বিশ্বাস সশস্ত্র আঘাত ছাড়া ব্রিটিশকে উচ্ছেদ করা যাবে না। তবে এখন আমাদের শক্তি ক্ষুদ্র। কিন্তু কালে এ শক্তি মহাশক্তিতে পরিণত হবে। একমাত্র রক্তের হোলি খেলার মধ্য দিয়েই স্বাধীনতার জন্ম হবে। ক্ষুদিরাম, বাঘা যতীন, গোপীনাথ সে পথ দেখিয়ে গেছেন। ঐ পথেই আমাদের এগুতে হবে।'—এই বলে তিনি কথা শেষ করলেন। দু'জনে উঠে পড়লাম। রওয়ানা দিলাম বাসার দিকে। আজও বসন্ত দা'র স্মৃতি আমার চোখে ভাসছে। তিনি এর পর বেশি দিন বাঁচেন নি। ১৯২৬ সালে বি. এ পড়ার সময়েই তিনি টাইফয়েড রোগে মারা গিয়েছিলেন।

অবসর ও সুযোগ পেলেই রাজনৈতিক বই-পত্র পড়তাম। ঐ সময়েই ডাঃ ভূপেন দত্তের 'অপ্রকাশিত রাজনৈতিক ইতিহাস' এবং নলিনী কিশোর গুহের 'বাংলায় বিপ্লববাদ' পড়ার সুযোগ হয়েছিল। ঐ দুটো গ্রন্থ পড়েই ভালভাবে জানতে পেরেছিলাম অনুশীলন ও যুগান্তর পার্টি গড়ার ইতিহাস। কীভাবে উনবিংশ শতাব্দীর শেষ দিকে ও বিংশ শতাব্দীর প্রারম্ভে ভারতে বিপ্লবী আন্দোলনের সূত্রপাত হল, ব্যারিস্টার প্রমথ মিত্রের উদ্যোগে ও দেশপ্রিয় চিত্তরঞ্জনের সহায়তায় কীভাবে কলিকাতায় অনুশীলন সমিতি গড়ে উঠলো, কীভাবে এই অনুশীলন সমিতি বাংলার বিভিন্ন জেলায় বিস্তার লাভ

করলো, কীভাবে পুলিন দাশ, ত্রৈলোক্য মহারাজ, প্রতুল গাঙ্গুলী, রবি সেন প্রমুখ প্রখ্যাত বিপ্লবী নেতৃবৃন্দ পার্টিকে দৃঢ় ভিত্তির উপর দাঁড় করালেন সে-সব আমার কাছে সুস্পষ্ট হয়ে উঠলো। আরও জানতে পারলাম অরবিন্দ ঘোষ বরোদা কলেজে অধ্যাপনা করতেন। মারাঠা বিপ্লবী দামোদর সাভারকার ভ্রাতৃদ্বয়ের সাথে তাঁর পরিচয় ঘটে। অরবিন্দ ঘোষের ভাই বারীণ ঘোষ বিপ্লবীদের সাথে সংযোগ স্থাপন করেন এবং বাংলায় চলে আসেন। পরে মতানৈক্যের কারণে তারা আলাদা পার্টি গড়ে তোলেন। প্রথমে 'যুগান্তর' পত্রিকা প্রকাশনার মাধ্যমে জাতীয়তাবাদ প্রচার শুরু করে পরের দিকে ঐ পত্রিকার নামানুসারে যুগান্তর পার্টি গঠিত হয়। বারীণ ঘোষ, অরবিন্দ ঘোষ, বিপিন গাঙ্গুলী, অমর ব্যানার্জি প্রমুখ প্রখ্যাত বিপ্লবী-দের উদ্যোগে বাংলার বিভিন্ন জেলায় যুগান্তর পার্টির শাখা-প্রশাখা গড়ে ওঠে। গ্রন্থ দুটো বিপ্লবী আন্দোলনের ইতিহাস জানতে আমাকে অনেক-খানি সাহায্য করেছিল। বিপ্লবী আন্দোলনের অনেক তথ্য ছিল বই দুটোতে। ঐ দুটো বই এবং ঐ ধরনের অন্যান্য বইপত্র পড়ে এ দেশে বিপ্লবী আন্দোলনের অতীত সম্পর্কে একটা মোটামুটি ধারণা আমার হয়ে গিয়েছিল। জেনেছিলাম, বাংলার প্রথম বিপ্লবী কাজের উন্মেষ ঘটে ১৯০৭ সালে। ১৯০৮ সালে কিংস্‌ফোর্ডকে হত্যা করতে গিয়ে মিসেস কেনেডিকে হত্যা করা হয়। ধরা পড়ার মুখে প্রফুল্ল চাকী আত্মহত্যা করেন, ক্ষুদিরামের ফাঁসি হয়। এরপর শুরু হয় আলিপুর ষড়যন্ত্র মামলা। বারীণ ঘোষ, অরবিন্দ ঘোষ প্রমুখ অনেকেই ঐ মামলায় অভিযুক্ত হন। ঐ মামলার রাজসাক্ষী নরেন গোঁসাইকে জেলের ভেতর হত্যা করে কানাইলাল ও সত্যেন ফাঁসিকাষ্ঠে প্রাণ দেন। ঐ ষড়যন্ত্র মামলায় অরবিন্দ ঘোষ, বারীণ ঘোষ প্রমুখ অনেকেরই নির্বাসন দণ্ড হয়। ১৯১২ সালে নলিনী বাগ্‌চির সাথে গৌহাটী পুলিশের সংঘর্ষ বাধে, তিনি বেষ্টনী ভেদ করে পালিয়ে যান; পরে ঢাকায় এক বাড়িতে পুলিশের সঙ্গে সশস্ত্র সংঘর্ষে তাঁর সাথী তারিণী মজুমদার নিহত হন। র‍্যা কোম্পানী থেকে ৪৬,০০০ কার্তুজ সহ পঞ্চাশটি মোসার পিস্তল উধাও হওয়া, শোভাবাজার স্ট্রিটে পুলিশ ইন্সপেক্টর নৃপেন্দ্র ঘোষকে এবং ময়মনসিংহে পুলিশের ডেপুটি সুপারিনটেণ্ডেণ্টকে হত্যা করা ইত্যাদি লোমহর্ষক ঘটনাবলি, শত শত রাজনৈতিক ডাকাতি ও বিপ্লবী হত্যা-কাণ্ডের রক্তাক্ত ইতিহাস ছিল ঐ সব গ্রন্থে। ঐ সব পড়তে পড়তে তন্ময় হয়ে যেতাম, একটা গভীর উপলব্ধি হ'ত সঞ্চারিত, সেই উপলব্ধি বাস্তবে পরিণত করার একটা আকাঙ্ক্ষাও আমাকে আকুল করে তুলতে লাগলো।

ঐ সময়েই মধুদার সঙ্গে পরিচয় হয়েছিল। তিনি থাকতেন জামশেদ-পুরে। ছুটির অবকাশে চট্টগ্রাম আসতেন। একদিন তাঁর মুখেই শুনেছিলাম

ভারতের বিপ্লবী ইতিহাসের আরেক অধ্যায়ের কথা। তিনি বলেছিলেন, বিপ্লবী আন্দোলনের ইতিহাসে ১৯১৪-১৫ সাল এক গভীর রেখা এঁকে গেছে।

মহাযুদ্ধের সুযোগে কয়েকজন বিপ্লবী নেতার প্রচেষ্টায় আন্তর্জাতিক সহায়তায় একটি বৈপ্লবিক অভ্যুত্থানের প্রচেষ্টা চলে। এম. এন. রায়, অবনী মুখার্জি, যতীন মুখার্জি প্রমুখ বিপ্লবী নেতারা ছিলেন ঐ প্রচেষ্টার উদ্যোক্তা। ১৯১৫ সালের পহেলা জুলাই এক কোটি বিশ লক্ষ কার্তুজ সহ ত্রিশ হাজার রাইফেল নিয়ে জার্মান জাহাজ 'মেবারিক' এসে ভিড়বে রায়মঙ্গলে। এদিকে সব ঠিকঠাক। বালাসোর জঙ্গলে বাঘা যতীন এবং তাঁর বীর সহকর্মী চিত্তপ্রিয়, মনোরঞ্জন, নীরেন ও জ্যোতিষ অপেক্ষা করলেন পনেরো দিন ধরে। কিন্তু, 'মেবারিক' এলো না, এলো ব্রিটিশ পুলিশ অফি-সার স্যার চালর্স টেগার্টের নেতৃত্বে পুলিশ ও সামরিক বাহিনী। বালাসোরে বুড়ি বালামের তীরে সম্মুখ যুদ্ধ হল, প্রাণ দিলেন বাঘা যতীন এবং তাঁর বীর সাথী চিত্তপ্রিয়। গুরুতর আহতাবস্থায় ধৃত হলেন মনোরঞ্জন, নীরেন ও জ্যোতিষ। ফাঁসি হল মনোরঞ্জন ও নীরেনের, জ্যোতিষের হল যাবজ্জীবন দ্বীপান্তর। শুনে মনে হচ্ছিল যেন রূপকথার কাহিনী শুনছি।

কিছুক্ষণ নীরব থাকার পর মধুদা আবার বলতে শুরু করলেন, এরও কিছুকাল আগে রাসবিহারী বসু ও তাঁর সাথী বিষ্ণুগণেশ পিঙলে ভারতীয় সিপাইদের সাহায্যে ভারতে বিদ্রোহ সৃষ্টির প্রয়াস পান। রাসবিহারী বসু ও পিঙলে বাংলার বিপ্লবীদের সাথে পরামর্শ করে ১৯১৫ সালের ১৫ই ফেব্রুয়ারি যুগপৎ আক্রমণের দিন ধার্য করেন। কিন্তু ষড়যন্ত্রের কথা প্রকাশ হয়ে পড়ে। ভারতের সর্বত্র সিপাই বিদ্রোহ শুরু করার প্রচেষ্টায় মারাঠা যুবক পিঙলে মীরাটে বোমাসহ বন্দী হন। বিচারে হল তাঁর ফাঁসি।

মধুদার মুখেই আমি পাঞ্জাবের গদর পার্টির বীরত্বপূর্ণ সংগ্রামের ইতিহাস শুনেছিলাম। হরদয়ালের নেতৃত্বে পাঞ্জাবে গদর পার্টি কায়েম হয়। ঐ পার্টির সদস্যরাই ভারতের ভাইসরয় হার্ডিঞ্জের ওপর বোমা নিক্ষেপ করে। লাহোরের লরেন্স পার্কে বোমা নিক্ষেপের ফলে একজন পুলিশ গুপ্তচর নিহত হয়। শুরু হয় দিল্লী ষড়যন্ত্র মামলা। বিচারে ফাঁসি হল আমির চাঁদ, অবোধ বিহারী, বালমুকুন্দ ও বসন্তকুমার বিশ্বাসের। আমেরিকায়ও গদর পার্টির কেন্দ্র গড়ে উঠেছিল শিখদের মধ্যে। কানাডীয় সরকারের ভারতীয় শ্রমিক অনুপ্রবেশ নিয়ন্ত্রণ আইনের বিরুদ্ধে শিখেরা প্রতিবাদ করলো, তার প্রবল বিরোধিতা করলো। হংকং থেকে বাবা গুরুজিৎ সিং 'কামাগাতামারু' নামে একটা জাহাজ ভাড়া করেন। এই জাহাজে কয়েক শত শিখ ও কয়েকজন মুসলিম কানাডার পথে যাত্রা করে, ভ্যাঙ্কুভারে তারা

এসে পৌঁছলে জাহাজ থেকে তাদের নামতে দেওয়া হল না। এ নিয়ে পুলিশের সাথে বাঁধলো সংঘর্ষ। তারপর তারা ভারতবর্ষে ফিরে এলেন। বজবজে এসে জাহাজ থামলো। কিন্তু এখানেও আবার পুলিশের সঙ্গে লড়াই হয়। তাতে ১৮ জন নিহত হন। এই শিখেরা বাংলার বিপ্লবীদের সাথে যোগাযোগ স্থাপন করেছিলেন। পিঙলে ও রাসবিহারী এদের সঙ্গে যোগ দিয়েছিলেন। এভাবে সর্বভারতীয় ভিত্তিতে ব্রিটিশ বিরোধী বিদ্রোহের অবসান ঘটে। বলতে বলতে মধুদার স্বর আস্তে আস্তে যেন বাতাসে মিশে গেল, একটি দীর্ঘশ্বাস ফেলে নীরব হয়ে রইলেন তিনি। ধীর, স্থির, অমায়িক ছিলেন মধুদা। তাঁর বৈপ্লবিক নিষ্ঠা ছিল অতুলনীয়। পরে জালালাবাদ যুদ্ধে তিনি প্রাণ দিয়েছিলেন।

১৯২৬ সাল। আমি তখন কিছু কিছু রিক্রুট করতে শুরু করেছি। সাধারণত যারা স্কুল-কলেজে পড়াশোনা করত তাদের পক্ষে দলে টেনে আনার কাজটুকু যতখানি সহজ-সাধ্য ছিল আমার পক্ষে ছিল ততখানি কঠিন। অপরিচিতের সাথে অযাচিত পরিচয় করে নিয়ে তাকে দলে টেনে নিয়ে আসা সত্যিই আমার পক্ষে ছিল এক শক্ত ব্যাপার। কিন্তু আমার দৃঢ় সঙ্কল্পের কারণে কাজটা হয়েছিল অপেক্ষাকৃত সহজ। অপরিচিতের সাথে থেকে পরিচয় করেছি, তাদের দলে টেনে এনেছি। কাজের ফাঁকে ফাঁকে মাঝে মাঝে মনে হ'ত আমি যদি স্কুলে পড়তাম তাহলে আরো না কতই সুবিধা হতো। বিদেশী ভাষা ইংরেজী জানার আভিজাত্য মেশানো আবশ্যকতা মর্মে মর্মে অনুভব করেছি। কিন্তু, হায়! তখন সময় চলে গেছে, তা' পাল্টানো আমার পক্ষে ছিল অসম্ভব। স্কুলে আবার ভর্তি হবার আকাঙ্ক্ষার বাস্তব ভিত্তি আর নেই বলে নিরস্তই রইলাম। কিন্তু, তার প্রতিক্রিয়া হয়েছিল জোরদার।

রাজনৈতিক বই পুস্তক আরো বেশি করে পড়তে থাকি। দলে টেনে আনার কাজে ছাত্রবন্ধু বা তরুণদের কাছে আমাদের বক্তব্যটুকু আরো জীবন্ত করে তুলে ধরতে চেষ্টা করেছি। বিভিন্ন বাধা ও প্রতিবন্ধকতা সত্ত্বেও রিক্রুট করা ও সংগঠন তৈরী করার কাজে এগিয়ে গেছি, ব্যর্থতা তেমন ছিল না, সফলতা অর্জন করেছিলাম অনেকখানি। নিরলস কাজের সামর্থ্য, শারীরিক ক্ষিপ্রতা ও তখনকার দিনের কাজের উপযোগী মোটামুটি জ্ঞান অর্জন করতে পেরেছিলাম বলে শহরের বিভিন্ন অঞ্চলে এবং শহরের বাইরে গ্রামে বিভিন্ন স্থানে সংগঠন খাড়া করেছিলাম। তবে এ-সব কাজে আমার দীর্ঘ সময় লেগেছিল। শুধু ১৯২৬ সালের মধ্যে তা' সীমাবদ্ধ ছিল না।

এ সময়ে 'কাকোরী ষড়যন্ত্র মামলা' বইখানা পড়লাম। ১৯২৬ সালে

ঐ দুঃসাহসিক রাজনৈতিক রেলওয়ে ডাকাতির অভিযোগে যখন আসফাক উল্লাহ্, রামপ্রসাদ, বিস্‌মিল, রোশন সিং, রাজেন লাহিড়ীর ফাঁসি হল তখন দুঃখ, বেদনা যেমন লাগলো তেমনি আত্মত্যাগের মহিমাময় বিরল ত্যাগের দৃষ্টান্ত ও শহীদের তেজোদ্দীপ্ত চেহারাগুলো উদ্দীপ্ত করেছিল আমাকে; ঠেলে দিয়েছিল সামনের দিকে। অফুরন্ত শক্তির অধিকারী বলে মনে হয়েছিল নিজেকে। এ সময় শোভাবাজার বোমার মামলায় উপেন দা'র হল সাত বছর সাজা। এর কিছু কাল পরই শুরু হল দক্ষিণেশ্বর বোমার মামলা। আলিপুর সেন্ট্রাল জেলের ২নং ওয়ার্ডে আবদ্ধ বন্দীরা গোয়েন্দা পুলিশের সুপারিনটেণ্ডেণ্ট ভুপেন চ্যাটার্জ্জিকে ডাণ্ডা ও শাবলের আঘাতে হত্যা করে বসলো এবং ঐ হত্যা মামলায় প্রমোদ চৌধুরী ও অনন্ত হরি মিত্রকে চরম শাস্তি দেওয়া হল। আলিপুর সেন্ট্রাল জেলে এদের দু'জনের ফাঁসি হল। ওদের ঐ মহান আত্মদান অনুপ্রাণিত করলো আমাদের সকলকে। সেদিন মনে হয়েছিল আমরাও পরোয়া করি না। জীবন দিতে আমরাও প্রস্তুত।

তিন

যুব বিদ্রোহের প্রস্তুতি পর্ব

আজ বসে বসে স্মৃতির পাতাগুলো উল্টাচ্ছি। কোনটা হয়ে গেছে অস্পষ্ট ও আবছা যেন চেনা হয়ে গেছে আজ দায়, আবার কোনটা জ্বল জ্বল করে জ্বলছে স্মৃতিতে কালের ছাপ তাকে আজো ম্লান করতে পারে নি।

মাস্টার দা'র সঙ্গে প্রথম সাক্ষাৎ

মাস্টার দা'র সঙ্গে প্রথম সাক্ষাতের ঘটনা এখনও অনেকটা স্পষ্ট মনে আছে। ১৯২৮ সালের প্রথম দিকে অনন্ত দা', গণেশ দা' ও অন্যান্য সকলে মুক্ত হয়ে গৃহে অন্তরীণাবদ্ধ। মাস্টার দা' মুক্তি পেলেন আরো পরে, স্বগৃহে অন্তরীণ হয়ে তিনি তার নয়াপাড়া গ্রামে অবস্থান করছিলেন। সেদিনকার কথা আমার মনে চিরকাল জাগরূক থাকবে। মাস্টার দা'কে শহরে আসার খবর পৌঁছিয়ে দিতে হবে। আমাকে যেতে হল তাঁর ঐ নয়াপাড়া গ্রামে। বেলা চারটার সময় গিয়ে পৌঁছলাম। প্রথমে নজরে পড়লো পাতলা গোছের এক ভদ্রলোক চেয়ারে বসে আছেন। মাস্টার দা'র কথা জিজ্ঞেস করতেই বুঝলাম যে, যাঁকে জিজ্ঞেস করা হচ্ছে তিনিই হলেন মাস্টার দা'। তিনি আমার হাত ধরে ঘরে নিয়ে বসতে দিলেন। ছোট ছোট কথা অনেকগুলো জিজ্ঞেস করলেন। জিজ্ঞেস করলেন আমার কথা। মনে হল, তিনি যেন আমার অন্তঃস্থল পর্যন্ত দেখে নিচ্ছেন। মাস্টার দা'র সাথে এই হল আমার প্রথম সাক্ষাৎ। অনেকদিনের অনেক শোনা কথার মানুষটার গভীর পর্যবেক্ষণ শক্তি ও বুদ্ধির প্রখরতা দেখে শ্রদ্ধা ও বিশ্বাস আরো জোরদার হল। চুম্বকের মত তাঁর প্রবল আকর্ষণী শক্তির আওতায় যেন পড়ে গেছি। মনে হল ইনিই তিনি, যিনি আপাতদৃষ্টিতে যা অসম্ভব তা সম্ভব করে তুলতে পারেন। এতদিন যাঁর সম্পর্কে এতকথা শুনেছি তাঁর সাথে যে এভাবে হঠাৎ দেখা হবে তা ভাবতেও পারি নি। মনে হল, নতুন কিছু পেয়েছি। পরদিন সকালে শহরে ফিরে এলাম।

মাস্টার দা', অনন্ত দা', গণেশ দা' ও অন্যান্য সকল রাজবন্দী জেল থেকে বেরিয়ে আসার কিছুদিন পর থেকেই দিকে দিকে বিভিন্ন এলাকায় শরীর-চর্চার ক্লাবগুলো গড়ে উঠতে থাকে। সদরঘাট, চন্দনপুরা, দেওয়ান বাজার টেরিবাজার, নন্দন কানন ও অন্যান্য জায়গায়ও ক্লাব গড়ে ওঠে। সদর-ঘাট ক্লাব হল এর মধ্যে নামকরা। শহরের এই ক্লাবগুলোর প্রভাব দিকে দিকে ছড়িয়ে পড়লো, গ্রামে গ্রামে এখানে সেখানে অনেকগুলো ক্লাব গড়ে উঠলো। বেশির ভাগ তরুণ ছাত্রই ঐসব ক্লাবে ব্যায়াম চর্চা করতো। বক্সিং, যুযুৎসু, ছোরা, লাঠিখেলা, প্যারালেল বার, হরাইজেন্টাল বার, গদাঘুরানো, ডন, বৈঠকীমারা, ভার উত্তোলন ইত্যাদি যান্ত্রিক ও অযান্ত্রিক শারীরিক চর্চা হতো। শরীরগুলো বেশ সুগঠিত হয়েছিল। বিভিন্ন জায়গায় শারীরিক চর্চা কৌশল, শারীরিক ক্ষিপ্রতা ও শক্তির কেন্দ্রীভূত সমাবেশ দেখানো হতো। চলন্ত মোটরগাড়ি থামানো, মোটা চ্যাপ্টা লোহার পাত বাঁকানো ও ভার উত্তোলনে দর্শকবৃন্দ বিস্ময়াবিষ্ট হতো; যুযুৎসু ও বক্সিং খেলা দর্শকবৃন্দের মনে জঙ্গী মনোভাবের প্রেরণা দিত। ডন ও বারে ক্ষিপ্রতা প্রদর্শনে হাততালি ও বাহবার ধ্বনি চারিদিক গুঞ্জরিয়ে উঠতো, পেশীনর্তন ইত্যাদিতে সুন্দর সুগঠিত শরীরের পরিচয় বহনে অন্যান্য সকলকে উৎসাহ প্রদান করতো। ছাত্র, তরুণেরা ক্লাবের ও ক্লাব সংগঠকদের প্রতি আকৃষ্ট হতো। আবার এই ক্লাব সংগঠকেরাই ছিলেন বিপ্লবী দলের সাধারণ কর্মী বা নেতা।

সেদিন এই রাজনীতি মেশানো ক্লাব আন্দোলনের ফলে শহরে তো বটেই, জেলার প্রতি গ্রামে গ্রামে তরুণ ছাত্রদের বেশির ভাগই দলে বা দলের আওতায় এসে পড়েছিল। তখনকার দিনে তরুণ দেখলেই বা তার সঙ্গে খানিকক্ষণ কথাবার্তা বললেই বোঝা যেত যে, সে কোন না কোন দলের সদস্য। তার কথাবার্তা, চালচলন ইত্যাদি সবটাই যেন একটা শৃঙ্খলার সাক্ষ্য বহন করতো। গুণ্ডামী, ছিঁচকেপনা, বদমাইশি ইত্যাদি সমাজ-বিরোধী ঝোঁকটা তরুণদের ভেতর খুব কমই ছিল। গুণ্ডা, বদমাইশেরা বিপ্লবীদলের সদস্যদের যমের মত ভয় করত, তারা থাকতো ভয়ে ভয়ে। অনন্ত সিংহ, লোকনাথ বল প্রমুখের নাম শুনলেই তারা আতঙ্কিত হয়ে উঠতো। সেদিনকার সেই গুণ্ডা বিরোধী অভিযানে অন্যান্যদের মতো আমারও খানিকটা অবদান ছিল বললে অত্যুক্তি করা হবে না। যা হোক, সেদিনকার পরিস্থিতি ছিল উপরোক্ত ধরনের।

সেই সময়ে বা এর কিছুকাল আগে ত্রৈলোক্য মহারাজ প্রমুখ অনুশীলন সমিতির বিপ্লবী নেতারা চট্টগ্রামে এসেছিলেন। তিনি এসেছিলেন

যুগান্তর ও অনুশীলন পার্টি দুটো যেন পরস্পর ঐক্যবদ্ধ হয়ে কাজ করতে পারে—ঐ উদ্দেশ্যকে সফল করার জন্য। আমি সেদিন বিকেলবেলা সেনগুপ্তের বাসার সামনের রাস্তা দিয়ে যাচ্ছিলাম, দেখলাম মহারাজ রাস্তার দিকে পেছন ফিরে দোতলায় কার সাথে কথা বলছেন। তাঁকে দেখবার জন্য খুবই উৎসুক ছিলাম। 'বাংলায় বিপ্লববাদ', 'অপ্রকাশিত রাজনৈতিক ইতিহাস' বইতে তাঁর কথা পড়েছি। ১৯১৮ সালে ইণ্ডিয়া ডিফেন্স এ্যাক্ট-এর আওতাধীন একটি মামলায় তাঁর দশ বছরের কারাদণ্ড ও দ্বীপান্তর হয়েছিল, পরে তিনি রাজবন্দী হয়েছিলেন, চোখের সামনে এই সেই লোক। তাঁর সাথে কথা বলতে পারলে সেদিন খুব খুশিই হতাম।

ঐক্যবদ্ধ হয়ে কাজ করার আকাঙ্ক্ষা সাধারণ কর্মীদের ভেতর বেশ ছিল বলে মনে হয়। বিভিন্ন ঘটনাবলীর ঘাত-প্রতিঘাতে কর্মী ও নেতাদের বেশ একটা জোরদার অংশ উপরোক্ত দুটো পার্টি ঐক্যবদ্ধ হয়ে আশু সক্রিয় পন্থা গ্রহণ করুক—এই প্রবল ইচ্ছা পোষণ করতেন। তাই, ১৯২৪ সাল পর্যন্ত উক্ত দু'পার্টির বন্দীরা উপলব্ধি করেছিলেন ঐক্যবদ্ধ হয়ে কাজ করার সার্থকতা। অনেক সময় নীতি এক হলেও কৌশলগত পার্থক্যের দরুণ ঐক্যপ্রচেষ্টা দুঃসাধ্য হয়ে পড়ে। এছাড়া, সঙ্কীর্ণ দলীয় স্বার্থও ঐক্যের পথে বাধার সৃষ্টি করে। মনে হয়, ঐ দুটো কারণের মধ্যে সংকীর্ণ দলীয় স্বার্থ ছিল ঐক্যের পথে প্রধান বাধা। তাই, ত্রৈলোক্য মহারাজের চট্টগ্রামে আগমন ছিল দলীয় ঐক্য প্রতিষ্ঠার তীব্র আগ্রহের প্রতিফলন। কিন্তু, ঐক্য প্রতিষ্ঠার সমস্ত চেষ্টা ব্যর্থ হয়।

পুরাতন বিপ্লবী নেতৃবৃন্দের সাথে কৌশলগত পার্থক্য হওয়ার দরুণ উক্ত দু'পার্টির সৎ কর্মীরা পুরাতন পার্টি থেকে বেরিয়ে এসে 'রিভল্ট পার্টি' নাম দিয়ে একটা পার্টি খাড়া করেছিলেন। জেলে থাকাকালীন ঐ পার্টির কর্মী ও নেতৃবৃন্দের সাথে আশু সক্রিয় কাজের একটা সমঝোতা হয়। পরের দিকে, জেল থেকে বেরিয়ে আসার পর ময়মনসিংহের প্রতুল ভট্টাচার্য ও বরিশালের নিরঞ্জন সেন প্রমুখ নেতৃবৃন্দও চট্টগ্রামে আসেন, পারস্পরিক পাকাপোক্ত আলোচনা ও সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়। বোমা তৈরির অভিজ্ঞতা সম্পন্ন চট্টগ্রামের নেতাদের কাছ থেকে বোমা তৈরির ফরমুলা শিখে তাঁরা তাঁদের স্ব স্ব স্থানে ফিরে যান।

ঐ সময়ে, ১৯২৮ সালে, জনপ্রিয়তা অর্জন করার জন্য এবং রাজনৈতিক কর্মী হিসাবে পরিচিতি লাভের উদ্দেশ্যে একটি রাজনৈতিক সম্মেলন ডাকা হয়। সুভাষচন্দ্র বসু, যতীন্দ্রমোহন সেনগুপ্ত, অধ্যাপক জ্যোতিষ বসু, অধ্যাপক নৃপেন্দ্রচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়, শ্রীযুক্তা লতিকা বসু প্রমুখ বিশিষ্ট নেতা ও নেত্রীবর্গ সম্মেলনে উপস্থিত ছিলেন। ঐ সম্মেলন বেশ সফল হয়েছিল।

জেলার দূর-দূরান্ত অঞ্চলে এর প্রভাব পড়েছিল। সম্মেলনের প্রস্তুতিতে জেলায় যে সাড়া পড়েছিল তাতে কংগ্রেসের বনেদী নেতৃত্ব শঙ্কিত হয়ে পড়েছিলেন এবং তারা প্ররোচনা ও উস্কানি দিয়ে তা পণ্ড করতে চেয়েছিলেন। কিন্তু তাদের সে চেষ্টা সফল হয় নি। বরং রাজনৈতিক সম্মেলন, যুব সম্মেলন, ছাত্র সম্মেলন, নারী সম্মেলন সাফল্যমণ্ডিত হয়েছিল এবং তার মাধ্যমে মাস্টার দা', অনন্ত দা', গণেশ দা' ও লোকা দা' প্রমুখের নাম চারিদিকে ছড়িয়ে পড়েছিল।

মাস্টার দা' ও অম্বিকা দা' আমার বাসার সামনে বড় রাস্তাটির পাশে ভাড়াটিয়া হিসাবে এক বাড়িতে থাকতেন। ডি. আই. বি এবং সাধারণ লোকের চোখ এড়ানোর জন্য গভীর রাত্রে অন্ধকারে গা ঢাকা দিয়ে মাস্টার দা'র সাথে দেখা করতাম। তাঁর সাথে সাংগঠনিক বিষয়ে কথাবার্তা হতো, আলোচনা মারফত তিনি কাজের নির্দেশ দিতেন। অবশ্য-করণীয় বলে সোৎসাহে তা মেনে নিতাম। কাজের সাফল্যে গৌরব অর্জন করার আকাঙ্ক্ষা যেমন ছিল তেমনই তাঁর কাছ থেকে প্রশংসা নেবারও কম লোভ ছিল না।

বিপ্লবী দলে আসার পর থেকেই অনেকদিন ভেবেছি, কোন কোন বন্ধুর সাথে আলাপও করেছি যে, পিতৃদত্ত সামান্য অর্থটুকু কি উপায়ে সেভিংস ব্যাঙ্ক থেকে তুলে নিই, সাবালক না হওয়া পর্যন্ত তো তুলবার কোন উপায়ও ছিল না। কিন্তু সুযোগ আমার এসে পড়ল। ১৯২৯ এর প্রথম দিকে আমাদের গ্রামের বাড়িখানা পুড়ে যায়। টিন কিনে ঘরে টিনের চাল দেওয়ার জন্য দাদা, কাকা ইত্যাদি সেভিংস ব্যাঙ্ক থেকে টাকা তুলবার জন্য আমাকে পীড়াপীড়ি করতে থাকেন। তাঁদের দ্বারা প্রেরিত তাঁদেরই এক বিশ্বস্ত ব্যক্তির উপস্থিতিতে আমি নিজে সুদসহ সমস্ত টাকা তুলে নিই। কিন্তু টিন কেনার জন্য তাঁদের শুধু সুদটুকুই দিয়েছিলাম। বাকি ছয়শত টাকা সেদিন পার্টির হাতে তুলে দেই।

দু'দিন পরেই মাস্টার দা' আমার সঙ্গে দেখা করলেন। তিনি সবেমাত্র শহর সংগঠনের দায়িত্ব গ্রহণ করেছেন। আমার অভাবের কথা উল্লেখ করে বললেন, আমি যেন আমার টাকাটা ফেরত নিয়ে নেই। প্রয়োজন হলে তিনি পরে যখন চাইবেন তখন যা দিতে পারি তাই যেন দেই। কিন্তু তাতে আমার মন সায় দিল না। আমি কিছুতেই ঐ টাকা ফেরত নিতে রাজি হলাম না। জানালাম, আমার সবই তো পার্টির জন্য। যা দিয়েছি তা পার্টির জন্যই দিয়েছি। ও টাকা আর ফেরত নেওয়া চলে না। শুনে মাস্টার দা'র মুখ আনন্দে উজ্জ্বল হয়ে উঠেছিল। তিনি খুশি হয়ে আমাকে উৎসাহ দিয়ে বলেছিলেন, বাঃ এইতো চাই।

এর কিছুদিন পর জেলা কংগ্রেসের নির্বাচনী সভা হল। অম্বিকা দা' ও

অন্যান্যদের নির্বাচনী কৌশলের ফলে মাস্টার দা'র মনোনীত প্রার্থীরা সবাই জয়ী হলেন। ক্ষেপে গিয়ে সাবেক কংগ্রেস সদস্যরা পরাজয়ের বদলা নেবার জন্য আমাদের উপর হামলা চালালো। আমাদের কিশোর বন্ধু সুখেন্দু দত্ত মারাত্মকভাবে ছুরিকাহত হল। মাস্টার দা'ও মাথায় প্রচণ্ড চোট পেলেন। দর দর করে রক্ত ঝরতে লাগলো। আমরা সবাই পাল্টা বদলা নেবার জন্য মারমুখী। কিন্তু মাস্টার দা' সবাইকে উস্কানির মুখেও মাথা ঠাণ্ডা রাখার নির্দেশ দিয়ে একটা অবাঞ্ছিত পরিণতি এড়ানোর কৌশল নিলেন। কারণ ঐ মুহূর্তে তা সংগঠনের জন্য মারাত্মক ক্ষতিকর হতো।

প্রস্তুতির আরেক ধারা : অর্থ ও অস্ত্র

মাস্টার দা', অনন্ত দা', গণেশ দা' ও অন্যান্য নেতৃবৃন্দ তখন উপলব্ধি করতে পেরেছিলেন বিপ্লবী আন্দোলনকে অগ্রসর করে নিতে হলে সর্বপ্রথম যেমন বিপ্লবী ক্যাডার দরকার তেমনি চাই অর্থ ও অস্ত্র। বিপ্লবীদের অতীত ডাকাতি ইত্যাদির ফলে মূল কাজ এগোচ্ছিল না। ডাকাতির পরপরই অনেকেই গ্রেপ্তার হয়ে পড়তেন। তাই তাঁরা স্থির করেছিলেন, ডাকাতি করে নয়, দলের সদস্যরাই শক্তি ও সামর্থ্যানুযায়ী নিজেরাই বা নিজেদের বাড়ি থেকে টাকা জোগাড় করে দেবেন। যাঁরা আত্মত্যাগের চরম নিদর্শন রেখে যাবেন তাঁদের কাছে এ তুচ্ছ ব্যাপার। এ ছাড়া কে কতখানি ত্যাগ স্বীকার করতে পারে এটা তারও একটা পরীক্ষা। তাই সেদিন ত্যাগের জন্য যেন হিড়িক পড়ে গিয়েছিল, যেন 'কেবা আগে প্রাণ করিবেক দান'। দিন, মাস, বছর শুধু নয়, কয়েকটা যুগই চলে গেছে তবুও আজ সেসব দিনগুলো ভুলতে পারি নি। অল্প কয়েকদিনের ভেতরই প্রায় বার হাজার টাকা উঠেছিল, আজকের দিনে তার মূল্য হবে প্রায় কয়েক লক্ষ টাকার সমান।

সেদিন নিজের বাড়ি থেকে যারা অর্থসংগ্রহ করেছিল সেগুলো ছিল এক একটা ছোট ছোট রোমাঞ্চকর কাহিনী এবং ত্যাগেরই বিভিন্ন জ্বলন্ত নিদর্শন। এদের মধ্যে শ্রীপতি চৌধুরী, হরিপদ মহাজন, জীবন ঘোষাল, লাল মোহন সেন, অর্ধেন্দু দস্তিদার ও অনিল দাশ ইত্যাদি আরো অনেকে ছিলেন। আজ স্মরণ পথে বারবার তাদের কথা উদয় হচ্ছে। মনে হচ্ছে, ঐ রকম ত্যাগী ও কর্মী বীরের দল না থাকলে উদ্দেশ্য বাস্তবায়িত করা ছিল কঠিন ও শক্ত।

ক্যাডার এলো, অর্থ হলো, এখন প্রয়োজন অস্ত্রের। এই অর্থের সাহায্যেই অস্ত্র এবং অস্ত্র তৈরির মালমশলা কেনা যেতে পারে। কেনা হবে রিভলবার, পিস্তল, ভোজালি ও এসিড ইত্যাদি এবং আরও কত সাজসরঞ্জাম।

অনন্ত দা'ই প্রধানত অস্ত্র-শস্ত্র যোগাড় করতেন, গোপনে কেনার ব্যবস্থা

করতেন। তখনকার দিনে কলকাতাই ছিল প্রধান কেন্দ্র। বিভিন্ন বিদেশী স্মাগলারের কাছ থেকে তা কিনে নিতেন। আমাদের হেফাজতে আগেও কিছু কিছু অস্ত্র-শস্ত্র মজুদ ছিল। জার্মানীর তৈরি বিখ্যাত মশার পিস্তল ছিল একটা, যে ধরনের পিস্তল বালেশ্বরের যুদ্ধে ব্যবহৃত হয়েছিল ইংরেজ সৈন্যের বিরুদ্ধে, কোল্ট রিভলবার দুইটা, হাতির দাঁতের হাতল দেওয়া, নয়টা চেম্বারওয়ালা অদ্ভুত আরো একটা রিভলবার, ছয় গুলীওয়ালা পিস্তল একটা, নয় গুলীওয়ালা বড় পিস্তল দুটো আর কয়েকটা ডেগার ও ভোজালি। এছাড়া উনিশটি ছিল লোহার তৈরি বোমার খোল। কিন্তু কাজের অনুপাতে তা তেমন বেশি কিছু ছিল না। নতুন দিনের জন্য, রক্তের যে হোলিখেলা চলবে তার জন্যে ঐ মালমশলা নিতান্ত কমই বলতে হবে। যদিও রাজশক্তির তুলনায় বিপ্লবীদের প্রথমে অস্ত্রবল কম থাকাটাই স্বাভাবিক। তবুও প্রয়োজন মেটাবার নিম্নতম একটা ব্যবস্থা তো চাই। রিভলবার পিস্তল ইত্যাদি চড়া দামে হলেও আরো যোগাড় করা চাই। বোমা তৈরির খোল কিছু থাকলেও তার মধ্যে মশলা ঢোকানোর কাজ বাকি ছিল।

নিরলস চেষ্টা চলতে থাকে। সর্বমোট রিভলবার ও পিস্তল উনিশ-টার কোঠায় উঠলো। এর মধ্যে সাতটাই ছিল নয় গুলীওয়ালা পিস্তল। ছোট ছোট রিভলবারের সংখ্যা ছিল ৫-৬টার মত। ডেগার ও ভোজালি মিলে ৪০ খানা হল। আবার একটা বোমা ৩২টা বুলেটের সমান, খাঁজ কাটা শেল ফাটলে ৩২ খানা লোহার টুক্‌রা বুলেটের মত চারিদিকে ছুটে চলবে। এছাড়া এগারোটা লাইসেন্স করা ব্রীজলোডার বন্দুক যোগাড় হয়েছিল। দলীয় সভ্যেরা বাড়ী থেকে গোপনে বন্দুকগুলো নিয়ে এসে পার্টির হেফাজতে দিয়ে দেয়।

সাথে সাথে বোমা তৈরির কাজও চলছিল। পিকরিক এসিড কেনা হল, পিকরিক পাউডার তৈরি হল এবং খোলে ঢুকিয়ে পরীক্ষা-নিরীক্ষাও চলছিল।

অভাবিত দুর্ঘটনা

১৯২৯ এর শেষের দিকে হঠাৎ একদিন বোমা তৈরি করতে গিয়ে রামকৃষ্ণ বিশ্বাস সাংঘাতিকভাবে আহত হল; প্রায় সমস্ত শরীরটা পুড়ে গেল, বিশেষ করে মুখমণ্ডল। স্বভাবতই তাকে লুকিয়ে রাখতে হল। কিন্তু পুলিশ কিভাবে যেন ব্যাপারটা সম্পর্কে জেনে গেল। তারা এ ব্যাপারে খোঁজ-খবর নিতে শুরু করলো। এর কয়েক দিন পরেই জানা গেল যে আসকার দীঘির দক্ষিণ-পূর্ব কোণে যে মাটির ঘরখানা ছিল তা ঘেরাও করে তল্লাশি

করা হয়েছে। কিন্তু রামকৃষ্ণকে তাঁরা খুঁজে পেল না। অথচ রামকৃষ্ণ তল্লাশির আধঘণ্টা পূর্বেও ওখানে উপস্থিত ছিল। আসলে পুলিশ যেমন আমাদের গতিবিধির উপর লক্ষ্য রাখছিল, তেমনি পুলিশের গতিবিধির ওপরও আমাদের পক্ষ থেকে লক্ষ্য রাখা হয়েছিল। তাই পুলিশের সন্দেহ-জনক গতিবিধি ও আক্রমণের আভাস টের পাওয়ার ফলেই, মুহূর্তবিলম্ব না করেই অনন্ত দা'র বেবী অস্টিনখানি তুরন্ত তাকে নিয়ে উধাও হয়ে যায় এবং গ্রামের নিরাপদ আশ্রয়ে নেবার জন্য সাম্পানে উঠিয়ে দেয়।

এর কিছুদিন পরই আসকার দীঘির পশ্চিম পাড়ে অবস্থিত কংগ্রেস অফিসে বিকেল বেলা আবার বিস্ফোরণ ঘটে গেল। বিস্ফোরণে তারকেশ্বর দস্তিদার ও অর্ধেন্দু দস্তিদার গুরুতর আহত হল। দু'জনের সারা শরীর পুড়ে গেল। বিস্ফোরণের খানিক পরেই পুলিশ হাজির হল। মাস্টার দা', অম্বিকা দা', নির্মল দা' সেখানে উপস্থিত ছিলেন। পুলিশ জিজ্ঞেস করে, এ কিসের আওয়াজ শোনা গেল? যেন কিছুই হয় নি এমনভাব দেখিয়ে তাঁরা বললেন, "কৈ আমরা তো কোন আওয়াজ শুনি নি।" পুলিশ ঘরে ঢুকেই তন্ন তন্ন করে তল্লাশি চালালো, কিন্তু কিছুই পাওয়া গেল না। বিস্ফোরণের পর পরই সবকিছু সরিয়ে ফেলা হয়েছিল, এমনকি সামান্য দাগও মুছে ফেলা হয়েছিল। আহত দু'জনকে অন্যত্র কাছাকাছি নিরাপদ স্থানে সরিয়ে রাখা হল।

পুলিশ দল যাওয়ার পর পরই অনন্ত দা', গণেশ দা' এসে হাজির। মেডিক্যাল স্কুলের ছাত্র নরেশ রায় তখন আহত দু'জনকে শুশ্রূষায় ব্যস্ত। তারকেশ্বর তখন নিদারুণ ছট্‌ফট্‌ করছিল। পুড়ে যাওয়া ক্ষতের যন্ত্রণা সহ্য করতে না পেরে তারকেশ্বর শেষ পর্যন্ত অনুনয় করতে লাগল, "আমাকে মেরে ফেলুন আর সহ্য করতে পারছি না।" বাঁচানো যাবে না মনে করে এবং নিরাপত্তার খাতিরে অনন্ত দা' রিভলবার বের করতে যাচ্ছিলেন, এমন সময় গণেশ দা' তাঁর হাত চেপে ধরে বললেন, "কি করছ, থাম!" মাস্টার দা' নির্দেশ দিলেন, "অনন্ত, একে বাঁচাতে হবে। চিকিৎসার ব্যবস্থা কর।" মাস্টার দা'র আদেশের অন্যথা হল না। অনেক অসুবিধা ও বিপদ মাথায় নিয়ে ডাক্তার, ঔষধ ও শুশ্রূষার ব্যবস্থা করা হল এবং তাদের দু'জনকে নিরাপদ আশ্রয়ে রেখে আসা হল।

এই বিস্ফোরণে আমাদের বেশ ক্ষতি হল। তিনজন ভাল কর্মী সাময়িক-ভাবে অকেজো হয়ে পড়লো, ঐ তিনজনের মধ্যে দু'জনই ছিল বিজ্ঞানের ছাত্র।

হাই স্কুলের সামনে রাস্তার পশ্চিম পাশে জরাগ্রস্ত একতলা দালানটিতে একদিন সকাল প্রায় ন'টায় গোপনে অতি সন্তর্পণে অর্ধেন্দুকে দেখতে

গিয়েছি। তাকে দেখেই চম্‌কে উঠলাম। সমস্ত শরীর থেকে যেন চামড়া তুলে ফেলা হয়েছে, কালো অর্ধেন্দু যেন সাদা হয়ে গেছে। সে বসে বসে শরীরে কি একটা মলম লাগাচ্ছিল। আমাকে দেখেই তার চিত্তজয়ী আকর্ষণীয় হাসিটুকু ছড়িয়ে বললো, "দেখুন, কি সুন্দরই না হয়ে গেছি।" এক নাগাড়ে সে-ই কথা বলে চলে। শেষে বলল, "চামড়া আর এক পলতা উঠে গেলেও আমাকে আপনাদের পাশেই দেখবেন। হিসাব-নিকাশের সময় আমি ঠিকই উপস্থিত থাকব।" ক্ষোভ নেই, দুঃখ নেই, আঘাতের বেদনায় উদাসীন, চরম হিসাব-নিকাশের আগ্রহও ফুটে উঠেছে চোখে-মুখে। আমি বিস্মিত হলাম, ভাবলাম একেই বলে মৃত্যুঞ্জয়ী বিপ্লবী। সন্তর্পণে বেরিয়ে পড়লাম।

ঐ সময়কার আর একটি ঘটনার কথা মনে পড়ে। একদিন খুব ভোরে পূর্ব নির্দেশ অনুযায়ী আমি ১৮টা বোমার খোঁজ নিয়ে কলেজ রোডস্থ টিলার ওপরে আনন্দ গুপ্তের বাসায় গেছি। দেখলাম আমাদের দলের কয়েকজন আশেপাশে পাহারা দিচ্ছে। অনন্ত দা' আমাকে আসতে বললেন। দেখলাম তার সমগ্র দেহখানি টিনের পোষাকে আবৃত। বোমা তৈরির পরীক্ষা-নিরীক্ষা চলছে, খোলে স্ট্রাইকার ফিট করে ছুঁড়ে ফেলা হলে স্ট্রাইকার ঠিকমত বারুদে স্ট্রাইক করে পিকরিক পাউডারে আগুন ধরতে পারে কিনা তারই পরীক্ষা চলছিল। বুঝতে বাকি রইল না যে, বোমা তৈরির কাজ অনন্ত দা' নিজেই প্রত্যক্ষভাবে তদারক করছেন। এ পরীক্ষা সফল না হওয়ায় পরে ফিউজে আগুন ধরিয়ে বিস্ফোরণ ঘটানো হল। ওটাই শেষ পর্যন্ত বহাল ছিল।

ডজনে ডজনে ভোজালি, ছোরা কেনা হচ্ছিল। তাছাড়া এদিকে আরও অস্ত্রশস্ত্র কেনা চলছিল। তার কাটার জন্য বড় বড় কাঁচি, শক্ত জিনিস ভেঙ্গে চুরচুর করা যায় এমন হাতুড়ি, চার পাঁচটা ক্রোয়ার, শাবল, বড় বড় স্ক্রু-ড্রাইভার ইত্যাদি কেনা হচ্ছিল। সম্ভাব্য সব উপায়ে প্রয়োজনীয় সাজ-সরঞ্জাম ইত্যাদি দ্রুত যোগাড় হয়ে যাচ্ছিল।

একদিন বেলা প্রায় পাঁচটার সময় আমি সাইকেলে চড়ে সদরঘাটস্থ গণেশ দা'র বাসায় যাই। বাসায় পৌঁছানো মাত্র গোপন পাহারাদার খবর দিল যে, আমি এসেছি। আমাকে তাঁর বাসার খোলা ছাদে নিয়ে যাওয়া হল। ছাদে মাস্টার দা', অম্বিকা দা', নির্মল দা', অনন্ত দা' ও গণেশ দা' এই পাঁচজনই গোল হয়ে বসে আলোচনায় ব্যস্ত। তাঁদের সামনে গুলীভরা পাঁচটা পিস্তল পড়ে আছে দেখতে পেলাম। আমি আমার যা যা করণীয় তা করে ফিরে এলাম।

আমি ছিলাম অত্যন্ত অচিহ্নিত (unmarked)। তাই পুলিশের চোখে

তেমন গুরুত্বপূর্ণ ছিলাম না। আমি যে-সংগঠন গড়ে তুলেছিলাম এবং যাদের আমি রিক্রুট করতাম তাদেরও প্রায় সবাই ছিল অচিহ্নিত। আমি সব সময়ই খুব সাবধানে চলা-ফেরা করতাম, রাস্তায় পরিচিতদের সাথে আলাপ করতাম না, দল বেঁধে হাঁটতাম না। কোন জায়গায় যেতে হলে পেছনে কেউ অনুসরণ করছে কিনা তার দিকে বিশেষ নজর রাখতাম। এমনকি, পুলিশের নজর এড়ানোর জন্য তখনকার অতি সাধের খদ্দর পড়া-টাও ছেড়েছিলাম। এছাড়া টোলে পড়তাম বলে আমার পক্ষে মস্ত বড় সুবিধা হয়েছিল মনে হয়।

যে সমস্ত অস্ত্র-শস্ত্র যোগাড় হচ্ছিল সে সব অস্ত্র বা সাজ-সরঞ্জাম ঠিক-মত নিরাপদ গোপন জায়গায় রাখবার ব্যবস্থা করার মূল দায়িত্ব ছিল মাস্টার দা'র এবং মাস্টার দা' সমস্ত অস্ত্র-শস্ত্র নিরাপদ জায়গায় ঠিকমত রাখবার দায়িত্ব ছেড়ে দিয়েছিলেন আমারই ওপর। কারণ শহরে অতি গোপন সংগঠন ছিল আমারই হেফাজতে। তাই অস্ত্র-শস্ত্র রাখার গোপন জায়গাও ছিল আমাদের যথেষ্ট। কোথায় ঐ সব রাখা হচ্ছে তা সহজে পুলিশের পক্ষে জানা সম্ভব ছিল না।

শৃঙ্খলা ও নিয়মানুবর্তিতা সম্পর্কেও আমাদের কঠোরতা ছিল যথেষ্ট। একবার কি এক অতি জরুরি কারণে অনন্ত দা'র জন্য একটা রিভলবার ও একটা পিস্তলের প্রয়োজন হয়ে পড়েছিল। মাস্টার দা'র সাক্ষাৎ না পাওয়ায় তিনি আমার কাছে ছুটে আসেন এবং রিভলবার ও পিস্তলের জরুরি প্রয়োজনের কথা বললেন। মাস্টার দা'র নির্দেশ ছাড়া দিতে পারবো না বলতে তিনি ফিরে যান। পরে একদিন তিনি মাস্টার দা'কে এ ঘটনাটি সম্পর্কে বললে মাস্টার দা' আমাকেই সমর্থন করেছিলেন। আমি ঠিকই করেছি বলে মাস্টার দা' আমাকেও বলেছিলেন। অথচ এই অনন্ত দা'ই ঐ সব অস্ত্র-শস্ত্র যোগাড় করেছিলেন। তবু শুধুমাত্র শৃঙ্খলা মানতে গিয়েই তাকে ঐ সময় অস্ত্র দেওয়া হয় নি।

প্রস্তুতির শেষ ধাপ ঃ ট্রেনিং

অস্ত্র-শস্ত্র যোগাড়ের সাথে সাথে চলছিল ট্রেনিং-এর কাজ। সাইকেল চড়া প্রায় সকলেই জানতো। তবু কঠোর নির্দেশ ছিল যে প্রত্যেককেই সাইকেল চড়া জানতে হবে। সাইকেলও আমাদের যথেষ্ট ছিল। আস্তাবল থেকে ঘোড়া ভাড়া করে নিয়ে ঘোড়ায় চড়া শেখানো হচ্ছিল। ঘোড়ায় চড়া অভ্যাস করতে গিয়ে দু'একজন জখমও হয়েছিল। অনন্ত দা', হিমাংশু সেন প্রমুখরা যখন ঘোড়ায় চড়ে বায়ুবেগে ঘোড়া হাঁকাত তখন তা বেশ চমকপ্রদ

ও রোমাঞ্চকরই লাগতো। টার্গেট প্র্যাকটিস বেশ জোরেশোরেই চলছিল। যাদের নিজস্ব বন্দুক ছিল তাদের অবশ্য সুবিধাই ছিল। কিন্তু যাদের ছিল না, তারা ঐ সব বন্দুক নিয়ে পাহাড়ে চলে যেত এবং টার্গেট প্র্যাকটিস করতো। রিভলবার প্র্যাকটিসও পুরোদমে চলছিল। আট দশজনের এক একটা দল প্রায়ই দল বেঁধে করডেঙ্গা পাহাড়ের গভীর জঙ্গলে কিংবা নির্জন সমুদ্র-সৈকতে প্রায় সারাদিন ধরে নিশানা প্র্যাকটিস করতো। আমিও কয়েকবার নিশানা প্র্যাকটিস করতে গেছি। এ ছাড়া বাছাই করা কয়েক জনকে মোটর চালানোও শেখানো হয়েছিল। অনন্ত দা'র বেবী অস্টিনখানি ঐদিক দিয়ে বেশ কাজে লেগেছিল।

ট্রেনিং চলছে পুরোদমে। হঠাৎ একদিন খবরের কাগজের মারফত জানা গেল যে কলকাতার মেছুয়া বাজারে অনেকে ধরা পড়েছেন—নিরঞ্জন সেন, সতীশ পাকড়াশী, মুকুল সেন প্রমুখ নেতৃবৃন্দও ধরা পড়েছেন এবং মেছুয়া বাজার বোম্ব কেস্ নাম দিয়ে গভর্নমেন্টের তরফ থেকে একটা মামলা সাজানো হচ্ছে। ঐ ঘটনার সঙ্গে সঙ্গে বাংলার কয়েকটি জেলায় যে সমস্ত অভিযান পরিচালনার পরিকল্পনা ছিল তা বানচাল হয়ে গেল। মেছুয়া বাজার ছিল এ ধরনের তৎপরতার একটা গুরুত্বপূর্ণ কেন্দ্র যার মাধ্যমে বিভিন্ন জেলায় যোগাযোগ করা হতো। ফলে বিভিন্ন জেলার সাথে কার্যতঃ আমাদের সম্পর্ক ছিন্ন হল। ঐ ঘটনার ফলে আমাদের কাজ আরও গোপনে, দ্বিগুণ চতুর্গুণ গতিতে চালাতে হল। তাড়াতাড়ি তৈরি হওয়া আমাদের আশু করণীয় হয়ে দাঁড়ালো। ঐ সময়কার আওয়াজ হল যেন এক মুহূর্তও নষ্ট না হয়। কাজ চলে অবিরত দ্রুত বেগে। বিশ্রাম নেই, বিরাম নেই, যত শিগগির পারা যায় লক্ষ্যে পৌঁছানো চাই। এক দিনের কাজ যেন মুহূর্তেই শেষ করতে হবে। বিলম্ব বা গড়িমসি করার অর্থই হল ব্যর্থতা, মৃত্যু। সুখেন্দু দত্তের মৃত্যু যেমন আমাদের ঝড়ো হাওয়ার বেগ দিয়েছিল, মেছুয়া বাজারের ব্যর্থতা ছিল যেন ঝঞ্ঝার বেগ, আমরা একলা একলাই তৈরি হতে লাগলাম।

কি ধরনের কাজ হবে এবং তার ব্যাপকতা ও গভীরতা কতখানি তা আমাদের মত সাধারণ কর্মীদের কাছে ছিল সম্পূর্ণ অজ্ঞাত। বিশেষ কিছু একটা ঘটবে এবং তাতে আমরা সক্রিয় অংশগ্রহণ করব—এটুকু মাত্রই ছিল আমাদের ধারণা। একমাত্র মাস্টার দা', অম্বিকা দা' নির্মল দা', অনন্ত দা', ও গণেশ দা'ই সমস্ত পরিকল্পনাটা জানতেন।

নিরলস ট্রেনিং চলছে। শারীরিক, মানসিক ও নৈতিক দৃঢ়তা সম্পন্ন একটা তরুণ যোদ্ধাদল গড়ে উঠছে। মোটামুটি অস্ত্রসজ্জাও গড়ে তোলা হয়েছে। মনের দিক দিয়ে জঙ্গী মনোভাবাপন্ন করার ট্রেনিংও চলছিল।

তখনকার দিনে ছিল নির্বাক সিনেমা, যুদ্ধের যাবতীয় ফিল্ম দেখে শিক্ষা নেবার নির্দেশ ছিল যাতে মনের নারাকাতুরে ভাবটা কেটে যেতে পারে। তখনকার দিনে প্রথম মহাযুদ্ধের ফিল্ম, "ভার্দুন" ছবিখানা সিনেমায় (বর্তমান রঙ্গম সিনেমায) দেখানো হচ্ছিল। আমাদের অনেকের মত আমিও কয়েকবারই ফিল্মটা দেখে নিয়েছি। ছবিটা দেখতে দেখতে মনে হতো যেন আমরাই কামান দাগাচ্ছি। তার এক এক গোলার আঘাতে গাছপালা মাটি পাথর সবকিছুই যেন গুড়ো গুড়ো হয়ে যাচ্ছে। আকাশে যেন আগুন লেগেছে, তার ধুমরাশিতে চতুর্দিক আচ্ছন্ন। গোলার আগুন দেখে মনে হতো যেন বিদ্যুৎ চমকাচ্ছে। পরিখাযুদ্ধ, বেয়নেট চার্জ-এর বিভীষিকায় কলিজাটা কেঁপে উঠতো, যেন সহ্য করা যাবে না। স্তূপীকৃত মৃতের পাহাড়ের ওপর দিয়ে সৈন্যরা চার্জ করছে, পরিখা দখল করছে, আবার এগিয়ে যাচ্ছে, পেছনে যে পড়ে আছে তার হদিস নেই, মরণ নেশায় তারা যেন পাগল হয়ে গেছে। এর ভিতর দিয়েই মনটা হতো শিক্ষিত ও অভ্যস্ত। হঠাৎ পাশে উপবিষ্ট সাথীদের বলে উঠতাম আমাদেরও ঐ করতে হবে। মৃত্যুর হাত ধরে রক্ত সাগরে আমাদেরও পাড়ি জমাতে হবে; কল্যাণের জন্য অকল্যাণের হাত ধরে আমাদেরও যাত্রা করতে হবে সর্বনাশের পথে।

প্রায়ই গ্রুপে গ্রুপে আলোচনা হতো। অনন্ত দা' ও গণেশ দা' গ্রুপ-গুলোর সামনে আগামী দিনের রক্তরাঙ্গা ছবিখানি কল্পনার তুলি দিয়ে এঁকে দিতেন। চতুর্দিক থেকে শত্রুর গুলির ঝড় বয়ে যাচ্ছে। রিভলবার ও রাইফেল হাতে ঐ ঝড়ের ভেতর দিয়ে এগিয়ে যাচ্ছি। এগিয়ে যাচ্ছি কখনও শুয়ে পড়ে কখনও বুকে ভর দিয়ে, কখনও অগ্রসর হচ্ছি রক্ত পিচ্ছিল পথে ঝড়ের বেগে, মৃত্যুর হিমশীতল হাতছানি আমাদের অনেকেরই গায়ে হাত বুলিয়ে যায়। 'স্বাধীনতা'—এই বলে মৃত্যুর শীতল কোলে নুয়ে পড়ে। তাঁরা বলেন, "বাংলার বুকে ইংরেজদের একজনকেও বাদ দেব না। ইংরেজদের তাজা রক্তে দেড় শো বছর গোলামির ক্লেদ ধুয়ে মুছে ফেলতে হবে। ঐ রক্তদানের ভেতর দিয়েই জন্ম নেবে স্বাধীনতার নতুন সূর্য, আসবে আমাদের স্বপ্নময় নতুন দিন।" বস্তুত ঐ ট্রেনিং অলীক স্বপ্ন ছিল না। বাস্তবের সঙ্গে সম্পর্কিত কল্পনা দিয়ে ঐ ট্রেনিং এর কাজ চালানো হতো। এক এক সময় এমন মনে হতো যেন আমরা প্রত্যক্ষ সংগ্রামে সামিল হয়েছি এবং সময় সময় পরিবেশ এমন হতো যে অংশগ্রহণকারীরা ঐ সম্মোহনী মন্ত্রে যেন আচ্ছন্ন হয়ে পড়তো।

মাঝে মাঝে আমাদের স্বেচ্ছাসেবক বাহিনী শহরের রাস্তায় রাস্তায় কুচকাওয়াজ করতো। প্রকাশ্যে এই বাহিনী কংগ্রেস ভলান্টিয়ার নামে

ছিল পরিচিত। ১৯১৯ সালে চট্টগ্রামে যে রাজনৈতিক কনফারেন্স, যুব কনফারেন্স, নারী সম্মেলন ও জিলা ছাত্র-ছাত্রী সম্মেলন হয় তখনই এই স্বেচ্ছাসেবক বাহিনীর জন্ম হয়। তারপর ঐ বাহিনীকে কংগ্রেসের অন্তর্ভুক্ত করা হল। সামরিক উর্দিপরা এই বাহিনী যখন রাস্তায় রাস্তায় কুচকাওয়াজ করতো রাস্তার দু'ধারের লোক বিস্ময়ভরা চোখে চেয়ে দেখতো। এই কুচকাওয়াজ সামরিক শিক্ষা ও সামরিক মনোভাব গড়ে তোলার দিক দিয়ে বিশেষ সাহায্য করতো।

মেছুয়া বাজারের ঘটনার পর জানুয়ারীর শেষ বা ফেব্রুয়ারীর প্রথমদিকে নির্দেশ এলো যে, দলের শহরবাসী সদস্যরা যেন সতর্ক থাকে। রাত্রে যেন গৃহে অবস্থান না করে। আমরাও তাই করলাম। অবশ্য এর কিছুদিন আগে থেকে আমি ও আরো কয়েকজন গৃহছাড়া হয়েছি। দিনের বেলা কাজকর্মে এদিক ওদিক যেতাম, রাত্রে এখানে সেখানে গোপন আশ্রয়ে পড়ে থাকতাম। দলের অধিকাংশ সদস্যরাই এরূপ করতেন। সাবধানতার সম্ভাব্য সব ব্যবস্থা করার চেষ্টা হয়েছিল। পুলিশের গতিবিধির ওপরও কড়া নজর রাখা হয়েছিল। তাদের প্রধান প্রধান কেন্দ্রগুলিতে আমাদের লোকেরা গোপন সতর্ক পাহারায় নিযুক্ত থাকতো। সন্দেহজনক কিছু ঘটলে, পুলিশের গতিবিধি দেখলেই মাস্টার দা' ও অনন্ত দা'র কাছে খবর পৌঁছে যেত এবং তাড়াতাড়ি একটা পাল্টা ব্যবস্থাও গ্রহণ করা হতো।

ফেব্রুয়ারী বা মার্চ মাসের দিকে আমাদের সকলকে বলা হল যে, আমরা সকলেই যেন খাকী উর্দি, প্যান্ট, সার্ট তৈরি করে রাখি; জুতা ও মোজার ব্যবস্থা রাখতেও যেন ভুল না হয়। এভাবে ১৯৩০ সালের জানুয়ারী, ফেব্রুয়ারী ও মার্চ মাস গড়িয়ে পড়লো। এগিয়ে এল রক্তরাঙা, স্মরণীয় এপ্রিল মাস।

এ সময়ে ভারতব্যাপীও বিক্ষোভ টগবগ করে ফুটতে থাকে। ১৯২৮ সালের দিকে ভারতবাসী স্বায়ত্তশাসনের উপযুক্ত হয়েছে কিনা তা পরখ করে দেখার জন্য ব্রিটিশ সরকার সাইমন কমিশন নামের এক কমিশন পাঠিয়েছিল ভারতবর্ষে। কংগ্রেস মুসলিম লীগ এক কথায় সমগ্র ভারতবাসী এ কমিশনকে বয়কট করেছিল। এর আগে ঔপনিবেশিক স্বায়ত্তশাসন দাবী করে নেহরু-রিপোর্ট বেরিয়েছিল। তারপরও ধূর্ত ব্রিটিশ ধাপ্পা দেবার জন্যই পাঠালো সাইমন কমিশন। কমিশন বয়কট করে ভারতবাসী তার সমুচিত জবাব দেয়। কমিশনের বিরুদ্ধে বৈধ প্রতিবাদ জানাতে গিয়ে দেশবরেণ্য নেতা লালা লাজপৎ রায় হত্যার শিকার হলেন। ভারতবাসীর মনে জ্বলে উঠল বিক্ষোভের আগুন। আমাদের তরফ থেকে শেষ বোঝা-পড়ার প্রস্তুতি চলতে থাকে। ১৯২৮ সালে কংগ্রেসে চরমপন্থীরা স্বাধীনতা

প্রস্তাব আনলো। কিন্তু গান্ধীজীর হস্তক্ষেপে প্রস্তাবটা পাশ হল না। পর বৎসরে ১৯২৯ সালে লাহোর কংগ্রেসে প্রস্তাবটা পাশ হল। ব্রিটিশ এক বৎসরের মধ্যে স্বাধীনতা না দিলে আইন অমান্য আন্দোলন শুরু করা হবে বলে কংগ্রেস ঘোষণা করলো। কিন্তু ব্রিটিশ তাতেও সাড়া দিল না, রইল অনড় ও অটল। করাচী কংগ্রেসে স্বাধীনতা লাভের জন্য আইন অমান্য আন্দোলনের প্রস্তাব হল পাশ। ভারতের এক প্রান্ত হতে অপর প্রান্ত পর্যন্ত এই আন্দোলন শুরু হল। পূর্বেকার অসহযোগ আন্দোলন থেকে এবারকার এই আন্দোলনের বিশেষত্ব হল জনতাও বুর্জোয়াদের সাথে সংগঠিত হয়ে এগিয়ে যাচ্ছিল। এবং দু' সম্প্রদায়ের জনগণ লড়াইতে নামল হিন্দু-মুসলিম হিসাবে নয়, সাম্প্রদায়িকতা ভুলে লড়াইতে নামল এই বিশাল দেশের নাগরিক হিসাবে—জাতীয়তাবাদে উদ্বুদ্ধ হয়ে। আন্দোলনের এক বিরাট প্রবাহ তরঙ্গ তুলে ছুটে চলতে থাকে। কংগ্রেস নেতৃত্বে ভারত-ব্যাপী আইন অমান্য হল শুরু। মুসলিম লীগ সাংগঠনিকভাবে রইল আন্দোলনের বাইরে এবং ব্রিটিশকে বিরক্ত না করার সুবিধাবাদী নীতির পঙ্কিল আবর্তে ঘুরপাক খেতে লাগল।

এমতাবস্থায় আমরাও শেষ বোঝাপড়ার জন্য এগিয়ে গেলাম।

ছিল।

ক

চার

চট্টগ্রাম অস্ত্রাগার দখল

১৮ই এপ্রিলের দিন চারেক আগে আমাদের করণীয় কি তা জানান হল। প্রত্যেক গ্রুপের সদস্য ও গ্রুপ নেতাকে তাদের দায়িত্ব সুস্পষ্টভাবে ভাগ করে দেওয়া হল। প্রত্যেকটা গ্রুপ তাদের উপর অর্পিত দায়িত্বের বাইরে অন্যান্য গ্রুপের কর্মধারার সাথে ছিল সম্পূর্ণ অপরিচিত। দিন চারেক আগে প্রত্যেক গ্রুপের কাজ বুঝিয়ে দেওয়ার কারণ হল: তারা স্ব স্ব গ্রুপের কাজগুলো যথাযথভাবে সুসম্পন্ন করার জন্য প্রয়োজনীয় প্রস্তুতি নিতে পারে। তারা কর্মস্থলটি দেখে আসবে, তার সঙ্গে বাস্তব পরিচিতি লাভ করবে, প্রয়োজনীয় তথ্য সংগ্রহ করবে এবং চিন্তা করবে কী ভাবে কাজটা যথাযথভাবে সফল করা যায়। এক কথায় তারা বিভোর হয়ে থাকবে বাস্তব পরিকল্পনা নিয়ে।

গোটা অভিযানের সামগ্রিক পরিকল্পনাটা আমরা জানতে পারি ঘটনার রাত্রে যখন আমরা অস্ত্রাগারে সমবেত হই। পরিকল্পনা যেমন ছিল জাঁকালো তেমনি নিখুঁত—একই সময়ে একযোগে দুটো অস্ত্রাগার দখল করা, ইংরেজদেরকে তাদের ক্লাবেই নিশ্চিহ্ন করে ফেলা, টেলিফোন-টেলিগ্রাফ ব্যবস্থা অকেজো ও ধ্বংস করে দেওয়া, রেলের মালগাড়ি লাইন-চ্যুত করে গোটা লাইন বন্ধ করে দিয়ে বাইরে থেকে সৈন্য ও রসদ ইত্যাদি আনয়নে বিলম্ব ঘটানো, এবং সেখানকার রেল লাইনের পাশের টেলিগ্রাফের তার গুলো কেটে দিয়ে চট্টগ্রামের সাথে বাইরের যোগাযোগ বিচ্ছিন্ন করা। গ্রুপগুলো তাদের নির্দিষ্ট কাজগুলো সেরে পুলিশ অস্ত্রাগারে সমবেত হবে, তারপর ওখান থেকে শহরে ঢুকে খেয়ে নেবে এক নির্দিষ্ট রেস্তোরাঁয়। তারপর ছড়িয়ে পড়বে বিভিন্ন দিকে। ট্রেজারি কব্জা করবে; খুলে দেবে জেলখানা; ডি. আই. বি কোয়ার্টার, কতোয়ালি থানা, স্থানীয় সরকারী অফিসগুলো দখল করে সেগুলোকে বিপ্লবী কোয়ার্টারে পরিণত করবে। কোর্ট বিল্ডিং হবে বিপ্লবী কেন্দ্রস্থল, সেখানে থেকেই অভ্যুত্থান ব্যাপক থেকে ব্যাপকতর করে পরিচালনা করা হবে,

এগিয়ে নেওয়া হবে। চট্টগ্রামের সমস্ত তরুণদের এই অভ্যুত্থানে যোগদানের জন্য জানানো হবে আহ্বান, বিশেষভাবে আহ্বান জানানো হবে ভ্রাতৃপ্রতিম অনুশীলন পার্টিকে। এই বিদ্রোহ বা অভ্যুত্থানকে দমন করার জন্যে ইংরেজরা বিভিন্ন জায়গা থেকে সৈন্য আমদানী করলে, সৈন্য সমাবেশ ঘটালে রাস্তায় রাস্তায়, অলিতে-গলিতে, ঘরে ঘরে হাতাহাতি যুদ্ধ করে তাদের মোকাবেলা করা হবে। এইগুলি ছিল সামগ্রিক পরিকল্পনার অন্তর্ভুক্ত।

এই সব আক্রমণ পরিচালনার জন্যে আমাদের লোকবল ছিল সর্বমোট ৬৭ জন। ঐ ৬৭ জনকে দুটো ক্যাটাগরিতে ভাগ করা হয়। প্রথমটি হল আক্রমণকারী দল বা এসল্ট গ্রুপ। এ রকম এসল্ট গ্রুপের সংখ্যা ছিল পাঁচটি। তাতে থাকবে ২১ জন লোক। দ্বিতীয়টি হল আক্রমণে সহায়ক দল বা সাপোর্টিং গ্রুপ। এ রকম গ্রুপ হবে ছয়টি। তাতে থাকবে প্রায় ৩৭ জন লোক।

একটি ইস্তাহার

১৯৩০ সালের ১৬ই এপ্রিল। সকাল নয়টা কি দশটা হবে, মিউনিসিপ্যালিটি অফিসের পাশ দিয়ে যাচ্ছি। দেখলাম, অনেক লোকজন জড়ো হয়েছে। বেশির ভাগই কংগ্রেস সদস্য। চট্টগ্রাম জেলা কংগ্রেস কমিটির সম্পাদক হিসেবে সূর্য সেনের নামে ২১শে এপ্রিল আইন ভঙ্গ করা হবে বলে ইস্তাহারও বিলি করা হয়েছে। তাই নিয়ে জটলা চলছে। জেলা কংগ্রেস কমিটির সম্পাদক সূর্য সেনের নামে যে ইস্তাহার বিলি করা হয়েছিল তাতে লেখা ছিল :

> ...... ১৯২১ সালে যেই চট্টগ্রাম ছিল সবার পুরোভাগে আজ সেই চট্টগ্রাম পশ্চাতে পড়িয়া থাকিবে—ইহা ক্ষোভ ও লজ্জার কথা। এই জেলায় লবণ আইন ভঙ্গ করার জন্য এক সত্যাগ্রহ কমিটি গঠিত হইয়াছে। এই কমিটি কি করে তাহা দেখিবার জন্য আমরা আরও কিছুদিন অপেক্ষা করিব।
>
> কাল বিলম্ব না করিয়া আমরাও ২১শে এপ্রিল হইতে আইন অমান্য করিব স্থির করিয়াছি ইহার জন্য সর্বসাধারণের সহানুভূতি চাই, সত্যাগ্রহী সেনা চাই, লোক ও টাকা চাই।
>
> শ্রী সূর্য সেন
> সম্পাদক
> চট্টগ্রাম জেলা কংগ্রেস কমিটি ।।

ঐ দিনের ঐ ইস্তাহার বিলির পেছনে দুটো উদ্দেশ্য কাজ করেছিল। প্রথমত, আমাদের সমস্ত অভিযানের প্রস্তুতি ও তৎপরতার ওপর থেকে পুলিশের নজর অন্যদিকে ফেরানো যাতে করে পুলিশ ২১শে এপ্রিলের আইন অমান্য আন্দোলন সামলানোতে ব্যস্ত হয়ে পড়ে। দ্বিতীয়ত, কংগ্রেসের তরফ থেকে জনগণের করণীয় কর্মসূচী জনগণকে জানানো।

ঐ দিন সন্ধ্যায় এক গুরুত্বপূর্ণ কাজে গণেশ দা'র বাসায় যেতে হল। ভেতরে ঢুকতেই মনে হল, সমস্ত কামরাটা যেন একটা অস্ত্রাগার। আলমারির তাকে তাকে রিভলভার, পিস্তল রয়েছে সাজানো। এক সারিতে এগারোটা বন্দুক মাথা উঁচু করে যেন দাঁড়িয়ে আছে। অন্য সারিতে ভোজালি ও ছোরাগুলো ঝকঝক করছে। বিস্ময় ও আনন্দে মনটা ভরে উঠলো। কাজ শেষ করে ফিরে চললাম। ভাবলাম, এই তো শেষবারের মত আসা। স্বাধীনতার যুদ্ধে যাচ্ছি, মৃত্যু অনিবার্য।

অভিযান শুরু

১৮ই এপ্রিল ১৯৩০ সাল। ভোরে গোপন আস্তানা থেকে বের হলাম সাইকেলে চড়ে। এদিক-ওদিক টুকিটাকি কাজ সারতে সারতে দুপুর গড়িয়ে গেল। হোটেলে খেয়ে নিয়ে আস্তানায় ফিরে গেলাম বিশ্রাম ও অভিযানের প্রস্তুতির জন্যে।

বিকেলে আমাদের একটা গ্রুপ একটা মোটরগাড়ি ভাড়া করে কুমিরার দিকে রওয়ানা দিল। বেশ কয়েক মাইল যাওয়ার পর গাড়িটি থামানো হল। রিভলভার দেখিয়ে ড্রাইভারকে নামিয়ে দেওয়া হল গাড়ি থেকে। তারপর তার হাত-পা বেঁধে রাস্তার ধারে ক্ষেতের উপর ফেলে রেখে মোটরটা চালিয়ে আনা হল শহরে। আগে থেকেই আমাদের আরও দু'খানা মোটর গাড়ি যোগাড় করা ছিল—একটা হল অনন্ত দা'র বেবী অস্টিন, অন্যটা হল সদ্য কেনা সেভ্রোলেট গাড়ি। ড্রাইভারের কাছ থেকে ছিনিয়ে আনা গাড়ি সমেত মোট তিনখানা গাড়ি আমাদের হাতে জমা হল। ঠিক ছিল, আর একটা গাড়ি ঠিক সময়ে পাওয়া যাবে। কিন্তু দেখা গেল, সময় উড়ে যাচ্ছে, অথচ গাড়ির দেখা নেই। দেরি হলে বিপুল ক্ষতি হবার আশঙ্কা। অপেক্ষা করা হবে মারাত্মক অপরাধ। তাই হিমাংশু সেনকে পাঠানো হল লালদীঘির পাড়ে মোটরের আড্ডায় আরেকটা গাড়ি ভাড়া করার জন্য। প্যারেড ময়দানে সেদিন মুসলিম কনফারেন্স চলছিল। আর বিখ্যাত কুস্তিগির গামা ও হামিদা পালোয়ানের আগমনে মোটর গাড়িগুলো ভাড়া হয়ে গিয়েছিল। তবে

অনেক কষ্টে বেশ কিছুক্ষণ পর কোন রকমে একখানা মোটর যোগাড় করে আনলো হিমাংশু। মোটর গাড়িটি থামানো হল গণেশ দা'র বাসার সামনে। হিমাংশু দ্রুত নেমে পড়লো। ঘরের ভেতর থেকে মাল বয়ে আনতে সাহায্য করতে হবে—এই অজুহাতে ড্রাইভারকে ভুলিয়ে নেওয়া হল ঘরের ভেতরে। ভেতরে পা ফেলতেই অনন্ত দা' তার বুকের উপর রিভলভার নিশানা করে হুকুম দিলেন ওখানে শুয়ে পড়তে। হুমকি দিলেন, টু শব্দটি পর্যন্ত না করতে। তারপর তার হাত-পা বেঁধে রেখে বাইরে থেকে দরজায় তালা লাগিয়ে মোটর হাঁকালেন তড়িৎ গতিতে। এভাবে শেষ পর্যন্ত চারখানা মোটর গাড়ি এল আমাদের হেফাজতে।

কাজ শুরু হবার কথা ছিল রাত আটটায়। কিন্তু মোটর গাড়ি যোগাড় করতে দেরি হয়ে গেল বলে ঠিক হল অপারেশন শুরু হবে রাত দশটায়। দশটা বাজবার পাঁচ মিনিট আগে প্রথমেই টেলিফোন-টেলিগ্রাফ অফিস অকেজো ও ধ্বংস করে দিতে হবে। তারপরই অন্যান্য গুরুত্বপূর্ণ জায়গায় যুগপৎ আক্রমণ শুরু হবে।

অম্বিকা দা' ছিলেন টেলিফোন-টেলিগ্রাফ অফিস অকেজো করার গ্রুপটির পরিচালক ও নেতা। ঐ গ্রুপে আমরা ছিলাম সাত জন। এদের মধ্যে তিন জনের কাছে ছিল রিভলভার, বাকি চারজন ছিল ভোজালি ও ছোরায় সজ্জিত। অম্বিকা দা'র সাহায্যকারী হিসেবে ঘটনাস্থলে শত্রুর মোকাবেলা করার জন্য, কাজ সম্পন্ন করার সময় সতর্ক পাহারা দেওয়া, নিখুঁতভাবে কাজ চলছে কি না তা লক্ষ্য রাখার জন্য আমার ও অন্য এক-জনের উপর বিশেষ দায়িত্ব দেওয়া হয়েছিল। অন্যান্য প্রত্যেকেরই নির্দিষ্ট কাজের দায়িত্ব ছিল। একজনের হাতে ছিল সের পাঁচেক ওজনের মস্ত এক হাতুড়ি, একজনের হাতে ছিল তার কাটার বিরাট কাঁচি, একজনের হাতে ছিল আগুন ধরানোর মাল-মশলা, একজনের হাতে ছিল পেট্রোল ভর্তি টিন।

টেলিফোন-টেলিগ্রাফ অফিসে হামলা

রাত দশটা বাজবার পাঁচ মিনিট আগে আমাদের কাজ শুরু হওয়ার কথা। সন্ধ্যার অন্ধকারে ইউনিফর্ম পরে, কাঁধে মিলিটারী থলে ও পানি খাবার ডিব্বা ঝুলিয়ে আসকার খাঁর দীঘির পশ্চিম পাড়স্থ কংগ্রেস অফিসে উপস্থিত হলাম। থলের ভিতরে ছিল লুব্রিকেটিং অয়েল, টর্চ, আয়োডিন, ব্যাণ্ডেজ ইত্যাদি। বুকে ইউনিফর্মে রিপাবলিকান সৈন্যদলের ব্যাজ আঁটা ছিল। হাতের কব্জিতে ছিল রিস্ট ওয়াচ। রাত নয়টা বাজলো। অফিসের

সামনের ময়দানে এসে দাঁড়ালাম। কী একটা অব্যক্ত রোমাঞ্চকর অনুভূতি সমস্ত মনটাকে আচ্ছন্ন করে চলেছে।

কি যেন ভাবছিলাম। হঠাৎ চমকে উঠলাম মোটর গাড়ির শব্দে। দশটা বাজতে আরও দশ মিনিট বাকি। আকাশ-পাতাল জোড়া ঘন পীচের মত অন্ধকারে ইঙ্গিতেই আমরা ছয় জন মোটরে চেপে বসলাম। শোঁ শোঁ করে বায়ুবেগে মোটর গাড়ি চলেছে। আনন্দ গুপ্ত মোটর গাড়ি চালাচ্ছিল। জামাল খাঁ রহমতগঞ্জ এলাকা পেরিয়ে মিউনিসিপ্যাল অফিস পাশ কাটিয়ে কাটা পাহাড়ের রাস্তায় মোটর গাড়ি ঢুকলো। টেলিফোন-টেলিগ্রাফ অফিসের ঠিক পেছনে কাটা পাহাড়ের রাস্তা থেকে পাহাড়ের উপর ঐ অফিসে উঠবার যে রাস্তা আছে তার কাছেই মোটর গাড়িটা ঝট করে থামলো। তুরন্ত আমরা সাতজনই নেমে পড়লাম। অম্বিকা দা' সবার সামনে রইলেন। আমরা খোলা রিভলভার, অস্ত্র ও অন্যান্য সাজসরঞ্জাম সহ কেউ তাঁর পাশে, কেউ তাঁর পেছনে অগ্রসর হচ্ছি। পাহাড়ে ওঠা শেষ। সামনেই টেলিফোন অফিস। একজন অপারেটর টেলিফোন বোর্ডের সামনে চেয়ারে বসে কাজ করছে। হঠাৎ ঘরের বাইরে ইউনিফর্ম পরা অস্ত্রশস্ত্রে সজ্জিত সাতজন লোক দেখে ভয়ে বিস্ময়ে সে হতভম্ব—যেন মুহূর্তেই সে মূর্চ্ছিত হয়ে পড়বে। বেরিয়ে আসার জন্য হুকুম দিলেও সে অনড়, যেন সে চলার শক্তি হারিয়ে চেয়ারের সঙ্গে লেগে রয়েছে। অম্বিকা দা' বাইরের দিকে নিশানা করে এক রাউণ্ড ফাঁকা গুলি ছুঁড়লেন। তারপর অপারেটরকে টেনে হিঁচড়ে বারান্দায় নিয়ে আসা হল। সে হাত জোড় করে ভেউ ভেউ করে কান্না শুরু করে দিল। আনন্দ বলে উঠলো, 'অম্বিকা দা', একে গার্ড দিন।' মুহূর্তেই পাঁচ-সেরী ওজনের হাতুড়ির আঘাতে টেলিফোন বোর্ডখানা টুকরো টুকরো হয়ে ভেঙ্গে পড়লো। সঙ্গে সঙ্গেই বিরাট লম্বা কাঁচিটা দিয়ে সংযোগ তার কেটে দেওয়া হল। অন্যজন টেলিফোন যন্ত্রপাতিতে ও ঘরে পেট্রোল ছিটিয়ে দিল। আরেকজন আগুন ছুঁড়ে দেওয়ার সাথে সাথে দাউ দাউ করে ঘরময় আগুন জ্বলে উঠলো। সারা ঘরটাই যেন হয়ে উঠলো বিরাট এক অগ্নিকুণ্ড।

টেলিফোন অফিস ধ্বংস করার পর সবাই পাশের টেলিগ্রাফ অফিসে গিয়ে উঠলাম। কিন্তু সেদিন সকাল সকাল অফিস বন্ধ হয়ে গেছে। লোহা ও কাঠের তৈরী ঐ শক্ত দরজা ভাঙ্গতে হলে দীর্ঘ সময়ের দরকার। অথচ নির্ধারিত সময়ের মধ্যে কাজ শেষ করে কেন্দ্রে চলে যেতে হবে। আবার গুলির শব্দ শুনে এখানকার ইংরেজ বাসিন্দাদের রাইফেল নিয়ে এদিকে আসার আভাস পাওয়া গেল। টেলিগ্রাফ অফিসের দরজা ভাঙ্গতে গেলে একদিকে যেমন দেরি হবে অন্যদিকে রাইফেলের সাথে রিভলভারের অসমান

লড়াই চালাতে হতে পারে এবং তাতে সমূহ ক্ষতি হবারই আশঙ্কা থেকে যায়। তাই অম্বিকা দা' নির্দেশ দিলেন তাড়াতাড়ি নেমে গাড়িতে বসতে। আমরা সাত জন—অম্বিকা দা', অনিল গুহ, বীরেন দে, নিরঞ্জন রায়, শম্ভু দস্তিদার, আনন্দ গুপ্ত ও আমি—সামনের সিঁড়ি বেয়ে ঝটপট রাস্তায় নেমে পড়লাম। তারপর দ্রুত পেছনে গিয়ে আমাদের গাড়িতে এসে উঠলাম। গাড়িখানা শোঁ শোঁ করে দ্রুত চলতে লাগলো। মুহূর্তেই বুদ্ধমন্দির অতিক্রম করলাম। পলক পড়তে না পড়তেই পল্টন রাস্তায় গাড়ি এসে পড়লো। তারপর দামপাড়ার দিকের রাস্তায় ঢুকলাম। ওয়াটার ওয়ার্ক-সের সামনে আসতেই কড়া সুরে চ্যালেঞ্জ এলো—Halt, who comes there ? (কে আসছো, থাম)। জবাবে অম্বিকা দা' বললেন, friends (বন্ধুরা)। মাস্কেটধারী প্রহরী রাস্তা ছেড়ে দিল। মোটর তারপর এসে থামলো টিলার উপর পুলিশ আর্মারির সামনে। আমরা ঝট্‌পট্‌ করে নেমে পড়লাম।

টেলিফোন-টেলিগ্রাফ অফিসে যখন আমরা আক্রমণ চালাই তখন সারা শহরে প্রচারপত্র মারফত বিপ্লবী ঘোষণা প্রচার করা হয়। আমাদের নিজস্ব গোপন প্রেস থেকেই ঐ প্রচারপত্র ছাপানো হয়েছিল। ঘোষণার ভাবার্থটুকু শুধু মনে আছে। এতে বলা হয়েছিল, দেড় শো বছরের পরাধীনতার শৃঙ্খল ভাঙতে আমরা চলেছি। এই দেড় শো বছরের অন্তহীন অত্যাচার, নিপীড়ন ও শোষণের জ্বালায় আমাদের লক্ষ লক্ষ ভাই-বোন মৃত্যুর কোলে আশ্রয় নিয়েছে; মাতৃভূমিকে পরিণত করা হয়েছে কবর-স্থানে; আজ কড়ায়-গণ্ডায় তার হিসাব নিতে হবে। আমরা আজই সে পথে যাত্রা শুরু করলাম; আমাদের হাতে তাদের কারো রেহাই নেই ইত্যাদি। —ইণ্ডিয়ান রিপাবলিকান আর্মি।

এখানে আরো বলা দরকার, টেলিফোন-টেলিগ্রাফ অফিস হামলার সঙ্গে সঙ্গে পূর্ব-পরিকল্পনা মত যুগপৎ পুলিশ অস্ত্রাগার, অক্সিলারি অস্ত্রাগার (ইস্টার্ন রাইফেল বাহিনীর) ও ইউরোপিয়ান ক্লাবে আক্রমণ হয়েছিল। এর আগে রাত আটটায় ধুম ও লাঙ্গলকোটে রেল লাইন তুলে ফেলা হয়েছিল।

ধুম ও লাঙ্গলকোটে রেল লাইন উত্তোলন

রাত আটটার সময় চট্টগ্রাম থেকে প্রায় ৬০ মাইল দূরে ধুম স্টেশনের কাছাকাছি এক নির্জন জায়গায় লালমোহন সেনের নেতৃত্বে সুবোধ মিত্র, সুকুমার ভৌমিক ও সৌরীন্দ্র কিশোর—এই চারজন বীর নওজোয়ান রেল

লাইন তুলে ফেলে দেয়। এ কাজের জন্য ক্রোবার, শাবল, হাতুড়ি ইত্যাদি সব রকম প্রয়োজনীয় যন্ত্রপাতি নেওয়া হয়েছিল। যাত্রীবাহী ট্রেনটি চলে যাবার পর এ চারজন লাইন তোলার কাজে লেগে যায়। বোল্ট নাট খুলে ফেলা হলে ক্রোবার ও শাবল দিয়ে লাইন সরিয়ে ফেলা হয়। কিছুক্ষণ পর ঐ রেলপথে আসে একটা মালগাড়ি। তারপর একটা অদ্ভুত শব্দ হল। কাত হয়ে পড়ে গেল মালগাড়িটা।

অনুরূপভাবে ঠিক ঐ সময়ে গজেন্দ্রকুমার ভট্টাচার্যের নেতৃত্বে বিজয় আইচ, শঙ্কর সরকার ও সুশীল দে—এই চারজন বীর জোয়ান চট্টগ্রাম থেকে ৭২ মাইল দূরবর্তী লাঙ্গলকোট স্টেশনের অনতিদূরে এক নির্জন স্থানে রেল লাইন তুলে ফেলে। ঐ দুই জায়গায় রেল লাইনের পার্শ্ববর্তী টেলিগ্রাফের তারও কেটে দেওয়া হয়। লাইন সরিয়ে ফেলার উদ্দেশ্য ছিল এই যে, অন্যান্য জেলা থেকে দ্রুত যেন কোন রকম সাহায্য চট্টগ্রামে শত্রুপক্ষের হাতে এসে পৌঁছাতে না পারে। এখানে উল্লেখ করা যেতে পারে যে, আমাদের মূল পরিকল্পনা ছিল রাত আটটার সময় সমস্ত অপারেশন চালানোর। কিন্তু পরে শহরে আমরা অপারেশনের সময় পিছিয়ে দশটা করতে বাধ্য হই। কিন্তু যথাসময়ে উক্ত দুটো গ্রুপকে খবর পৌঁছাতে না পারায় তাদের কাজ পূর্ব-পরিকল্পনা মত রাত আটটায় শুরু হয়ে গিয়েছিল।

পুলিশ অস্ত্রাগার দখল

পুলিশ অস্ত্রাগার আক্রমণকারী সাতজনের গ্রুপের পরিচালক নেতৃদ্বয় ছিলেন অনন্ত দা' ও গণেশ দা'। গণেশ দা'র সদরঘাটস্থ বাসা থেকে অনন্ত দা' গাড়িখানা চালিয়ে নন্দনকানন গার্লস স্কুল, এনায়েত বাজার ও পল্টনের রাস্তা ধরে রাত্রির নিস্তব্ধতা ভঙ্গ করে এগিয়ে যাচ্ছিল। সকলেই ছিলেন ইউনিফর্ম পরা, রিভলভার কিংবা পিস্তল সজ্জিত। অনন্ত দা', গণেশ দা' ব্রিচিং লেগিং পরে ছিলেন। কী অদ্ভুতই না তাঁদের মানিয়েছিল! গাড়ির জানালার উপর হাত রেখে সরোজ গুহ বসেছিল। পল্টন রোডে হঠাৎ হাত ফসকে তার রিভলভারটি রাস্তার উপর ছিটকে পড়ে যায়। রিভলভারটি তুলে নেওয়ার জন্য কয়েক মুহূর্তের জন্য গাড়িটা থামানো হয়েছিল। পল্টন রোড পার হয়ে ওয়াটার ওয়ার্কসকে ডান পাশে রেখে পুলিশ অস্ত্রাগারের সামনে মোটর গাড়ি থামানো হল। অস্ত্রাগারটি ছিল টিলার উপর, রাস্তা থেকে ১৫-২০ হাত দূরে পুলিশ ব্যারাক। অস্ত্রাগারের সামনে ছিল একটা খোলা জায়গা, রাইফেল

হাতে গার্ড ওখানে টহল ও পাহারা দিচ্ছিলো। জায়গাটা ২০ থেকে ২৫ হাত হবে প্রস্থে, দৈর্ঘে হবে ৬০ থেকে ৭০ হাত। পাহারারত গার্ডের পাশেই হল গার্ড রুম। অস্ত্রাগারের ভেতরে ঢুকতেই প্রথমে পড়বে কার্টিজ রুম, ডানপাশে রাইফেল-বন্দুক রাখার কামরাটি, তার ভেতরে সারি সারি অস্ত্র রয়েছে।

আলোগুলো মিট মিট করে জ্বলছিল। ইউনিফর্ম পরা অনন্ত দা' ও গণেশ দা' দ্রুত গাড়ি থেকে নেমে পড়লেন। তাঁদের পেছনে পেছনে সরোজ গুহ, হরিপদ মহাজন, হিমাংশু সেন ও দেবপ্রসাদ গুপ্ত-এ চারজন কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে পাহাড়ের উপর অস্ত্রাগারে যাওয়ার সিঁড়িগুলো পার হতে লাগলো। শান্ত্রী চ্যালেঞ্জ করলো না, ভাবলো, সামরিক উচ্চ পদস্থ অফিসারেরা অস্ত্রাগার পরিদর্শনে এসেছে। সিঁড়ি বেয়ে অনন্ত দা', গণেশ দা' উপরের মাথায় পোঁছাতেই শান্ত্রী রাইফেল নামিয়ে সামরিক কায়দায় অভিবাদন জানালো। সাথে সাথেই অনন্ত দা' ও গণেশ দা'র হাতের রিভলভার দুটো গর্জে উঠলো, তারা সোজাসুজি গুলি করেছেন। গুলিবিদ্ধ হয়ে শান্ত্রী মাটিতে লুটিয়ে পড়লো। মুহূর্তেই ঐ ছয় জন বিপ্লবী গুলি ছুঁড়তে ছুঁড়তে গার্ড রুমের দিকে দ্রুত ধাবিত হল। তাদের দেখে বাকি পাঁচজন শান্ত্রী উর্ধ্বশ্বাসে দৌড়ে পালালো তাদের ব্যারাকের দিকে। তারা সেখানে পৌছতেই অন্যান্য পুলিশেরাও যে যেদিকে পারলো ব্যারাক ছেড়ে পালিয়ে গেল।

শান্ত্রীরা পালিয়ে যাওয়ায় গার্ড রুম সহ অস্ত্রাগার সহজেই দখলে এসে গেল। তারপর চতুর্দিকে শ্লোগান উঠলো, 'বন্দে মাতরম', 'ইনকিলাব জিন্দাবাদ', 'ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদ ধ্বংস হোক'। অস্ত্রাগারের কাছাকাছি চট্টেশ্বরী কালীবাড়ির নিকটবর্তী ঘন জঙ্গলে লুকিয়ে ছিল আক্রমণের সহায়ক গ্রুপগুলো। প্রতি গ্রুপে ছয়জন করে মোট ছয়টা গ্রুপ সেখানে সংকেতের অপেক্ষা করছিল। মাস্টার দা'র পরিচালনায় আওয়াজ শোনা মাত্রই তারা জোর কদমে দৌড়ে ডবল মার্চ করে ম্যাগাজিনের দিকে ধাবিত হল। আক্রমণের সহায়ক গ্রুপগুলোকে আগেই হুশিয়ারি দেওয়া ছিল যে, যদি কোন আওয়াজ শোনা না যায় তাহলে তারা ধরে নেবে যে, প্রধান আক্রমণকারী গ্রুপটি ধ্বংস হয়ে গেছে, অস্ত্রাগার দখল করতে পারেনি। এ ক্ষেত্রে তারা যেন ফিরে যায়। যা হোক সংকেত পেয়ে আক্রমণে সহায়ক গ্রুপগুলো ছুটে গেল অস্ত্রাগার অভিমুখে। একটা গ্রুপ দৌড়ে ঝটপট অস্ত্রাগারের চারপাশে গার্ড হিসাবে নিজেদের অবস্থান নিল। আর এক গ্রুপ বিরাট এক হাতুড়ি নিয়ে ম্যাগাজিন রুমের লোহার দরজার তালা ভাঙ্গায় লেগে গেল। কিছুক্ষণের মধ্যেই হাতুড়ির ঘায়ে

বিরাট তালাটা ভেঙ্গে দরজা খুলে তারা ঢুকে পড়লো কামরার ভেতরে। আর এক দল ঠিক তখনি উড়িয়ে দিল রিপাবলিকান পতাকা। তারপর সবাই গ্রুপে গ্রুপে হুমড়ি খেয়ে পড়লো ম্যাগাজিন কামরায় আর 'মাস্কেট রাইফেল', 'মাস্কেট রাইফেল' বলে সাফল্যের উত্তেজনায় চিৎকার করতে লাগলো।

ম্যাগাজিন রুমে মাস্কেটগুলো তাকে তাকে সাজানো। কী চমৎকারই না লাগছিল। প্রত্যেকে এক একটা করে লুফে নিলো সঙ্গিন পরানো মাস্কেট। যতটা পারা যায় কার্তুজ ভরে নিলো থলেয়। এবং তারপর বাইরে এসে আনন্দে উত্তেজনায় বে-পরোয়া চালাতে লাগলো ফাঁকা গুলি। জোনাকির মত যেন অসংখ্য ফুলকি জ্বলছে আর নিবছে—শত শত গুলির আওয়াজে মনে হলে যেন বাজি পোড়ানোর উৎসব চলছে। ঠিক ঐ সময়েই আমরা টেলিফোন-টেলিগ্রাফ অফিসে হামলা চালিয়ে এখানে এসে পৌঁছাই।

আনন্দে আমরাও যোগ দিলাম মুক্তিউৎসবে। খানিকক্ষণ আগে যে রিভলভার ও পিস্তল আমাদের কাছে সবচেয়ে মূল্যবান বলে মনে হয়েছিল সেগুলোকে মনে হল অচল অকেজো। দু একজন বোধ করি বাজে আবর্জনার মত তা ছুঁড়ে ফেলে দিয়ে থাকবে। আমাদের গ্রুপের সকলেই একে একে মাস্কেট আর কার্তুজ তুলে নিলাম। অগ্নিময় লেলিহান জিহ্বা বের করে মাস্কেটগুলো গর্জন করতে লাগলো।

তখনকার একটা ঘটনার কথা মনে পড়লে আজও আশ্চর্য না হয়ে পারি না। টেলিফোন-টেলিগ্রাম অফিস থেকে ফিরে এসে যখন গুলির পর গুলি চালাচ্ছি সবাই হঠাৎ শুনতে পেলাম আমাদেরই গার্ডের উঁচু কণ্ঠস্বর 'হল্ট, হ্যাণ্ডস্ আপ।' দেখি, ধুতিপরা এক যুবক দুটো হাত মাথার উপর তুলে দাঁড়িয়ে আছে। গার্ড তাকে ওখানে আসার কারণ জিজ্ঞেস করলে সে বললো যে, সেও আমাদের সঙ্গে যোগ দিতে চায়। গুলি গোলার আওয়াজ শুনে সে বুঝতে পেরেছে যে, এ কাজ আমাদেরই হবে। তারই বাসার সামনে অনন্ত দা'র মোটরখানা থামানো হয়েছিল এবং সরোজের ছিটকে পড়া রিভলভারটা সেখানেই রাস্তা থেকে তুলে নেবার সময় সে তা দেখেছে। সে সবে মাত্র আমাদের সংস্পর্শে এসেছিল। নতুন বলে তাকে এই কাজে শেষ পর্যন্ত অন্তর্ভুক্ত করা হয় নি। ঐ তরুণ ছেলেটির নাম স্বদেশ রায়। কালারপুল লড়াইতে সে পরে আত্মদান করে শহীদ হয়।

ইউরোপিয়ান ক্লাবে হামলা

আমাদের একটু আগেই এখানে এসে পৌঁছেছিল সেই দলটি, যারা ইউরোপিয়ান ক্লাব আক্রমণ করতে গিয়েছিল।

পরিকল্পনা মতই মোটর হাঁকিয়ে নরেশ, বিধু, ত্রিপুরা, মনোরঞ্জন সেন, অমরেন্দ্র নন্দী, টেগরা প্রমুখ ছয়জন বীর তরুণ ইউরোপিয়ান ক্লাবে চড়াও হয়। গ্রুপের নেতৃত্বে ছিলেন নরেশ রায়। আগে পরিকল্পনা ছিল রাত আটটায় যুগপৎ আক্রমণ হবে, কিন্তু পরে তা দশটায় করা হয়। দশটার সময় তারা ক্লাবে পৌঁছে দেখে ক্লাব ততক্ষণে বন্ধ হয়ে গেছে। গুড ফ্রাইডে ছিল সেদিন। তাই রাত ৯টায় ক্লাব বন্ধ করে ইউরোপিয়ানরা সকাল সকাল যার যার বাড়িতে ফিরে গেছে। সেখানে কোন ইউরোপিয়ানের দেখা মিললো না। আক্রমণকারী দলটি বোমা, বন্দুক, ভোজালি ইত্যাদি নিয়ে সম্পূর্ণ প্রস্তুত হয়ে সেখানে হাজির হয়েছিল। পরিকল্পনা ছিল বেপরোয়া বন্দুক আক্রমণের, গুলির পর গুলি চালানোর, বোমা ফাটিয়ে ত্রাস সৃষ্টি করে তারপর সকলকে একে একে খতম করার। দুর্দমনীয় ক্রোধ ও ঘৃণার পাহাড় নিয়ে গ্রুপটি ক্লাবে গিয়ে হাজির হয়েছিল। বিদ্বেষ আর প্রতিহিংসার আগুন তারা নেভাতো ইউরোপিয়ানদের খতম করে, কার্পেট বিছানো শ্বেতপাথরের মেঝেতে বয়ে যেত সাম্রাজ্যবাদী ইংরেজদের রক্ত স্রোত। কিন্তু কিছুই হল না। দেখলাম, এই দলের সবার হাতেও মাস্কেট গর্জন করে চলেছে। কিন্তু আশাভঙ্গের বেদনা তখনও তাদের মুখ থেকে মিলিয়ে যায়নি।

অক্সিলারি অস্ত্রাগার দখল

ওদিকে আরেকটি দল গিয়েছিল পাহাড়তলীস্থ অক্সিলারি অস্ত্রাগার আক্রমণের উদ্দেশ্যে। ঐ দলে ছিল মোট ছয় জন। লোকা দা', নির্মল দা' ছিলেন ঐ গ্রুপের নেতা। অন্ধকার রাতে জনহীন পথের নিস্তব্ধতা ভেঙ্গে দ্রুত তাদের মোটর গাড়ি চলছিল। বৈশাখের পাহাড়ি হাওয়া এসে লাগছিল মোটরে। কিন্তু সেদিকে কারো ভ্রূক্ষেপ ছিল না। তাদের সমস্ত মন জুড়ে তখন অক্সিলারি অস্ত্রাগার আক্রমণ ও দখল করার উত্তেজনা। দশটা বাজবার ঠিক এক মিনিট আগে অক্সিলারি ফৌজের ঘাঁটির পুর্ব-দক্ষিণ গেটের সামনে হাজির হল মোটর গাড়ি। গোপনে অপেক্ষারত অন্য আর চার জনের বিপ্লবী দলের একজন এসে গেট খুলে দিল। গাড়িখানা অস্ত্রাগারের সামনের বারান্দার নিচে এসে দাঁড়ালো। গাড়ি থেকে

নেমে পড়লেন দৃঢ় পদক্ষেপে লোকা দা', নির্মল দা' চললেন আগে আগে, রজত সেন, সুবোধ চৌধুরী, ফণী নন্দী, জীবন ঘোষাল, নিতাই ঘোষ, ক্ষিরোদ বন্দ্যোপাধ্যায়, শান্তি নাগ এবং প্রভাস বল তাদের পেছনে পেছনে চললো খোলা রিভলভার হাতে। অস্ত্রাগারটি আলোয় আলোকিত। ছয়জন বিরাটকায় পাঠান সৈন্য রাইফেল হাতে অস্ত্রাগার পাহারা দিচ্ছিল। লোকা দা'র হৃষ্টপুষ্ট ফরসা সাহেবি চেহারা, তার উপর আবার সামরিক পোষাকে সজ্জিত, পায়ে ব্রিচিং লেগিং পরা, বুকে সামরিক ইনসিগনিয়া ও রিপাবলিকান ব্যাজ আঁটা। দেখে শান্ত্রীরা ভেবেছিল, হয়ত উচ্চ পদস্থ কোন অফিসার হবে। সবাই প্রহরারত সৈন্যদের দু-তিন হাতের মধ্যে এসে পড়লে সৈন্যরা রাইফেল নামিয়ে লোকা দাকে মিলিটারি কায়দায় অভিবাদন জানালো। আর তারপর পলক পড়তে না পড়তেই গুলিবিদ্ধ হয়ে দু'জন মাটিতে লুটিয়ে পড়লো। অবস্থা বেগতিক দেখে বাকি চারজন সৈন্য দিগবিদিগ জ্ঞানশূন্য হয়ে ছুটে পালালো।

কালবিলম্ব না করে মুহূর্তেই অস্ত্রাগারের লোহার দরজার হাতলের সঙ্গে মোটর গাড়ির পেছনটা বেঁধে লাগিয়ে দেওয়া হল। তারপর মোটর গাড়ি স্টার্ট দিয়ে হেঁচকা একটা টান দিলে ঝট করে দরজা খুলে গেল। ঠিক ঐ সময়েই অস্ত্রাগারের অফিসার ইনচার্জ মেজর ফ্যারেল বোধহয় গোলযোগ শুনে এসে হাজির। ম্যাগাজিনের সংলগ্নই ছিল তার বাসা। কিন্তু 'বাঙ্গালী কুত্তা' বলে গালাগালি করে এগিয়ে আসতে না আসতেই তাকে গুলি করা হল। গুলিবিদ্ধ হয়ে সে মাটিতে লুটিয়ে পড়লো। শান্তি নাগ ছুটে গিয়ে তার শরীরে বেয়নেট বিঁধিয়ে দিল। কোলে শিশুপুত্র নিয়ে ফ্যারেলের স্ত্রী হাউমাউ করে কেঁদে বারবার কাকুতি মিনতি করতে লাগলো তাদেরকে প্রাণে না মারার জন্য। বিপ্লবীরা তাদের হত্যা না করে ছেড়ে দিল।

সশব্দে দরজা খুলে যাওয়ার পর দেখা গেল, কামরার ভেতরে নানা ধরনের অস্ত্র সারি সারি সাজানো। রাইফেলগুলো বেয়নেটের মুকুট পরে ঝক্ঝক্ করছে। ওয়েভলি রিভলভারগুলো তাদের কালো মসৃণ উজ্জ্বলতা নিয়ে চকচক করছে। লুইসগান, মেশিনগানগুলো রোমাঞ্চকর স্বকীয়তা নিয়ে যেন আমন্ত্রণ জানাচ্ছে। আনন্দে, ভাবাবেগে সবাই বিভোর, কতদিনের কল্পনাই না আজ বাস্তব হয়ে দেখা দিয়েছে, একেবারে চোখের সামনে, হাতের নাগালের মধ্যে।

অস্ত্র পাওয়া গেল। কিন্তু কোথাও কার্তুজ খুঁজে পাওয়া গেল না। তন্ন তন্ন করে খোঁজা হল, একবার নয়, কয়েকবার। কিন্তু কোথাও কার্তুজ নেই। কোথায় গেল কার্তুজ? কোথায় তা লুকানো রয়েছে?

এদিকে দেরী হয়ে যাচ্ছে। আর অপেক্ষা করা যায় না। কিন্তু কার্তুজ ছাড়া এ সব অস্ত্র কী কাজে লাগবে?

এমন সময়ে গোরা সৈন্য ও ইংরেজ অফিসারদের কেউ কেউ গেটের সামনে জড়ো হতে শুরু করলো। তারা নিরস্ত্র, তাদের অস্ত্রশস্ত্র সবই অস্ত্রাগারে পড়ে আছে। তাদের দিকে লক্ষ্য করে বোমা ছোঁড়া হল। কয়েক রাউণ্ড গুলি চালানো হল। তারা একবার দৌড়ে পিছিয়ে যায়, আবার এগিয়ে আসে। এভাবে সময় কাটতে লাগলো। হন্যে হয়ে কার্তুজ খোঁজা তখনও চলছে। কিন্তু কোথাও তার হদিস পাওয়া গেল না।

এদিকে আমরা তখন পুলিশ অস্ত্রাগারে ঐ দলের আগমনের জন্য প্রতীক্ষা করছি। ওদের দেরি দেখে সবাই উদ্বিগ্ন। রাত তখন প্রায় বারটা, তবু তাদের দেখা নেই। এত দেরি হচ্ছে কেন? মাথায় অশুভ একটা চিন্তা খেলে গেল, কোন বিপদ হল না তো?

ঐ উদ্বেগজনক অবস্থায় শেষ পর্যন্ত বাছা বাছা ছয়জনের এক সশস্ত্র দলকে মোটরে করে সেখানে পাঠিয়ে দেওয়া হল। পাহাড়তলী যাওয়ার পথে এদের গাড়ির সামনে পড়লো ম্যাজিস্ট্রেটের গাড়ি। ঐ গাড়ি লক্ষ্য করে গুলির ফোয়ারা ছুটলো। ম্যাজিস্ট্রেট গাড়ি থেকে লাফ দিয়ে পালিয়ে বাঁচলেন। সোফারটি হল নিহত। যাওয়ার পথে এরকম আরও দু'একবার গুলি চালাতে হয়।

পাহাড়তলী অস্ত্রাগারের গেটের বাইরে যে সব ইউরোপীয়ান জড়ো হয়েছিল তারা মোটরগাড়ি আসতে দেখে হয়তো বা ভয়ে দৌড়ে সরে গেল। এ দলটি ওখানে পৌঁছে সমস্ত ঘটনা জানতে পারলো। তাঁরাও উদ্বিগ্ন হয়ে আঁতি পাঁতি আরেক দফা খুঁজলো। কিন্তু কোথাও কার্তুজের কোন হদিস পাওয়া গেল না। শেষে উপায়ন্তর না দেখে অস্ত্রশস্ত্র মোটরে তোলা শুরু হল। ৪০০ ওয়েভলি রিভলভার, একটা লুইসগান নেওয়া হল মোটরে। রাইফেল, মেশিনগান ভেঙ্গে চুরমার করা হল। তারপর কামরার ভেতরের জিনিসপত্র পেট্রোল ঢেলে ভিজিয়ে তাতে ছুঁড়ে দেওয়া হল আগুন। দাউ দাউ করে আগুন জ্বলতে লাগলো। তারপর শুরু হল বিস্ফোরণ। একের পর এক বিস্ফোরণ ঘটতে লাগলো। হঠাৎ প্রচণ্ড বিস্ফোরণে দালানটা ফেটে চৌচির হয়ে গেল।

বস্তুতঃ পাশেই একটা আলাদা ঘরে শেল, কার্তুজ ইত্যাদি মজুদ ছিল। কিন্তু সে খবর ছিল আমাদের গ্রুপটির অজ্ঞাত। তারা সব খুঁটিনাটি খবর নিয়েছিল। তুচ্ছ ব্যাপার জানতেও তারা অবহেলা করে নি। তারা স্বাভাবিকভাবেই ধরে নিয়েছিল রাইফেল, মেশিনগান ইত্যাদির মত গোলাবারুদ ও কার্তুজ ইত্যাদি ঐ ঘরেই থাকবে। এবং সেটাই একটা অপ্রত্যাশিত

সংকটের সৃষ্টি করেছিল।

যাহোক, এরপর আর দেরি না করে দল দুটো তাদের দুখানা মোটর গাড়িতে করে দ্রুত পুলিশ অস্ত্রাগারে ফিরে আসে। লুইস গানটা গার্ড-রুমের সামনে ছুঁড়ে ফেলে দেওয়া হল। আমরা সেখানে উপস্থিত প্রত্যে-কেই একটা একটা করে ওয়েভলি রিভলভার নিয়ে নিলাম। ওগুলো কোনটা হাতখানেক লম্বা, কোনটা প্রায় এক ফুট। সৈন্যদলে তখনো ঐ সব রিভলভার ব্যবহার করা হত। আমাদের নিজেদের পুরনো রিভলভার-গুলোর বেশির ভাগই আশেপাশে ছুঁড়ে ফেলে দিলাম। কারণ, ঐ রিভলভারগুলোর কার্তুজ অক্সিলারি অস্ত্রাগারে পাওয়া না গেলেও এখানে পুলিশ অস্ত্রাগারে পাওয়া গেল। পরে ঐ সব কার্তুজ ও রিভলভার আমা-দের খুব কাজে লেগেছিল।

পুলিশ অস্ত্রাগারে আমাদের উৎসবের আমেজ তখনো কাটে নি। এই সময় উৎসব মুখরিত লাগামহীন অপ্রয়োজনীয় গুলি চালাবার প্রবণতার রাশ টেনে ধরলেন মাস্টার দা। তার নির্দেশে অস্ত্রাগারের ভেতর থেকে ব্রিটিশ পতাকা ইউনিয়ন জ্যাক খুঁজে এনে পুড়িয়ে ফেলা হল। তারপর ঐ ক্ষুদে মাঠে অবস্থিত পতাকা-দণ্ডে জাতীয় পতাকা উত্তোলন করা হল। মাথার উপরে উড়তে লাগলো জাতীয় পতাকা—সে পতাকা সংগ্রাম ও মুক্তির পতাকা। মাস্টার দা সেই পতাকার নিচে এসে দাঁড়ালেন। গণেশ দা সকলকে সারিবদ্ধ করলেন। গার্ড অব অনার দেওয়া হল। আমরা সবাই মাথা নত করে হাত তুলে ঐ পতাকাকে জানালাম সামরিক অভিবাদন। তারপর কিছুক্ষণ চললো সামরিক ড্রিল।

এমন সময় হঠাৎ অস্ত্রাগার থেকে শ খানেক হাতের মত দূরে নিচের ওয়াটার ওয়ার্কস এর উপর থেকে মেশিনগানের গুলি আসতে লাগলো এদিকে। টটটটট—একটানা গুলি চলতে লাগলো। আমরাও যে যার মত পজিশন নিয়ে পাল্টা গুলি চালাতে লাগলাম। কেউ শুয়ে, কেউ হাঁটু গেড়ে বসে, কেউ ম্যাগাজিনের দেওয়ালের আড়াল থেকে, কেউ অস্ত্রাগারের ভেন্টিলেটারের ভেতর দিয়ে গুলির পর গুলি চালাতে থাকলাম। পাঁচ মিনিট এ ভাবে চলার পর মেশিনগানের গুলি বন্ধ হয়ে গেল।

ঐ খণ্ডযুদ্ধের পর মাস্টার দা'র নির্দেশে অস্ত্রাগারের সম্মুখবর্তী ক্ষুদ্র ময়দানে আমরা সবাই আবার সমবেত হলাম। উনি আমাদের লক্ষ্য করে দেশের জনসাধারণের উদ্দেশে ঘোষণা করলেন যে, ভারত উপমহাদেশের একটি অংশ হলেও এই চট্টগ্রামে ভারতের প্রজাতন্ত্রী বাহিনীর (ইণ্ডিয়ান রিপাবলিকান আর্মি) চট্টগ্রাম শাখা ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদের আধিপত্য খতম করে তাঁরই নেতৃত্বে এক স্বাধীন বিপ্লবী সরকার প্রতিষ্ঠিত করেছে। তিনি

এই স্বাধীন সরকারকে সর্বতোভাবে সাহায্য করবার জন্য দেশবাসীর কাছে আবেদন জানান। অধিনায়ক মাস্টার দা'র এ ঘোষণার পর বিউগল বাজানো হল এবং তিন তিনবার গুলি বর্ষণ করা হল।

এর পরপরই আবার হঠাৎ করে মেশিনগানের গুলি আসতে লাগলো। আবারও আমরা পাল্টা গুলি চালিয়ে মেশিনগানের আওয়াজ স্তব্ধ করে দেই। তারপর গুলির ফোয়ারার মুখে সম্ভবতঃ তারা ওয়াটার ওয়ার্কস থেকে দ্রুত সরে পড়ে।

এর পর পরই থলে ভর্তি কার্তুজ, প্রত্যেকে একটি করে মাস্কেট রাইফেল এবং বাদ বাকি অস্ত্রশস্ত্র গাড়ি ভর্তি করে নেওয়ার হুকুম হল। তখনি তা সবাই কার্যে পরিণত করলাম। প্রায় দেড় হাত দৈর্ঘ, এক হাত প্রস্থ ও এক হাত উঁচু অন্ততঃ শতখানেক কার্তুজের বাক্স অস্ত্রাগারের বড়ো কামরায় মজুদ রয়েছে। সব মিলিয়ে প্রায় এক লক্ষ কার্তুজ হবে বলে অনুমান। প্রত্যেকেই নিজ নিজ থলেতে যতটা সম্ভব কার্তুজ ভরে নিল। আমিও হাজারের কাছাকাছি কার্তুজ থলেতে পুরলাম। এবং এবার সত্যি সত্যিই প্রত্যক্ষ সংগ্রামে, সামনা সামনি লড়াইয়ে নামছি বলে মনে হল।

তারপর সমস্ত অস্ত্রাগারে পেট্রোল ছিটিয়ে দেওয়ার নির্দেশ হল। হিমাংশু সেন সমস্ত ঘর পেট্রোলে ভিজিয়ে দেওয়ার সাথে সাথে নিজেও পেট্রোল সিক্ত হয়ে পড়েছিল। এরপর কে একজন সেখানে আগুন ছুড়ে মারলে মুহূর্তেই সারা ঘরে দাউ দাউ করে আগুন জ্বলে উঠলো। আর ভীতচকিত চোখে লক্ষ করলাম সেই মুহূর্তেই হিমাংশুর দেহটাও হয়ে উঠলো একটা বড়ো অগ্নিশিখা। লাফ দিয়ে দৌড়ে অস্ত্রাগারের সামনে মাটিতে সে তাড়াতাড়ি গড়াগড়ি দিতে লাগলো। আগুন নিভলো বটে কিন্তু মারাত্মকভাবে সে অগ্নিদগ্ধ হল। অসহ্য যন্ত্রণায় সে ভীষণ ছটফট আর চিৎকার করতে লাগলো। চোখে না দেখলে সে যন্ত্রণার তীব্রতা কল্পনাও করা যায় না। মনে হল, মৃত্যু তার চাইতে বহুগুণ শ্রেয়ঃ।

চোখের সামনে দাউ দাউ করে আগুন জ্বলছে। সমস্ত ঘরটা পরিণত হয়েছে এক বিরাট অগ্নিকুণ্ডে। শত শত লেলিহান শিখা লকলক করে লেহন করছে অগ্নিকুণ্ডের চার পাশ। সঙ্গে সঙ্গে কার্তুজ বিস্ফোরণের শব্দ, ঘরখানা ফেটে ফেটে চৌচির হয়ে যাচ্ছিল।

এমনি সময়ে রাত্রের ডিউটির একজন গার্ড পাহারা বদলের জন্য এসে হাজির। কিছুই সে জানত না। হঠাৎ চোখের সামনে কাণ্ডকারখানা দেখে সে একেবারে হতভম্ব। ভ্যাবাচ্যাকা খেয়ে থর থর করে কাঁপতে লাগলো। সেখানে তাকে বেঁধে রেখে দেওয়া হল।

এদিকে অগ্নিদগ্ধ, যন্ত্রণাকাতর, মৃতপ্রায় হিমাংশুকে নিয়ে আমরা ব্যস্ত।

নেতৃবৃন্দের সামনে এখন সবচেয়ে বড়ো প্রশ্ন—হিমাংশুর জন্য কিছু একটা করা। অসহনীয় যন্ত্রণা থেকে মুক্তি দেওয়ার জন্য তাকে কি মেরে ফেলে দেওয়া হবে? নাকি এখুনি তার চিকিৎসার জন্য বাড়ি পাঠিয়ে দেওয়া হবে? কি করা সমীচীন, কি করা ভাল হবে এই নিয়ে আমাদের মন তোলপাড় করছিল। এদিকে চিকিৎসার ব্যবস্থা হলে এক মুহূর্তও আর দেরি না করে তাকে পাঠিয়ে দেওয়া দরকার। যাহোক, শেষ পর্যন্ত ঠিক হল, তাকে বাসায় পৌঁছে দেওয়া হবে। তাই অনন্ত দা' ও গণেশ দা' তাকে নিয়ে একটা গাড়িতে চড়ে বসলো। গাড়িটা চলা শুরু করতেই জীবন ঘোষাল ও আনন্দ গুপ্তও উঠে পড়লো গাড়িতে। যাবার সময় অনন্ত দা' বলে গেলেন, তাঁদের জন্য অপেক্ষা করতে, শিগগিরই তারা ফিরে আসবেন।

ওরা চলে যাবার খানিক পরেই অম্বিকা দা' নির্দেশ দিলেন পাহাড়ের দিকে মার্চ শুরু করতে। আমরা ৫৫ জন অম্বিকা দা'র নেতৃত্বে ও পরিচালনায় উত্তর দিকের পাহাড় অভিমুখে যাত্রা শুরু করলাম। পাহাড়ী রাস্তাগুলোর অবস্থান সম্পর্কে অম্বিকা দা'র অভিজ্ঞতা ছিল বেশী। অনন্ত দা', গণেশ দা' ও অন্যান্যদের জন্য আমরা আর অপেক্ষা করলাম না।

পাহাড়ের দিকে যাচ্ছি বলে বিস্মিত হলাম। শহরের মূল দুটো অস্ত্রাগার আমাদেরই হাতে। পুলিশ দল ব্যারাক ছেড়ে পালিয়েছে। ইউরোপিয়ানরা নিরস্ত্র, সন্ত্রস্ত ও কিংকর্তব্যবিমূঢ়, এক কথায় চট্টগ্রাম শহর আমাদের দখলে। আমরা শহরের কেন্দ্রস্থলে যাব মার্চ করে, রেস্তোরায় খাব, তারপর দখল করবো ট্রেজারি, জেলখানা দেব খুলে, ব্রিটিশ অনুচরদের গ্রেপ্তার করব, কোর্ট বিল্ডিং হবে আমাদের হেড কোয়ার্টার, পর দিন চট্টগ্রামের যুবকদের ডাক দেব অভ্যুত্থানে যোগ দেবার জন্য বিশেষ করে আহ্বান জানাব ভ্রাতৃপ্রতিম অনুশীলন পার্টিকে। রিপাবলিক ঘোষিত হবে, বিভিন্ন বিপ্লবী অর্ডার জারি হবে. প্রতিক্রিয়াশীলদের গ্রেপ্তার করা হবে, তাদের সাজা দেওয়া হবে, গুলি করা হবে ইত্যাদি। রেল লাইন ঠিক করার পর আসবে ব্রিটিশ সৈন্যদল, রক্তক্ষয়ী সংগ্রাম চলবে তাদের সাথে। হয়তো এ লড়াইয়ের আয়ুষ্কাল তিন চার দিনের বেশি নাও হতে পারে। স্বাধীনতার জন্য কিভাবে লড়াই করতে হয়, কোন পথে স্বাধীনতা লাভ করা যায়, সংগ্রাম ও মৃত্যুর ভিতর দিয়ে তার চরম ও অনুশীলনীয় দৃষ্টান্ত আমরা রেখে যাব দেশের সামনে। কিন্তু একি হলো?

বিভিন্ন যুক্তি ও অজুহাত থাকা সত্ত্বেও অনন্ত দা' ও গণেশ দা'র পক্ষে সাময়িকভাবে হলেও যুদ্ধক্ষেত্র পরিত্যাগ করাটা যুক্তিসঙ্গত মনে হয়নি। কম দায়িত্বশীল লোক দিয়েই তো হিমাংশুকে তার বাসায় পৌঁছিয়ে দেবার

ব্যবস্থা করা যেত। তাই হতো যুক্তিসঙ্গত এবং সমীচীন।

অভ্যুত্থান পরিচালনার সামরিক দায়িত্ব ছিল অনন্ত দা' এবং গণেশ দা'র ওপরেই. যুদ্ধক্ষেত্রের তাঁরাই হলেন অধিনায়ক, তাঁদের কথার উপর কথা নেই, তর্ক নেই। নির্বিচারে সকলেরই তা মেনে চলতে হবে। মাস্টার দা' হলেন সর্বাধিনায়ক। বড় ছোট সকলেরই তাঁর কাছে জবাবদিহি করতে হবে। রাত্রে যতসব ঘটনা ঘটেছে সবগুলোই তিনি তদারক করছিলেন, ক্ষুদ্র ঘটনাকেও তিনি তুচ্ছ মনে করেননি। অন্যের সাথে পরামর্শের মারফত সমস্যা সমাধানে উপদেশ দিয়েছেন। তার বুদ্ধি বিচক্ষণতা ও প্রতিভার কাছে প্রায় সকলেই ছিল নিষ্প্রভ। বহু গুণ ও বহু কৃতিত্বের অধিনায়ক মাস্টার দা', তাঁরই উপস্থিতিতে আমরা পাহাড়ের দিকে যাত্রা শুরু করলাম ভেবে বিস্মিত হলাম।

দীর্ঘ সারি বেঁধে বন্দুক কাঁধে, ঝোপ ঝাঁড় জঙ্গল ভেদ করে জমির উপর দিয়ে চললাম, পরিশ্রমে কাতর ও ক্লান্ত। ক্ষুধায় পেট চোঁ চোঁ করছিল তবুও হাঁটার বিরাম নেই। যাত্রাপথে তরমুজ ক্ষেত চোখে পড়লো, শুধু চোখে পড়লো না তরমুজ ক্ষেতের মাঝখান দিয়েই হাঁটছিলাম। আমরা সবাই ক্ষেতের ওপর বসে পড়লাম, কাঁচা কাঁচা তরমুজ কচ্ কচ্ করে খেয়ে চললাম। আবার হাঁটা শুরু হল, জঙ্গলাকীর্ণ পাহাড়ের পাদদেশে এসে পড়লাম। পাহাড়ে যখন উঠছি তখন ভোরের আলো একটু একটু ফুটে উঠেছে। পাহাড়ের চূড়ায় যখন এসে পৌছলাম তখন সকাল হয়ে গেছে।

১৯শে এপ্রিল শনিবার শ্রান্ত ক্লান্ত দেহে মাস্কেটটা পাশে সরিয়ে কার্টিজের থলেটার উপর মাথা রেখে ঘুমিয়ে পড়লাম। সূর্য মাথার উপর আসতেই ঘুম ভেঙ্গে জেগে উঠলাম। বৈশাখের প্রথম দিকের ঝলসানো সূর্য-রশ্মিতে চারদিক চিক্ চিক্ করে জ্বলছিল। মাথার উপর উন্মুক্ত স্বচ্ছ নীল আকাশ, আর ঐ আকাশ থেকেই সূর্য যেন আগুন ঝরিয়ে চলছিল।

খাকী পোশাক ঘামে ভিজে চপ চপ করছিল। প্রচণ্ড তৃষ্ণা, কিন্তু পানি নেই কোথাও। চারদিকে পাহাড় আর পাহাড়। নীরব নিস্তব্ধ, মাঝে মাঝে একটু আধটু মৃদু গুঞ্জন শোনা যাচ্ছিলো। চার পাঁচ হাত দূরে নির্মল দা', বীরেন, জীতেন ও শশাঙ্ক গুন গুন করে আলাপ করছিল। বীরেন বলে যাচ্ছিল কি শুভক্ষণেই রামকৃষ্ণ দা'র সাথে আমার আলাপ হয়েছিল, তার সাথে পরিচয় না হলে গতানুগতিক জীবন ছাড়া আর কিই-বা পেতাম। নির্মল দা', তুমি ভাল করেই জানো আমরা কতই না গরিব, কতই না দরিদ্রক্লিষ্ট। বাবা ঘরদোর তৈরির কাজ করে দিন গুজরান করেন। আট দশ আনা দৈনিক আয়, এতে পাঁচ ছয়জনের সংসার কী ভাবে চলে বুঝতে পার। খানিকক্ষণ সে চুপ করে রইলো। দীর্ঘ নিঃশ্বাস ফেলে আবার বলতে শুরু করলো, আমার

কথাটাই শুধু বললাম বলে আমাকে ভুল বুঝো না। দেশজোড়া এই নিষ্ঠুর দারিদ্র। দারিদ্রের মধ্যে আমরা সকলে ডুবে গেছি। ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদ তথা ইংরেজ শাসন উপড়ে ফেলে দিলে দারিদ্রের অবসান ঘটতে পারে। তা উপড়ে ফেলার কাজে আজ শরিক হয়েছি, কি বল নির্মল দা' ? নির্মল দা' তার মুখের দিকে তাকিয়ে থেকে চুপ করে রইলো। এ সময় হঠাৎ শশাঙ্ক মুখ খুলল, বহু দেশই স্বাধীন কিন্তু দারিদ্র্যকে তারা নির্মূল করতে পারেনি। তার মুখের কথা কেড়ে নিয়ে জিতেন বললো : 'তবে, ইংরেজ চলে গেলে দারিদ্র্যের কঠোরতা অনেকখানি কমে যাবে। খুলে যাবে মনুষ্যত্ব বিকাশের পথ।' আমিও তাই বলতে যাচ্ছিলাম, বলে সায় দিল শশাঙ্ক। এমন সময় কে একজন বলে উঠলো : এরোপ্লেন আসবে, বোমা বর্ষণ করবো। কথাটা অনুমান প্রসূত হলেও ঐ ধরনের বাস্তব আশংকা যে ছিল না তা নয়।

এমনিভাবে বিকেল হল, ঝিরঝিরে পাহাড়ি হাওয়া বেশ ভাল লাগছিল। ক্রমে ক্রমে ঘোর অন্ধকার নেমে এলো। ভূলোক থেকে নক্ষত্রালোক পর্যন্ত সে অন্ধকার পাহাড়গুলোকে যেন গ্রাস করে ফেললো। ঐ ভয়াবহ অন্ধকারে মাথা উঁচু গাছগুলোকে কি অদ্ভুতই না লাগছিল।

এমন সময় সংকেত এল পাহাড় থেকে নেমে মার্চ শুরু করার। পাহাড়ের পর পাহাড় ভেঙে মাঠে এসে পড়লাম। চারদিকে ছোট ছোট টিলার সারি। আমরা হেঁটে হেঁটে তা অতিক্রম করে চলেছি। তখন রাত বারোটা বাজে। হঠাৎ কানে এল, বদ্দারহাট থেকে বিস্কুট কিনে আনা হয়েছে। বনুড়ির কাছাকাছি ও তার চারদিকে এসে আমরা সবাই জড়ো হলাম। মাস্টার দা', অম্বিকা দা' কঠোর নজর রেখেছেন যেন কেউ বাদ না যায়। তারপর আবার আমাদের যাত্রা করতে হল। ঘুমে চোখ দুটো বুজে আসছিল, তবুও হাঁটছি—চলেছি-তো-চলেছি।

২০শে এপ্রিল, রবিবার। অরুণ রাঙা ভোরের আলো ফুটে উঠেছে। আমরা আর এক পাহাড়ের পাদদেশে উপস্থিত হলাম। গতদিনের মত ঘুমিয়ে পড়লাম। ন'-দশটার সময় ঘুম ভেঙ্গে গেল। মাথা তুলতেই বিস্ময়ে অভিভূত হলাম, প্রকৃতি তার অপূর্ব সৌন্দর্য্যরাশি ঢেলে দিয়েছে এখানে। ছোট ছোট গাছ ও লতাগুল্ম সব জায়গাটা যেন ঢেকে রেখেছে। তার পাশ দিয়ে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র নির্ঝরণী অতি মৃদু গুঞ্জণে বয়ে চলেছে। লতা-কুঞ্জের নিচে ও আশেপাশে চারদিকে শ্যামল ঘাসের গালিচাপাতা, ঐ ঘাসের উপর কেউ শুয়ে, কেউ আধ শুয়ে, এক জায়গায় পাঁচ ছয় জন অবিরাম আলাপ করে চলেছে। ঐখানে মধু দাকে চোখে পড়ল। গম্ভীরভাবে এক-মনে হয় কথাবার্তাগুলো শুনেছিলেন না হয় কি যেন ভাবছিলেন,

খানিকক্ষণ পর তার পাশে গিয়ে বসলাম। জিজ্ঞেস করলাম, কি ভাবছেন? কিছুক্ষণ চুপ থেকে বল্লেন, 'ভাবছি, ঐ গাছ, পাতা, এই নির্ঝরণী, সুন্দর সুন্দর পাখি, সুমধুর কলরব— সবই ছেড়ে যেতে হবে, দেশের বন্ধন কত যে শক্ত, মৃত্যুর উপকূলে দাঁড়িয়ে তা আজ উপলব্ধি করছি।' ভাবছিলাম কথাটা কতই-না সত্য। মধুদা' উঠে মাস্কেটটা সরিয়ে একটু আরামে বসতে চেষ্টা করলেন। আবার বলতে শুরু করলেন, 'লক্ষ লক্ষ জীবনই এ দেশ ভোগ করুক—এ কামনা নিয়েই এ পৃথিবী ছেড়ে চলে যাব। হয়ত অল্প কয়েক-দিনই বাঁচবো। কি বল পণ্ডিত!' চুপ করে রইলাম। ভাবছিলাম, কি গভীর উপলব্ধি। তন্ন তন্ন করে জীবন ও এই দুনিয়াকে অনুভব করছেন। উঠে দাঁড়াতেই বিধু হেসে বললো, 'অবশেষে দার্শনিক চিন্তা কি তোমা-কেও পেয়ে বসল। অবশ্য আমার বেলায় তা' নয়। পেটটা ঠাণ্ডা করতে পারলে দার্শনিক চিন্তা মূর্তি ধরে হাজির হত, কি বল নির্মল?'

নির্মল হেসে পাশ ফিরে ঘাসের গালিচায় সমস্ত দেহটা এলিয়ে দিল, তার দিকে তাকালাম। ফর্সা, সুন্দর, অতি কচি বয়স তার। আমরা যারা এসেছি, সে সকলের চাইতে বয়সে ছোট, এমনকি টেগরার চাইতেও। কক্সবাজার হাইস্কুলে ক্লাস নাইনে পড়ে। বিধু ছিল তার অতি পরিচিত। বাবা, মা, তার অতি প্রিয়জন সবাইকে ছেড়ে প্রাণ দিতে এসেছে। দেশের জন্য ছিন্ন করেছে সকল বন্ধন। বার বার তার দিকে চোখ পড়তে লাগলো। দশ-বারো হাত দূরে কালী, পুলিন, কৃষ্ণ, বিনোদ ও আরও দু-তিনজন বসে বসে গল্প গুজব চালাচ্ছিল। তাদের আসরে যোগ দেবার জন্য কালী ইশারা করলো। আস্তে আস্তে হাজির হলাম সেখানে। উদ্বিগ্ন কণ্ঠে সে জিজ্ঞেস করলো, 'অনন্ত দা', গণেশ দা' তাঁদের কোন খবর জানা গেছে কি?' বললাম 'খবর জানলে সকলেই তা জানতে পেত, তোমরাও জানতে।' মুচকি হেসে সে ব্যঙ্গোক্তি করে বললো, 'এখনতো দেখছি লতা-পাতা-গাছের সাথেও যুদ্ধ করতে হবে।' 'অধৈর্য্য হয়োনা কালী, দিনের পর দিন যুদ্ধ চালিয়ে যাওয়া যেমন বীরত্বসূচক, তেমনি দিনের পর দিন যুদ্ধের অপেক্ষায় বসে থাকাও কম বীরত্বসূচক নয়,' পুলিন জবাবে বললো।

'পুলিন তুমি একেবারে বে-রসিক, সবসময় সিরিয়াস, রসিকতা ও সিরিয়াসনেস—এ দুয়ের মাঝে সীমারেখা টানতে চেষ্টা কর,' কালী ফিরে বললো।

কালীর পক্ষ সমর্থন করে কৃষ্ণ চৌধুরী বললো, 'অনন্ত দা', গণেশ দা'র খোঁজ খবরের বিষয় জানতে চাওয়াটা অধৈর্য্যের লক্ষণ নয়। খারাপ তো লাগবেই, কোথায় শহরে ঢুকবো, তা না করে পাহাড়ে পাহাড়ে চরে বেড়াচ্ছি।'

'তর্ক করে কোন লাভ নেই, ইংরেজের মোকাবিলা আমাদের করতেই হবে। কয়েকদিন হয়ত দুঃখ কষ্টের ভিতর দিয়ে যেতে হচ্ছে। বাস্তবকে স্বীকার করে নিলে ক্ষোভ বা বিক্ষোভ থাকতে পারে না'—এই বলে বিনোদ তর্কটা থামিয়ে দিল।

উঠে দাঁড়ালাম। এদিক ওদিক ঘুরে বেড়াচ্ছি, যেন ব্যারাকে ব্যারাকে ঘুরে বেড়াচ্ছি। কোথাও মাস্কেটগুলো পিরামিডের মত সাজিয়ে রাখা হয়েছে। কোথাও এলোমেলোভাবে ছড়ানো। কেউ কেউ রিভলভারগুলো দেখছে বার বার করে। কেউ ঘুমুচ্ছে, কেউ গল্প জমিয়েছে। গত দিন শ্রান্ত মনে হয়েছিল আজ অতটা মনে হলো না। বেশ ভালই লাগলো।

বিনোদ চৌধুরী, বনবিহারী, দ্বিজেন, নিরঞ্জন, ও মহেন্দ্র চৌধুরীকে দেখলাম। সকলেই আলাপে ব্যস্ত। প্রভাস, মতি, শান্তি নাগ, সুরেশ দেব প্রমুখের পাশ কাটিয়ে চলেছি এমন সময় ডাক শুনেই থমকে দাঁড়ালাম, পেছন ফিরে তাকালাম। দেখলাম, প্রভাস ডাকছে। বললে, 'কিছু জানতে পারলে?' বললাম, 'না'। 'পাহাড়ে আসা কি আমাদের ঠিক হয়েছে?' প্রশ্ন করলো সে। 'মাস্টার দাকে জিজ্ঞেস কর, তিনি ঠিক ঠিক জবাব দেবেন,' জবাবে বললাম। নিজের জায়গায় ফিরে যাচ্ছি আর ভাবছি, আমারও ত ঐ একই প্রশ্ন। তাকে কিই-বা জবাব দিতে পারি আমি?

নিজের জায়গায় গিয়ে একটু বিশ্রাম নিচ্ছি। ভাবছি প্রভাসের কথাগুলো। নতুন নয়, পুরাতন বাসি কথা, তবু কেমন নতুন ও তাজা মনে হচ্ছিল। দু'বছর আগে প্রভাস ছিল অন্য ধরনের। নৈতিক অধঃপতনের দিকে পা বাড়িয়েছিল। এক বিকেল বেলা তাকে জিজ্ঞেস করেছিলাম, সিগারেট খাওয়া ছেড়ে দিতে পারে কিনা। পারলে, তোমাকে একটা নতুন কথা বলবো। উত্তরে সে সাতদিনের সময় চেয়েছিল। কিন্তু তিনদিন পর এসে বলেছিল সে সিগারেট খাওয়া ছেড়ে দিতে পারবে। তারপর থেকে সে এক নতুন মানুষ হয়ে উঠেছে—শারীরিক ও মানসিক দু-দিক দিয়েই এক শক্তিমান পুরুষ হয়ে উঠেছিল। এখন মৃত্যু হয়ে গেছে তার কাছে তুচ্ছ, এসেছে সে মৃত্যুর সাথে পাঞ্জা লড়তে। মরে সে মৃত্যুকে করেছে জয়।

খানিক পরে জানতে পারলাম, অনন্ত দা'র খবর জানবার জন্যে ও শহরের অবস্থা স্বচক্ষে দেখে আসবার জন্যে তিনজনকে পাঠানো হয়েছে। স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেললাম। যাক আজ তাহলে অনেক খবর জানা যাবে।

বিকেল গড়িয়ে গেল। দিগন্তে সন্ধ্যার অন্ধকার চারিদিক আচ্ছন্ন করে নেমে এলো। কিন্তু যাদের খবর আনতে পাঠানো হয়েছে তাদের কোন খবর নেই। দীপ্তিই বা গেল কোথায়? মনীন্দ্র গুহ আর অমর নন্দীই বা কোথায় উধাও হয়ে গেল?

অশান্তি ও উদ্বিগ্নতায় মন ভরে গেল। কয়েকদিন পরে জানতে পারলাম একজন স্বেচ্ছায় চলে গিয়েছে নিজের বাড়িতে। আর অন্য দু'জন জঙ্গলের মধ্যে পথ হারিয়ে ফেলেছিল।

অদুরে মাস্টার দা', নির্মল দা', লোকা দা' ও অন্য দু'একজন বসে কি যেন আলোচনা করছিল। মাস্টার দাকে দেখে মনে হল, তিনি খুব চিন্তিত।

ঘোর অন্ধকারে আবার পথ চলা শুরু হল। কিছুদূর এগিয়ে থামতে হল। নির্মল দা'ও টেগরা বাজার থেকে তরমুজ কিনে এনেছে। অম্বিকা দা তরমুজ ভাগ-বাটোয়ারা করতে বসে গেল। ছোট ছোট টুকরো করা হল। বাইশ-তেইশ ঘণ্টা অনাহারের পর এক এক টুকরো তরমুজ। কে একজন একটু বেশী চাওয়ায় তাকে একটা জোর ধমক দেওয়া হল। একটু বেশী খাওয়ার ইচ্ছেটা স্বাভাবিক। কিন্তু সবার দিকে চেয়ে ভাগ-বাটোয়ারায় কঠোরতা দেখানোও অস্বাভাবিক নয়।

দুর্গম পাহাড়ি পথে যাত্রা শুরু হল। ঝোপ-ঝাড়ের ভেতর দিয়ে পাহাড় ডিঙ্গিয়ে উত্তর মুখী এগিয়ে যাচ্ছি। ঘুমে ঢুলু ঢুলু চোখে অনেকটা যন্ত্রের মতো চলছি। ভোরের আবছা অন্ধকারে ফতেয়াবাদের কাছাকাছি একটা পাহাড়ে আশ্রয় নিলাম। তারপর দিলাম এক ঘুম।

২১শে এপ্রিল সোমবার। ঘুম ভাঙ্গলে চোখ মেলে চারপাশে তাকিয়ে দেখলাম। পাহাড়টা গাছ ও ঘন ঝোপে পূর্ণ। উঁচু-নিচু চড়াই-উৎরাই ও নানা খাদে ভর্তি। দক্ষিণ দিকে কাছেই একটা বড় ধরনের জলা জায়গা চোখে পড়লো। হয়তো বা কাছেই কোন ঝরনা রয়েছে। পানি একটু ঘোলাটে। আশে পাশে লোক চলাচলের চিহ্নও দেখা গেল।

লতা গুল্মে ঢাকা ধূসর লালচে বালি মাটিতে পাহাড়ের ঢালুতে শুয়ে আছি। শৈলেশ্বর ছিল পাশে। সাহিত্য ও কাব্য প্রতিভার কিঞ্চিৎ অধিকারী ছিল সে। গুণ গুণ করে সে কবিতা আবৃত্তি করে চলছিল। শুনছিলাম আর মাঝে মাঝে আনমনা হয়ে পড়ছিলাম। এক সময়ে সে বলে উঠলো, "রবীন্দ্রনাথের একটা কবিতা মনে পড়ছে। আজকের দিনের সঙ্গে তা হুবহু মিলে যাচ্ছে।' বলে সে আবৃত্তি করতে লাগলো :

উদয়ের পথে শুনি কার বাণী
ভয় নাই ওরে ভয় নাই,
নিঃশেষে প্রাণ যে করিবে দান
ক্ষয় নাই তার ক্ষয় নাই।

আমি কান পেতে শুনে যাচ্ছিলাম। বড় ভাল লাগছিল। সে বলতে লাগলো, 'পেছন দিকে ফিরে না তাকিয়ে নিঃশেষে প্রাণ দিতে এসেছি। প্রাণ দিতে একটুও দ্বিধা লাগছে না। আমাদের নাম অক্ষয় হয়ে থাকবে

মনে করে আনন্দও লাগছে।'

পেছন থেকে শান্তির কণ্ঠস্বর শোনা গেল, 'একচোট পেট ভরে খেয়ে নিয়ে মরতে পারলে সত্যিকার আনন্দ পেতাম। মনে হচ্ছে যেন পেটের ভেতর দক্ষযজ্ঞ শুরু হয়েছে।' সুরেশ দেব বলে উঠলো, 'তোর সারা দিনরাত কেবল খিদে, খিদে, খিদে।'

শান্তি একটুখানি ধীর স্বরে বললো, 'খাবার না থাকলে সৈন্যরাও যুদ্ধ করতে চায় না। তাই রসদের দরকার হয়।' গম্ভীর প্রকৃতির মতি আর চুপ থাকতে পারল না। বললো, 'সৈন্যদের সঙ্গে আমাদের তুলনা চলে না। তারা হল ভাড়াটে, আর আমরা হলাম বিপ্লবী। খিদেকে জয় করা হয়তো যাবে না, কিন্তু সৈন্যদের চেয়েও বেশিদিন টিকে থাকা আমাদের পক্ষে যেমন সম্ভব, তেমনি খুবই দরকারী।'

আমাদের সবার জন্য খিচুড়ির ব্যবস্থা করার উদ্যোগ নিলেন অম্বিকা দা'। তিনি ফকির সেন ও অন্য একজনকে দিয়ে তার এক আত্মীয়ের কাছে খবর পাঠালেন। ফতেয়াবাদ হল ফকিরের নিজ গ্রাম।

অন্যান্য দিনের মত সেদিনও প্রায় সকলে গ্রুপে গ্রুপে আলাপ জমিয়েছে। এক জায়গা থেকে বেশ কড়া সুর কানে এলো। বিধু, নরেশ, ত্রিপুরা, মনোরঞ্জন, দেবু প্রমুখ অভিযোগে মুখর। তারা মাস্টার দা', অম্বিকা দা', নির্মল দা' প্রমুখের কাছে অভিযোগের সুরে বলছে, কেন নেতারা সবাইকে পাহাড়ে নিয়ে এলেন? পাহাড়ে আসার তো কোন পরিকল্পনা ছিল না। ক্রমে স্বর আরো চড়ে উঠলো। জোরালো কণ্ঠে কে-একজন বলছিল, শহরে ঢুকে রাস্তায় রাস্তায় যুদ্ধ করে প্রাণ দেওয়া বহুগুণে শ্রেয়। আর একজন মন্তব্য করলো, 'পাহাড়ে পাহাড়ে নিরর্থক লুকিয়ে চলা, যেমন অযৌক্তিক তেমনি অবিবেচনার কাজ।'

আমাদের প্রায় সকলের ভেতরে একটা চাপা অসন্তোষের ভাব দেখা যাচ্ছিল। তা তুষের আগুনের মতো ভেতরে ভেতরে জ্বলছিল। মাঝে মাঝে বিক্ষোভ আকারে তার বহিঃপ্রকাশ ঘটছিল। ঠিকমত আয়ত্তে আনতে না পারলে হয়তো অবাঞ্ছিত ঘটনার সৃষ্টি হবে। এমন কি বিদ্রোহও ঘটতে পারে। ভেবে শিউরে উঠলাম। অসন্তোষ ফেটে পড়বার আগেই মাস্টার দা সবাইকে শান্ত করলেন। ঠিক হল, যত তাড়াতাড়ি সম্ভব শহরে ঢোকার চেষ্টা করা হবে।

খিচুড়ি এল। সাথে সাথে শহরের খবরও পাওয়া গেল। কিন্তু ফকির সেন আর ফিরে এল না। আর একজন কমল। আমরা সংখ্যায় ৫২ জনে এসে ঠেকলাম।

আমরা সবাই সাগ্রহে শহরের খবর শুনলাম। ১৮ই এপ্রিল রাতে গোটা ইউরোপিয়ান সম্প্রদায় শহর ছেড়ে জাহাজে করে পালিয়ে বঙ্গোপ-সাগরে গিয়ে উঠেছে। পুলিশ দুর্গ লণ্ডভণ্ড। শহর উন্মুক্ত। ধুম স্টেশনের কাছে মালবাহী ট্রেন লাইন চ্যুত। দু'জায়গায় টেলিগ্রাফ লাইনের তার কাটা হয়েছে ইত্যাদি। খবর বেশ উৎসাহব্যঞ্জক। কিন্তু তার সঙ্গে খারাপ খবরও আছে। গুর্খা রেজিমেন্ট, জাঠ রেজিমেন্ট, শিখ রেজিমেন্ট এসে পৌঁছেছে। শহরে সন্ধ্যা থেকে ভোর পর্যন্ত কারফিউ জারি করা হয়েছে। ইংরেজ সেনাদল সংগঠিত। এ সব খবর শুনে আবার মন খারাপ হয়ে গেল।

গাছের পাতায় করে সবাই খিচুড়ি ভাগ-বাটোয়ারা করে খেয়ে নিলাম। পাহাড়ি জলাটার ঘোলা পানিতে মুখহাত ধুলাম এবং আকণ্ঠ সেই ঘোলা পানি খেয়ে তৃষ্ণা মেটালাম।

সন্ধ্যার পর দক্ষিণে শহরাভিমুখে আমরা পা বাড়ালাম। দীর্ঘ সাত মাইলের মত আমাদের যেতে হবে। রাস্তা নেই। পাহাড়ের পাশ দিয়ে কখনো ঝোপ জঙ্গল মাড়িয়ে কখনো খোলা মাঠের মাঝ দিয়ে আমাদের হাঁটতে হচ্ছিল। এক ঘণ্টার পথ পার হতে আমাদের প্রায় নয় দশ ঘণ্টা লেগে গেল। আর মাত্র মাইল তিনেক দূরে শহর। ভোরের আলো ফুটে উঠেছে। এমন সময় আমরা একটা পাহাড়ে আরোহন করলাম।

অজানা অখ্যাত এক পাহাড়। শহীদের রক্ত ধৌত হয়ে সেই অখ্যাত পাহাড়ই তারপর জালালাবাদ পাহাড় নামে হয়েছিল ইতিহাস খ্যাত। বুকে ধরে রেখেছিল এক মৃত্যুহীন, ক্ষয়হীন রক্ত গাথা। আমরা সেই পাহাড়েই সেদিনের মত আশ্রয় নিলাম।

ছয়

জালালাবাদ যুদ্ধ

২২শে এপ্রিল ১৯৩০, মঙ্গলবার। আমরা জালালাবাদ পাহাড়ে আশ্রয় নিয়েছি। পাহাড়টা ছিল উত্তর-দক্ষিণে দুশো হাতের মত লম্বা। চওড়ায় ত্রিশ-চল্লিশ হাতের মতো হবে। পাহাড়টা আকারে অর্ধচন্দ্রের মতো। দুদিকে সামান্য ঢালু হয়ে নিচে নেমে গেছে। উচ্চতায় দেড়শো-দুশো হাত হতে পারে। দুপাশ ঝোপে ভর্তি। ছোট-বড় অনেকগুলো স্বর্ণালু গাছ ও পাহাড়ি গাছ যত্রতত্র দাঁড়িয়ে আছে। পাহাড়ের সাদা লালচে বালিমাটি পাতলা ঘাসে ঢাকা। পাহাড়ের দক্ষিণ-পশ্চিম, উত্তর, উত্তর-পশ্চিম ও উত্তর-পূর্ব দিকে পাহাড়ের গা ঘেঁষে ছড়িয়ে আছে উঁচু-নিচু জমি। পাশেই হাত তিরিশেক দূরে ঝোপ-ঝাড় ঢাকা আর একটা পাহাড়, যেন তারা নিত্যকালের সঙ্গী।

পাহাড়ে উঠেই দিলাম ঘুম। ভোরবেলা থেকে ঘুমানো এ কদিনে একটা প্রাত্যহিক অভ্যাসে পরিণত হয়েছে। বিচিত্র পরিক্রমা। রাত-ভর হাঁটি। ভোর থেকে দুপুর অবধি ঘুমাই। তারপর জল্পনা, কল্পনা, পরিকল্পনা। পরে সন্ধ্যা হলে আবার হাঁটা—নিয়তি যেন আমাদেরকে ঐ দিকেই টানছে।

ঘুম থেকে জেগে দেখি, সবাই গ্রুপে গ্রুপে বসে গেছে। কেউ কেউ কার্তুজগুলো তাজা রাখার জন্য রোদে ছড়িয়ে দিয়েছে, কেউ লুব্রিকেটিং অয়েল দিয়ে বন্দুক-রাইফেল পরিষ্কার করে নিচ্ছে। শহরে ঢোকার জন্যে সবাই প্রস্তুতি নিচ্ছে। হয় আজ না হয় কাল আমরা শহরে ঢুকবো।

টেগরা, ভবতোষ, সুধাংশু, নারায়ণ সেন এবং আরও দু-একজন মিলে গুণ গুণ করে কি আলাপ করছিল। আর এক জায়গায় রণধীর, সুবোধ রায়, অশ্বিনী, বিজয় সেন, মতি, সহায় রাম, সুবোধ বল কি যেন বলাবলি করছে। মাঝে মাঝে তাদের হাসির শব্দ কানে ভেসে আসছিল। আট-দশহাত দূরে স্বর্ণালু গাছে হেলান দিয়ে বসে অর্ধেন্দু কী যেন ভাবছে। তার পরনে গেঞ্জি আর জাঙ্গিয়া ছাড়া কিছুই নেই। ঐ নিয়েই সে চলে এসেছে। দু'তিন বার অর্ধেন্দুর নাম ধরে ডাক দিলাম। কিন্তু তার

কোন সাড়া নেই। উঠে তার কাছে গিয়ে বসলাম। জিজ্ঞেস করলাম, 'অর্ধেন্দু, তোমার শরীর কেমন?' সে আমার কথা শুনলো না জবাব দেবার ব্যাপারটা এড়িয়ে গেল বুঝলাম না। বরং পাল্টা আমাকে জিজ্ঞেস করলো, 'আমরা আজ শহরে ঢুকবো শুনেছি। কিন্তু কী ভাবে? সবাই এক সঙ্গে? নাকি গ্রুপে গ্রুপে?'

আমি একটু অবাক হলাম। তবু তার প্রশ্নের একটা উপস্থিত জবাব দিলাম, যদিও সে বিষয়ে আমার কিছুই জানা ছিল না। বললাম, 'ভিন্ন ভিন্ন দিক দিয়ে কয়েকটা গ্রুপে ভাগ হয়ে ঢোকাই বোধ হয় ভালো হবে। আমার মনে হয় মাস্টার দা', অম্বিকা দা', নির্মল দা' নিশ্চয়ই ভেবে রেখেছেন। অর্ধেন্দু আর কিছুই বল্‌লা না। আবার অন্যমনস্ক হয়ে কি যেন ভাবতে লাগল। দেখলাম, অর্ধেন্দুর শরীরের অবস্থা তেমন ভালো নয়। তার প্রায় সবগুলো হাড় বের হয়ে পড়েছে। বিস্ফোরণে পুড়ে যাওয়া চামড়ায় সাদা সাদা দাগগুলো রোদের আলোয় আরও চক্‌চক্‌ করছে। আমি আর কিছু না বলে সেখানে থেকে উঠে পড়লাম।

দুপুর গড়িয়ে গেল। বেলা প্রায় দুটোর সময় দুজন কাঠুরিয়া পাহাড়ে কাঠ কাটতে এসে আমাদের দেখে গেছে। ইউনিফরম পরা আমাদের দেখে ওরা নিশ্চয় অবাক হয়েছে। পিরামিড আকারে সাজানো মাস্কেট-গুলোও দেখেছে তারা। আমরা তাদের আটকে রাখিনি। সোজা চলে যেতে দিয়েছি। বোধ হয় নিরাপত্তার দিক থেকে সেটা ঠিক হয়নি।

বিকেল প্রায় চারটার সময় নির্মল দা' এসে বললেন, 'আমাদের একটু হুঁশিয়ার থাকা দরকার। আজ হয়তো বা আমরা আক্রান্তও হতে পারি।' কথাটার যতখানি গুরুত্ব দেওয়ার দরকার ছিল, মনে হল, আমরা ততটা গুরুত্ব দিলাম না।

এভাবে মিনিট, ঘন্টা করে সময়ে কাটতে লাগলো। হঠাৎ ট্রেনের শব্দ শোনা গেল। অসময়ে ট্রেন! স্টেশন ছাড়া এই পাহাড়ি এলাকায় হঠাৎ ট্রেন থেমে যাওয়া! আমরা বিস্মিত হলাম। তবে কি এটা আর্মার্ড ট্রেন!

আমরা স্বভাবতই একটু হুঁশিয়ার হলাম। যে দিকটা থেকে ট্রেনের শব্দ আসছিল সে দিকে লক্ষ্য রাখতে লাগলাম এবং সম্ভাব্য শত্রু বা হামলার জন্য কিছুটা প্রস্তুতিও নিলাম। মিনিট পাঁচেক পর দেখা গেল, পাহাড়ের পূব দিক থেকে জনা তিরিশেক ব্রিটিশ সৈন্য সঙিন উঁচিয়ে এগিয়ে আসছে এবং ক্রমেই পাহাড়টাকে ঘিরে গোলাকার হয়ে ছড়িয়ে পড়তে শুরু করেছে। আমাদের পাহাড়ের পাদদেশে হাজির হয়ে তারা উপরের দিকে উঠার উদ্যোগ নিতেই লোকা দা'র নির্দেশ মতো আমরা গুলি চালাতে শুরু

করলাম। বায়ান্নোটি মাস্কেট অবিরত গর্জন করে চললো। মুহুর্মুহু 'বন্দে মাতরম', 'ইনকিলাব জিন্দাবাদ' ইত্যাদি শব্দে এলাকাটা সেই সঙ্গে মুখরিত হয়ে উঠলো। বেশ কিছু ব্রিটিশ সৈন্য গুলিবিদ্ধ হল। হুমড়ি খেয়ে কেউ কেউ গড়িয়ে পড়লো নিচে। কয়েকজন হুড়মুড় করে পিছু হটে পালালো। অপরাজেয় ব্রিটিশ বাহিনী হল ছত্রভঙ্গ। তারা আশ্রয় নিল অদূরে একটা পাহাড়ি খাদের আড়ালে। তারপর আবার তাদের পুনর্বিন্যস্ত করা হল নতুন ভাবে। বিউগল বেজে উঠার পর আবার তারা আক্রমণ শুরু করলো নতুন চালে, নতুন ধাঁচে, নতুন কৌশলে। বেয়নেট চার্জ করার ভঙ্গিতে ডবল মার্চ করে তারা এগুতে শুরু করলো দ্রুত। কিন্তু আমাদের পাল্টা গুলির ফোয়ারার সামনে তারা আবার ভেসে গেল। আবার তারা পিছু হটে সেই একই খাদের আড়ালে নিরাপদ আশ্রয় নিল। পাহাড়ে উঠতে ব্যর্থ হয়ে এবার তারা আবারও কৌশল বদলালো। দূরপাল্লার রাইফেলের সাহায্যে তারা এবার আমাদের দিকে পাল্টা গুলির ঝড় বইয়ে দিল।

কিন্তু তারা যে খুব সুবিধা করতে পারলো তা নয়। আমরা কেউ ঝোপের আড়ালে, কেউ গাছগুলোকে সামনে রেখে, কেউ হাঁটু পেতে, কেউ বসে, কেউ বুকের উপর ভর করে শায়িত অবস্থায় গ্রুপে গ্রুপে গুলি চালাচ্ছিলাম। পেছনে একজন লুব্রিকেটিং অয়েল দিয়ে মাস্কেটগুলো দ্রুত পরিষ্কার করে দিচ্ছিল। লক্ষ্য করলাম নির্মল দা' শুয়ে শুয়ে এত তাড়াতাড়ি মাস্কেটগুলো পরিষ্কার করে দিচ্ছিলেন যে তাঁর হাত যেন দেখাই যাচ্ছিল না। আমাদের পাল্টা আক্রমণ চলছিল পাহাড়ের উত্তর পূর্ব দিকে। ছুটো গ্রুপ পশ্চিম দিকের পাহাড়ে ওঠার পথটায় ওত পেতে বসে ছিল যাতে সে-দিক দিয়ে ব্রিটিশ সৈন্যরা যেন পাহাড়ে উঠতে না পারে।

মাস্টার দা' প্রথম থেকেই লোকা দা'কে যুদ্ধের পরিচালক হিসেবে ঠিক করে রেখেছিলেন। তাই কমাণ্ডার হিসেবে লোকা দা'ই যুদ্ধ পরিচালনা করতে লাগলেন। শত্রু সৈন্যের গুলির ফোয়ারার মুখে অতুলনীয় বীরত্ব ও সাহস এবং কঠোর দৃঢ়তার সঙ্গে লোকা দা' লড়াই পরিচালনা করতে লাগলেন।

হঠাৎ মেশিনগানের আওয়াজ।...ট...ট...ট...ট। গোটা পাহাড়টা যেন কেঁপে উঠলো। যেন পাহাড়টাকে গুড়ো করে ফেলবে। ব্রিটিশ সৈন্যরা উত্তর-পূর্ব দিকের পাহাড়ের উপর মেশিন গান ফিট করে বৃষ্টিধারার মত গুলি বর্ষণ শুরু করলো। গুলি এসে পড়তে লাগলো গাছে। ঝোপ-ঝাড় ভেদ করে ছুটে আসতে লাগলো গুলি। পত্র-পল্লব ছিঁড়ে ছিঁড়ে পড়তে লাগলো।

মেশিন গানের গুলির প্রথম শিকার হল টেগরা। দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে লড়াই করছিল সে। 'সোনা দা' বলে আর্তনাদ করে সে পাহাড়ের বুকে ঢলে পড়লো। সোনা দা' হল তার ভাই লোকা দা'। লোকা দা' মুহূর্তের জন্য, শুধু মুহূর্তের জন্যেই টেগরাকে বুকে তুলে নিলেন। 'দেশের জন্য তোমায় সঁপে দিয়েছি। তোমার কর্তব্য তুমি পালন করে গেলে। যাও, বিদায়।'—এই কথা বলে মাস্কেট তুলে নিয়ে লোকা দা' শত্রু অবস্থানের দিকে গুলির ঝড় বহাতে লাগলেন। টেগরার বন্ধু ত্রিপুরাও তাকে বুকে তুলে নিল, শুধু মুহূর্তের জন্য। হায় বন্ধুর প্রতি, প্রিয়জনের প্রতি প্রীতি ও ভালবাসার শেষ অনুভূতিটুকু প্রকাশেরও সময় নেই। এক মুহূর্তের বিলম্বের অর্থ বিপুল ক্ষতি।

চারিদিকে গুলির শব্দ। তার মধ্যে মেশিনগানের আওয়াজ চলছে সব চেয়ে দ্রুত ও অবিশ্রান্তভাবে। যেন হাজারে হাজারে গুলি ছুটছে অবিরত। বিধু, ত্রিপুরা, নরেশ—একে একে গুলি খেয়ে পাহাড়ের উপর ঢলে পড়লো। ত্রিপুরা পড়ে যেতেই দেবীপ্রসাদ তাকে বুকে জড়িয়ে ধরলো। এক নিবিড় অনুভূতির শেষ আলিঙ্গন—তারপর চিরদিনের জন্য এ পৃথিবী থেকে বিদায়। এরপর গুলি লাগলো নির্মলের গলায়। তার গলা ও গালের এক পাশ উড়ে গেছে। রক্তধৌত পাহাড়ি লালচে মাটি আরো লাল হয়ে উঠলো। মতি, জিতেন, প্রভাস, মধুদা, পুলিন, শশাঙ্ক—একে একে গুলিতে নিহত হল। মানুষের সবচেয়ে প্রিয়তম সম্পদ জীবনকে নির্দ্বিধায় উৎসর্গ করলো দেশের জন্য, বিদেশী শাসনের জোয়াল থেকে মাতৃভূমিকে মুক্ত করবার জন্যে।

আমাদের মাস্কেটগুলো অনবরত গর্জন করে চলছে। শহীদের রক্তধারায় সিক্ত হয়ে মাস্কেটগুলো আরো বেশী করে অগ্ন্যুদ্গীরণ করে চলেছে। পাহাড়ের পাদদেশকে ইংরেজ সৈন্যদের কবরস্থানে পরিণত করেই যেন তা শান্ত হবে। লড়াই চলছে। আমাদের তখন ক্ষুধা নেই, তৃষ্ণা নেই, ক্লান্তি নেই। শুধু একটি মাত্র লক্ষ্য—শত্রুকে ঘায়েল করা, বিধ্বস্ত করা, পরাজিত করা।

আমি হামাগুড়ি দিয়ে আর একটা ঝোপের আড়ালে গেলাম, উদ্দেশ্য আরও একটু কাছে এগিয়ে যাওয়া। কে-একজন বলে উঠলো, 'আহ্, আজ যদি মেশিনগান গুলো কাজে লাগাতে পারতাম, স্তব্ধ করে দিতাম ঐ মেশিনগান।'

বিরামহীন যুদ্ধ চলছে। শত্রুরা কিছুতেই এগুতে পারছে না। ছড়াতেও পারছে না পাহাড়ের চারদিকে। এক একজন করে তারাও ঢলে পড়ছে। এই জঙ্গল যুদ্ধে আমাদের পাল্টা আক্রমণে তারা বিমূঢ় ও ভয়ার্ত।

লোকা দা', রজত, মনোরঞ্জন, স্বদেশ, দেবী, সুবোধ চৌধুরী, বিনোদ দত্ত, বিনোদ চৌধুরী, জিতেন, বনবিহারী, কালী, সুধাংশু, সহায় রাম, রণধীর, সুবোধ রায়, শঙ্কু, বিজয়, বিধু—সবাই যেন সাক্ষাৎ যমের ভূমিকা নিয়েছে। তাদের ভেতরে জ্বলছে বিক্ষোভ ও প্রতিশোধের আগুন।

হঠাৎ অদূরে মাস্টার দা'র উপর চোখ পড়লো। দেখলাম দৈহিকভাবে দুর্বল ও ক্ষীণকায় মাস্টার দাকে যেন যুদ্ধে পেয়ে বসেছে। বুকের উপর শুয়ে, আড়াল থেকে তিনি লড়াই চালিয়ে যাওয়ার সংকেত দিচ্ছেন, সবাইকে উৎসাহিত করছেন। মাস্কেট তুলছেন, তাক করছেন, গুলি ছুঁড়ছেন, তারপর মাস্কেট নামাচ্ছেন। মাস্টার দার কাছ থেকে সামান্য একটু দূরে একটা গ্রুপ বেহুঁশের মত লড়াই করে যাচ্ছিল। তাদের একজন মাস্কেটটা পেছনে ছুঁড়ে ফেলে দিতেই চোখের পলকে মাস্টার দা' সেখানে গিয়ে হাজির। তাড়াতাড়ি মাস্কেটটা তুলে নিয়ে ধোঁয়াপূর্ণ তপ্ত মাস্কেটের নল লুব্রিকেটিং অয়েল দিয়ে পরিষ্কার করে এগিয়ে দিলেন। গ্রুপটির পেছনে শুয়ে পড়ে পরিষ্কার করে দিতে লাগলেন মস্কেটের নলগুলো। তারপর পুনরায় তা প্রাপকের হাতে তুলে দিলেন। যেন বিরামহীন চলবে এ রক্তক্ষয়ী সংগ্রাম।

হঠাৎ এক সময় ফণী নন্দী ও শান্তি নাগ হামাগুড়ি দিয়ে পাশে এল। শান্তি বললো, তার মাস্কেটটি নষ্ট হয়ে গেছে। এখন কি করা? আমি আমার ওয়েভলি রিভলভারটা তাকে দিয়ে বললাম, 'রাইফেলের তুলনায় এর রেঞ্জ কম হলেও এখন এটা দিয়েই লড়াই চালানো ছাড়া উপায় নেই।' এর পর পরই অর্ধেন্দুর পেটে গুলি লাগলো, অম্বিকা দা'ও পড়ে গেলেন।

যতই বীর বন্ধুরা পাহাড়ের বুকে একে একে ঢলে পড়ছেন, শহীদের সংখ্যা যতই বেড়ে চলছে ততই উন্মাদনাও বেড়ে চলছে। এই রক্তদান সকলকে যেন পাগল করে তুলছে। নিচে শত্রুর রাইফেল গর্জন, পাহাড়ের উপর থেকে মেশিনগানের গুলির ঝড় আর আমাদের তরফ থেকে তার সাধ্যমত পাল্টা প্রত্যুত্তর। চলল নিরবচ্ছিন্ন লড়াই, অবিরাম গুলিবর্ষণ। তারই ফাঁকে ফাঁকে মাস্কেট খোলা ও বন্ধ করার খট্ খট্ আওয়াজ—এ এক অভুতপূর্ব দৃশ্য।

এরপর নেমে এলো সন্ধ্যার অন্ধকার। ক্রমে অন্ধকার গাঢ় হতে থাকলো। পীচের মত ঘোর অন্ধকার এমনভাবে আমাদের ঘিরে ধরলো যেন তাকে হাত দিয়ে স্পর্শ করা যাবে। তবু লড়াই-চলছে। অবিরাম একটানা যুদ্ধ।

সন্ধ্যা প্রায় সাড়ে সাতটার সময়, প্রায় আড়াই ঘণ্টা পর হঠাৎ শত্রুপক্ষের বিউগল বেজে উঠলো। সঙ্গে সঙ্গে শত্রুপক্ষের গুলি বর্ষণ বন্ধ হয়ে গেল।

আমরাও গুলি চালানো বন্ধ করলাম। নেমে এলো গভীর নিস্তব্ধতা। মনে হল, জঙ্গলে গেরিলা আক্রমণের বিভীষিকায় তারা এখন যুদ্ধ চালাতে চাইছে না, হয়তো সেই ভয়েই তারা এখন পালাচ্ছে। ক্যাপটেন টেইটের দুর্দান্ত ইস্টার্ণ রাইফেল বাহিনী এবং কর্ণেল ডেলাস স্মিথের সুরমা-ভেলি লাইট ইনফেন্ট্রি বাহিনীর বাছা বাছা সহস্রাধিক সৈন্য বায়ান্ন জন মাত্র বিপ্লবী সৈন্যের হাতে জবরদস্ত মার খেয়ে গেল। ক্ষত-বিক্ষত বাহিনী নিয়ে উঠে পড়লো আর্মার্ড ট্রেনে।

ট্রেন চলার কোন শব্দ শোনা গেল না। বুঝতে পারলাম, তারা ভোর হওয়ার অপেক্ষায় থাকবে।

সাত

জালালাবাদ যুদ্ধের পর

শেষ বিদায় জানালাম জালালাবাদকে। শেষ বিদায় জানালাম শহীদদের। নিচে নেমে পড়ার সাঙ্কেতিক নির্দেশানুযায়ী পাহাড়ের বুকের ওপর দিয়ে হেঁটে চলেছি। ঠিক মাঝখানে পড়ে আছে অর্ধেন্দু। গায়ে তার সাদা গেঞ্জি, পরনে জাঙ্গিয়া। মাস্কেটটা পড়ে আছে তারই পাশে, যেন তার একমাত্র সঙ্গী। মুহূর্তের জন্য থমকে দাঁড়ালাম। হাঁটু পেতে বসে তার মাথায়, মুখে চোখে হাত বুলিয়ে আমার বুক ভরা সৌহার্দ্য জানিয়ে এই মৃত বন্ধুর কাছ থেকে চির বিদায় নিলাম। এমন সময় পিছন থেকে কে-একজন বলে উঠলো, কুইক-কুইক। জীবিত বন্ধুদের কেউ কেউ মৃত বন্ধুদের কোমর থেকে ওয়েভলি রিভলভারগুলো খুলে নিয়ে রওয়ানা হলো। পাহাড়ের মাঝখান দিয়ে পাশে একটা সরু পথ নিচের দিকে নেমে গেছে। সেই পথ ধরে নিচে নেমে পড়লাম আমরা। নিচে পাহাড়ের পাদদেশেই একটা পুকুর। আকণ্ঠ জল পান করলো সকলে। জল খেয়ে আমিও পেট ভরালাম।

অন্ধকারে এগোচ্ছি। নিকষ কালো পাহাড়ি অন্ধকার। সকলের পরনে খাকি পোষাক। একহাত দূরের জিনিসও দেখা যায় না। যেন আভাসে চলেছি পথ। আঁধারে ঢাকা দুর্গম পাহাড়ি পথ। সব মাস্কেটের মাথায় বেয়নেট পরানো ছিল না। কেবল দু-একটা মাস্কেটের শিরশোভিত বেয়নেটের চাকচিক্য জানিয়ে দিচ্ছিল, আমরা কাছাকাছি আছি। টর্চ জ্বালানো নিষিদ্ধ; একমাত্র সংকেতের উপরই চলতে হচ্ছিল। সারি বেঁধে একজনের পেছনে একজন এগোচ্ছি।

দলছাড়া তেইশ

খানিকদূর এগোবার পর বুঝতে পারলাম, মাস্টার দা', নির্মল দা' প্রমুখ সতেরজনের কাছ থেকে আমরা তেইশ জন বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়েছি। লোকা দা' ছিলেন আমাদের সাথে। আমাদের পরিচালিত করছিলেন তিনি। মনটা একটু খারাপ হল। প্রায় আধঘণ্টা পাহাড়ের উঁচু-নিচু, আঁকা-বাঁকা

পথ চলার পর আমরা একটা পাহাড়ে আরোহণ করলাম। পাহাড়টাতে গাছপালা বলতে কিছুই ছিল না। শনগাছের পাহাড়। শন কেটে কিছুদিন আগে পাহাড় পোড়ানো হয়েছে। ফলে চারিদিক হয়ে পড়েছে আবরণ হীন, খোলামেলা। এখানে বিশ্রাম গ্রহণ উপযুক্ত বলে বিবেচিত হল না। নেমে পড়লাম সকলে। গভীর জঙ্গলাকীর্ণ পাহাড়ের দিকে যাত্রা করলাম। শেষে উঠলাম একটা পাহাড়ে। তার সারা দেহ জুড়ে গাছপালা, লতাকুঞ্জ, আর ঝোপের ঠাসাঠাসি। ঐ পাহাড়ে উঠে একটু বিশ্রাম নিতে না নিতেই লোকা দা' ডাক দিলেন, 'পণ্ডিত'। উঠে দাঁড়িয়ে সাড়া দিলাম, কেন? তিনি বললেন, 'যেখান থেকে পার তৃষ্ণার্ত আহতদের জন্য জল নিয়ে এস।' এই বলে রিভলভারের খাপটাও এগিয়ে দিলেন জলপাত্র হিসেবে। আমাদের সাথে আহত ছিলেন দু'জন। একজন হলেন বিনোদ চৌধুরী। গুরুতরভাবে জখম হয়েছিলেন তিনি। তাঁর গলার এক পাশ দিয়ে এ ফোঁড়-ও ফোঁড় হয়ে গুলি চলে গিয়েছিল। আর একটু এদিক সেদিক হলে গুলি কণ্ঠায় লাগতো। নিশ্চিত মৃত্যুর কবল থেকে ফিরে এসেছেন। অন্য জন হল সুরেশ দেব। তার ডান হাতের কনুই-এর মাঝখানেই গুলি লেগেছে; হাতটা ছিন্নপ্রায়। তৃষ্ণায় তারা ছট্‌ফট করছে। জল! জল! কিন্তু এই জঙ্গলাকীর্ণ পাহাড়ে জল রূপকথার কালো গোলাপের মত দুর্লভ। কোথায় পাব জল। তবু জলের জন্য বেরিয়ে পড়লাম। সঙ্গে নিলাম কৃষ্ণ ও দ্বিগেনকে। অতি সরু পথ দিয়ে চললাম আমরা। কালেভদ্রে ঐ পথে হয়তো দু'একজন কাঠুরিয়া যাতায়াত করে। দু'দিকের ঝোপ ও লতাগাছগুলো জড়িয়ে ধরছে যেন সাপের লেজে আমরা আটকে যাচ্ছি।

অন্ধকার রাত্রি। নীরব, নিস্তব্ধ। টর্চের মুখে রুমাল জড়িয়ে অস্পষ্ট আলোতে অতি সাবধানে পথ চলছি। প্রায় সিকি মাইলের মত অগ্রসর হলাম। তন্নতন্ন করে খোঁজ করলেও জল পাব না বলে মনে হল। পাহাড়ের বালিমাটিতে জল থাকবেই বা কেন? হারিয়ে যাবার ভয়েও শিউরে উঠছি। জল নেই, শত চেষ্টা করলেও জল পাওয়া যাবে না বলে দৃঢ় প্রত্যয় নিয়ে ফিরে চললাম। লোকা দাকে বললাম, 'জলের কোন হদিশই পাওয়া গেল না।' এ কথা শুনে তিনি কড়া সুরে বললেন, 'যেখান থেকে পার জল নিয়ে আসা চাই।' বিনা ওজরে ঐ দুই বন্ধুকে সঙ্গে নিয়ে আবারো পা বাড়ালাম জলের সন্ধানে।

মনে ভীষণ দ্বন্দ্ব চলছে। জল চাই-ই চাই। আহত সাথীরা রক্তক্ষরণে ভীষণ ক্লান্ত ও শ্রান্ত। মরু তৃষ্ণায় কাতরাচ্ছে তারা। সেই তৃষ্ণা দূর করাটা যেমন এক গুরুকর্তব্য, তেমনি জল পাওয়ার আশা পোষণ করাও মিছে মরীচিকার পেছনে ধাওয়া করা বলে মনে ধারণা হয়েছে। আবার

জল খুঁজতে গিয়ে বন্ধুদের থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়ার বিপদও কম ছিল না। এ দু'য়ের দ্বন্দ্ব দোলায় দুলতে দুলতে পথ চলছি। কৃষ্ণ কি একটা জিজ্ঞেস করতেই পাশে সামান্য কিছুদূরে ঝোপটা বেশ জোরে নড়ে উঠলো। আপনা আপনি যেন মাস্কেটের মুখটা সেদিকে গেল ঘুরে। কি করতে যাচ্ছি, এ চেতনা আসতেই নিরস্ত হয়ে গেলাম। সামনে এগিয়ে গেলাম, ঐ দুর্গম গিরিপথে প্রায় সিকিমাইল অতিক্রম করেও জলের কোন সন্ধানই পেলাম না। যা ঘটে ঘটুক—এই মরিয়া মনোভাব নিয়ে আবার এলাম ফিরে। কোথাও জল নেই, বললাম লোকা দাকে। মনে হল ব্যাপারটা লোকা দা' এতক্ষণে উপলব্ধি করেছেন।

রাত তখন প্রায় দুটো বেজেছে। ক্লান্তি! ক্লান্তি!! সর্বাঙ্গে ক্লান্তি। তার উপর আবার উপবাস। তেত্রিশ চৌত্রিশ ঘণ্টার মধ্যে পেটে একটি দানাও পড়েনি। মনে হচ্ছিল সর্বাঙ্গের সমস্ত মাংসপেশীতে এক বিরাট শূন্যতার পীড়ন চলছে। নড়বার শক্তিও যেন হারিয়ে ফেলেছি। কেবল মনের মধ্যে ছিল একটা অজেয় শক্তি—দেশপ্রেম। ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদের শৃঙ্খল মুক্ত করবো দেশকে। ঝোপের ভেতরেই এলোমেলোভাবে পা এলিয়ে দিয়ে ঘুমিয়ে পড়লাম, প্রায় সাড়ে চারটার সময় ডাকতে শুরু করলেন লোকা দা'। অনিচ্ছা সত্ত্বেও উঠে পড়লাম তাড়াহুড়ো করে। গাছে চড়ে পাহারা দেবার নির্দেশ জারি করলেন তিনি। বিনা বাক্যব্যয়ে কর্তব্য পালন করতে লেগে গেলাম।

একটা পেঁপে, একটা আম আর এক চাষীবন্ধু

২৩শে এপ্রিলের ভোর বেলা। তখনো চারিদিকে ঘোর অন্ধকার, ঘনমেঘে আচ্ছন্ন আকাশ। একটা কালো পর্দা যেন বিশ্ব চরাচরে ছড়িয়ে রয়েছে। একটু একটু বাতাসও বইছে। পাতাগুলো নড়ছে সরসর করে। ক্রমে বাতাসের বেগ বাড়ছে। যে গাছে বসে পাহারা দিচ্ছি সেটিও দোল খেতে শুরু করেছে। ভোরের আলো উকি মারছে পুব আকাশে। প্রকৃতির মূর্তি-খানি ক্ষণে ক্ষণে বদলাতে শুরু করেছে। এদিকে বাতাসের গতি প্রবলতর হয়ে চলেছে। ঝড় উঠেছে কালবৈশাখীর। শুরু হল প্রবল ধারায় বর্ষণ। তাড়াতাড়ি নেমে পড়লাম গাছ থেকে। ক্যাম্বিসের জুতো জোড়া খুলে গুটি কয়েক কার্তুজ ভরে রাখলাম তার মধ্যে। বাদবাকী কার্তুজ বুকের নিচে রেখে উপুড় হয়ে শুয়ে পড়লাম। ঝড়ের দিনে পাখি যেমন করে শিশু বাচ্চাকে আগলে রাখে বুক দিয়ে—তেমনি সযত্নে বৃষ্টির জল থেকে রক্ষা করতে লাগলাম কার্তুজগুলোকে। কার্তুজ তাজা রাখার জন্য সবাই একই

কৌশল নিলাম। একটু পরে নির্দেশ এল মার্চ করার। তখনো বৃষ্টি থামেনি তবু শুরু হল চলা। চড়াই-উৎরাই পথ অতিক্রম করে চলেছি। চলার পথে আমরা সকলে পাহাড়ধৌত কাদাজল অঞ্জলি ভরে পান করলাম। মনে হয়েছিল বৈশাখের খর রৌদ্রদগ্ধ মাটিতে জল পড়েছে। তৃপ্তি! ভিজে ভিজে এগোচ্ছি। কার্তুজ ভিজে যাচ্ছে বলে মন ভরে উঠছিল দারুণ অস্বস্তিতে।

সকাল হল। বৃষ্টিও থামলো। আমরা এগিয়ে চলেছি। সকাল সাড়ে ছয়টা কি সাতটায় আমরা একটা সমতল জায়গায় এসে পৌঁছলাম। চারিদিকে পাহাড় ঘেরা, মাঝখানে একটুখানি সমতলভূমি। পাশ দিয়ে পাহাড় থেকে নেমে আসা জলস্রোত নিচে পড়ার ঝপ ঝপ শব্দ শোনা যাচ্ছে। রাত্রে আমাদের সংখ্যা ছিল তেইশ, এখন দেখলাম একুশ। দেখলাম, শান্তি নাগ ও সুরেশ দেব নেই। না জানিয়ে হয়তো কোথায় চলে গেছে।

সমতল জায়গাটার মাঝখান দিয়ে একটা খুব সরু পাহাড়িয়া রাস্তা এদিক থেকে ওদিক চলে গেছে। পথের দুধারে, পথের ওপরই বসে পড়েছি আমরা। সকলে নির্বাকপ্রায়। মৌন স্তব্ধ প্রকৃতি। যে কয়জন বন্ধুকে কাল হারিয়েছি আমরা, তাদের বিয়োগব্যথা অন্তরে কম লাগেনি। ওকথা ভাবতেই আবেগের এক কুলভাঙ্গা ঢেউ মনের ভেতর তোলপাড় করে উঠলো। টন্‌টন্‌ করে উঠলো কলজের গোড়া। কাল পর্যন্ত তারা ছিল আমাদের মাঝে। সংগ্রামের পথে স্থির লক্ষ্যের দিকে চলতে চলতে কত আলাপ আলোচনাই না করেছি। কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে লড়াই করেছি। আজ তারা নেই। পাহাড়ের বুকে মাটির শয্যায় শায়িত তাদের রক্তাক্ত দেহ নিশ্চল, নিথর, চিরনিদ্রায় মগ্ন। তারা জাগবে না আর কোনকালে, ভাঙ্গবে না তাদের এ'ঘুম। কিন্তু, অনাগত কালের প্রতি মুহূর্তে ঘরে ঘরে তারা ঘুম ভাঙ্গাবে নিদ্রাতুর মানুষের। তাদের রক্তে ভেজা মাটি চিরদিন গাইবে জাগরণের গান। প্রেরণা জোগাবে মুক্তিযুদ্ধের। তারই তরঙ্গের আঘাতে ওলট-পালট হবে ব্রিটিশ-ভারত, চুরমার হবে ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদ। চূর্ণ হবে শোষণের জিঞ্জির। তাই সান্ত্বনা খুঁজলাম। জীবনের চেয়ে যে মৃত্যু দীপ্ত, সে তো মৃত্যু নয়। বন্ধুরা মরে জয় করেছে মৃত্যুকে। হয়েছে অমর।

বৈশাখের বর্ষণ ক্লান্ত সকাল। মনে হচ্ছিল, বর্ষাধৌত শারদীয় সকাল। পাহাড়ের চূড়ায় চূড়ায় গাছপালা, লতাপাতা যেন স্নান করছে স্নিগ্ধ সূর্যকিরণে। কত রকমের পাখির মধুর কলরবে মুখর বনানী। প্রাণের আবেগে তারা এ গাছ থেকে ও গাছে উড়ে উড়ে বসছে, লাফালাফি করছে। ব্রিটিশ শাসনের শৃঙ্খলে তারা আবদ্ধ নয়। সাম্রাজ্যবাদের নিগড়ে আটকা পড়েনি তাদের অধিকার। তারা মুক্ত, তারা স্বাধীন। এক দিকে মুক্ত বিহঙ্গের

অবাধ ছুটোছুটি, অন্যদিকে প্রকৃতির অপরূপ সৌন্দর্যরাশি। ক্লান্ত দেহের শ্রান্তমন ক্ষণিকের জন্য নেচে উঠলো আনন্দে। প্রিয়জনের বিয়োগ-ব্যথায় দগ্ধমন হল শান্ত। কাল যারা কালজয়ী হয়েছে, সৌন্দর্য্য ও মুক্তির ছবি উপভোগ করতে পারলো না তারা। এই পৃথিবীর রূপ, রস, গন্ধ, বর্ণ তাদের সকল অনুভব অনুভূতির অতীত। অর্ধেন্দু, প্রভাস, বিধু, পুলিন, মতি, মধুদা', শশাঙ্ক, নির্মল, জিতেন, নরেশ, ত্রিপুরা, টেগরা ও অম্বিকা দা'— তাদের কথা মনে পড়তেই দু'ফোটা তপ্ত অশ্রু গড়িয়ে পড়লো।

এমন সময় আমরা দেখলাম, অদূরে পাহাড়ের বাঁক ঘুরে এগিয়ে আসছে এক মুসলমান চাষী। তার হাতে একটা পুঁটলি। আমরা সকলেই একসাথে তার দিকে দৃষ্টি ফেরালাম। তখনি তাকে ডাকা হল। কাছে এসেই সে অবাক, স্তম্ভিত নেত্রে আমাদের দিকে তাকিয়ে রইলো। তাকে বসতে বলা হল। বিস্ময়ের ঘোর কেটে যেতেই বসে পড়লো সে। আমরা কারা, কি করেছি, তাকে জানানো হল। মনে হল, সে আগেই ঠিকঠিক আঁচ করেছে। কোন জায়গায় আছি, কোনদিকে গেলে পাহাড় থেকে নিরাপদে বেরিয়ে পড়া যাবে সব তার কাছ থেকে ভালভাবে জেনে নিলাম আমরা। তাকে জিজ্ঞেস করা হল, পুঁটলিতে কি আছে। 'একটা পেঁপে আর একটা আম', এই বলে সে পুঁটলি খুলে দেখাল। ঐ দুটো জিনিস আমাদের মধ্যে বেঁটে দেওয়া যায় কিনা এ'কথা জানতে চাইলে সে সানন্দে সম্মতি জানালো। ঐ দুটো জিনিস একুশ টুকরো করে আমরা সবাই খেলাম।

আবার হাঁটার পালা হল শুরু। লোকটিকে মাঝখানে রেখে আমরা কয়েকজন সামনে আর বাকিরা পেছন থেকে মার্চ করছি। কখনো কখনো দু'পাহাড়ের মাঝখানে সঙ্কীর্ণ পথ দিয়ে, কখনো আঁকা-বাঁকা পথে, কখনো বা পাহাড় ডিঙ্গিয়ে চলেছি। শেষে ফৌজদারহাটের পেছনে রেল লাইনের বাঁ ধারে পাহাড়ি এলাকায় পৌঁছলাম। আমরা যে জায়গায় এসে পৌঁছলাম সেটা ঠিক পাহাড় নয়। ঘন বৃক্ষরাজি পূর্ণ কিন্তু উঁচু জায়গা। তখন ঘড়িতে বেলা একটা, কিন্তু মনে হচ্ছিল যেন বিকেল পাঁচটা হবে। চারিদিকে গাছের প্রাচীর ও ছাউনী, দিনের বেলায়ও আবছা আবছা অন্ধকার।

লোকটাকে যেতে দিলাম না, আমাদের সঙ্গে রাখলাম। আমাদের পথ দেখিয়ে সাহায্য করার আর দরকার ছিল না। তবু আমাদের নিরাপত্তার কারণেই আমরা তাকে ছাড়তে পারছিলাম না। ঠিক হল রাতেই তাকে ছেড়ে দেবো। লোকা দা' 'পণ্ডিত' বলে ডাক ছেড়ে বললেন, 'ফৌজদারহাট থেকে চিড়ে, গুড়, ঘোল কিনে আন।' কাপড় বদলে দ্বিগেন আমি

ফৌজদারহাটের দিকে রওনা হলাম। খাবার নিয়ে ফিরে এলাম। লোকা দা' তাগিদ দিলেন খাবার জিনিসগুলো সকলকে বেঁটে দেবার জন্য। ঐ সময় দেবীপ্রসাদ বলে উঠলো, 'ওরা ক্লান্ত, আমরাই এখন ভাগ-বাটোয়ারা করার কাজটা সেরে নিতে পারি।' অন্য কয়েকজনের সাহায্যে কাজটা সে সুষ্ঠুভাবে করে নিল। মনে মনে দেবুর প্রশংসা করলাম, খুশিও হলাম।

বিকেল চার-পাঁচটার সময় আমাদের করণীয় নিয়ে আলোচনা শুরু হল। অধিকাংশের মত হল পলাতক জীবন যাপনের জন্যে। অল্প সংখ্যকের মত ছিল তক্ষুণি শহরে ঢুকে ইউরোপিয়ানদের হত্যা করা। এ ছাড়া যাদের বিপদের কোন ঝুঁকি নেই, ঐ ঘটনার সাথে জড়িত বলে পুলিশের কোন সন্দেহ বা নজর নেই, তারা বাড়ি চলে যেতে পারে। যাহোক রাতেই নিরাপদ স্থানে সবাই ডিসপার্স করবো বলে স্থির হল।

সন্ধ্যা নামলো। লোকটাকে আমাদের সারির মাঝখানে রেখে রওয়ানা হলাম। ঝাড়-ঝোপ, বন-জঙ্গল অতিক্রম করে ক্ষেতের জমিতে নামলাম। খানিক দূরে নিরাপদ স্থানে লোকটাকে আলিঙ্গন করে বিদায় দিলাম। বিনোদ চৌধুরী তাঁর আত্মীয়ের নিরাপদ আশ্রয়ে উপযুক্ত চিকিৎসার ব্যবস্থা করতে পারবেন—ঐ ভরসা জানালে তাঁকেও বিদায় দেওয়া হল। তারপর আরো কিছুদূর এগিয়ে আমরা সমুদ্রসৈকতে এসে পৌঁছলাম।

ঘোর অন্ধকার রাত্রি। জনমানবহীন সমুদ্রসৈকত। যেন কবরস্থানের গভীর নিস্তব্ধতা বিরাজ করছে। মাস্কেট কাঁধে আমরা বিশ জন বালির ওপর দিয়ে মার্চ করে চলেছি। রাত তখন প্রায় একটা। গন্তব্য স্থানে পৌঁছতে আর বিলম্ব নেই। যারা কাল একসাথে লড়াই করলাম, প্রাণ দিতে গেলাম, হয়তো তাদের অনেকেরই সঙ্গে আর দেখা হবে না—একথা ভাবছি আর হাঁটছি।

কাট্টলি গ্রামে

কাট্টলি গ্রামে পৌঁছলাম। শুরু হল বিদায়ের পালা। মাস্কেট, কার্তুজ, থলে ইত্যাদি নিক্ষিপ্ত হল সমুদ্র গর্ভে, পুকুরে। রইল শুধু ইউনিফরম ও ইনসিগনিয়া। ধুতি, জামা পরবার তাড়াহুড়া পড়ে গেল। লোকা দা' ও আরো কয়েকজন গেলেন প্রাণহরি দাশের বাড়িতে। সহায়রাম ও অন্যান্য কয়েকজনকে অপেক্ষা করতে বললাম। নিশ্চয়তা দিলাম, কাপড়-চোপড়ের ব্যবস্থা করে দেবার। তখনকার দিনে কাট্টলি ছিল আমার বেশ পরিচিতি গ্রাম। সাংগঠনিক কাজে অনেকবারই আমাকে যেতে হয়েছে সেখানে।

প্রথম থেকে কিছুটা সংগঠনও গড়ে তুলেছিলাম কাট্টলিতে। কিন্তু অবস্থাটা এমন দাঁড়াল কারও জন্যে কেউ অপেক্ষা করলো না। যে-যেদিকে পারে কাপড়-চোপড় যোগাড় করে রওয়ানা দিল। দ্বিগেন, কৃষ্ণ, রণধীর ও আমি এক পরিচিত যুবকের বাড়িতে উঠলাম গিয়ে। তাকে ঘুম থেকে জাগিয়ে তুললাম। আমাদের দেখেই সে অবাক বিস্ময়ে তাকিয়ে রইলো যেন ভূত দেখছে। কাপড়ের কথা জানাতেই ছেঁড়া জামা-কাপড় এনে দিল। এবার আমরা সত্যি সত্যি রিক্ত হলাম। মুহূর্ত পূর্বের চিহ্ন পর্যন্ত আর আমাদের রইলো না। তক্ষুণি ওখানেই শুয়ে পড়লাম। বোধ করি ঘণ্টা খানেকের বেশি হবে না। সে আমাদের জাগিয়ে বললো যে, আমরা তার কাকার নজরে পড়লে তার ও আমাদের অত্যন্ত অসুবিধায় পড়তে হবে। সে তার বক্তব্যের পক্ষে যুক্তি খাড়া করতে চেষ্টা করলো। ভয় নিরসনের চেষ্টা করলাম না। আমরা উঠে পড়লাম এবং শান্তি চক্রবর্তীর বাড়ী গিয়ে রাত্রিটা কাটিয়ে দিলাম।

২৪শে এপ্রিল ভোর হবার সাথে সাথে রওয়ানা হলাম। বড় রাস্তার ধারে বর্তমান কৈবল্যধামের নিকটে আমরা চারজন উঠলাম এক পরিচিত বাড়িতে। সকলেই ক্লান্ত, চোখ ভরা ঘুম ও পেট জুড়ে ক্ষুধা। স্নান সেরে তিনজনই ঘুমিয়ে পড়লাম। খাওয়ার সময় এলে গোগ্রাসে খেয়ে নিলাম। ১৮ই এপ্রিল থেকে ২৪শে এপ্রিলের মধ্যে সেদিনই যেন পেট ভরে খেয়েছিলাম। যাদের বাড়ী উঠেছি, তাঁদের কাছে আমরা কোথেকে কি করে এসেছি তা বলিনি, কিন্তু তারা আমাদের দেখেই অনুমান করেছিলেন, আমরা কোথেকে কি করে এসেছি। দুপুর বেলা হবার সময় এগিয়ে আসছে। কিছু টাকা পয়সাও দরকার, কি করা যায় ভাবছি; এমন সময় বাড়ির মালিক স্বতঃপ্রবৃত্ত হয়ে বললেন যে, পাহাড়তলীর রাস্তায় যেন আমরা চারজন একত্রে না চলি। দু'জন দু'জন করে যেন যাই। আমার রিস্ট ওয়াচ ও পাঁচ ব্যাটারীর টর্চটা দশটাকা মূল্যে বাড়ির মালিকের কাছে দিলাম বিক্রি করে এবং বিদায় নিয়ে রাস্তায় বেরিয়ে পড়লাম।

বেলা প্রায় পাঁচটার সময় ডবলমুরিং-এ পৌছলাম। জানতে পারলাম ফিরিঙ্গি বাজারে এক কালভার্টের নিচে অমরেন্দ্র নন্দীকে গুর্খা সৈন্যরা গুলি করে হত্যা করেছে। শুনে দুঃখে মন ভরে গেল।

টার্নামরিসন ঘাটে এসে একখানা ঘোড়ার গাড়ি আনতে পাঠানো হল দ্বিগেনকে। গাড়ি করে পাথরঘাটা গঙ্গা বাড়িতে এসে নামলাম। ওখান থেকে এক হাঁটু কাদা ভেঙ্গে চাক্তাই পৌঁছলাম সন্ধ্যায়। দোকানে চা বিস্কুট খেয়ে সাম্পানে চড়ে দ্বিগেন ও রণধীরের গ্রাম পরৈকোড়ার দিকে রওয়ানা হলাম।

মাস্টার দা', নির্মল দা' সহ ষোল জনের বিচ্ছিন্ন দলটি কিছুদূর এগিয়ে বুঝতে পারলো যে, আমাদের ২৩ জন থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়েছেন তাঁরা। চলার পথে ঘন গাছপালা ভরা পাহাড়ে তাঁরা আশ্রয় নিলেন। ত্রুটি রাখলেন না সতর্ক সাবধানতার। এমনভাবে রইলেন যেন ঝোপের একটা পাতাও না নড়ে। পরের দিন ভোরে এল কালবৈশাখী ঝড়। শুরু হল প্রবল বর্ষণ। এই দুরন্ত প্রাকৃতিক দুর্যোগকে উপেক্ষা করে তাঁরা চুপচাপ দিনের বেলাটা কাটিয়ে দিলেন পাহাড়ের মাঝখানে।

তাঁদের সাথে ছিল গুরুতর আহত বিনোদ দত্ত। মৃত্যুর দরজা থেকে সে যেন ফিরে এসেছে। তার ডান হাত ও কাঁধের সন্ধিস্থল ভেদ করে গুলি এফোঁড় ওফোঁড় বেরিয়ে গেছে। আর একটু নিচে হলেই কলজে ভেদ করতো। রক্তক্ষরণে সে খুবই ক্লান্ত। তবুও মানসিক দৃঢ়তা ও মাস্টার দা'র মুগ্ধকর সান্নিধ্য তার সকল যন্ত্রণা ভুলিয়ে দিয়েছিল।

সন্ধ্যা নামল পাহাড়ের বুকে। ছড়িয়ে দিল আঁধারের শামিয়ানা। প্রহর গড়িয়ে পড়লো রাতের অঙ্কে। রাতের ঘন অন্ধকারে তাঁদের যাত্রা হল শুরু। নিশ্চিন্তে পথ চলার উপায় নেই। অতি সন্তর্পণে পাহাড় থেকে নিষ্ক্রান্ত হলেন। ঝরঝরগ্যা বটতলীতে পৌঁছল ষোলজন অগ্নিপুরুষের কাফেলা। সামনে পড়লো একটা দোকান। তখন সবলের পেটে চলছে ক্ষুধার রাজত্ব। দোকান থেকে খাবার কিনে তাঁরা ক্ষুন্নিবৃত্তি করলেন।

আহত বিনোদই তখন বড় এক সমস্যা। তার কী ব্যবস্থা করা যায়—এ কথা ভাবছিলেন মাস্টার দা' স্বয়ং। ফতেয়াবাদে তার বোনের বাড়িতে আশ্রয় নিয়ে চিকিৎসার ব্যবস্থা করা যেতে পারে বলে বিনোদ জানালো। কালী দে তাকে সেখানে পৌঁছে দিয়ে আসুক—ঐ প্রস্তাবও সে করে বসলো। প্রস্তাবটা যুক্তিসঙ্গত ভেবে মাস্টার দা' সম্মতি দিলেন।

অন্ধকার রাত। বিনোদনের দেহভার কালীর কাঁধে রেখে তাঁরা রওয়ানা হল আশ্রয়ের উদ্দেশ্যে। আহত বিনোদ চলেছে খুঁড়িয়ে খুঁড়িয়ে অনেক কষ্টে। কালীই তার দেহভার টেনে নিয়ে চলছিল। পুলিশ ও মিলিটারীর দৌরাত্মে রাস্তায় চলা ছিল মুশকিল। তাই চষা জমির উপর দিয়ে অপথে-বিপথে তাদের দু'জনকে এগিয়ে যেতে হচ্ছিল। এমন সময় পথে, অদূরে মিলিটারী প্রহরীদল তীব্র আলোক রশ্মি ছুঁড়ে ছুঁড়ে টহল দিচ্ছিল। মিলিটারী ট্রাকের বিচ্ছুরিত আলোককণা এড়ানোর জন্য তারা জমিতে শুয়ে পড়ল, আবার মিলিটারী ট্রাক দৃষ্টিসীমার বাইরে চলে গেলে হাঁটতে শুরু করল। একটু অসাবধান হলে আর রেহাই ছিল না। লুকোচুরি খেলে

খেলে এভাবে কালী বিনোদকে তার বোনের বাড়াতে পৌঁছে দিল। তারপর বহু বিপদের ঝুঁকি মাথায় নিয়ে আঁকা-বাঁকা পথে কালী তার নিজের বাড়ি গোলাইডেঙ্গায় ফিরে গেল।

১৫ জন সাথী নিয়ে মাস্টার দা' চলছিলেন অন্যপথে। জনপথ এড়িয়ে লোকদৃষ্টির অন্তরালে ফতেয়াবাদ-হাটহাজারী রাস্তা পার হয়ে তারা এগিয়ে চললেন। ক্লান্ত ও শ্রান্ত সকলেই। কিন্তু চলার গতি থামছে না কারো। রাতারাতি হাটহাজারী থানা অতিক্রম করে তারা ঢুকলেন রাউজান থানায়। আঁকা-বাঁকা অনেক পথে, অনেক গ্রাম পেছনে ফেলে তাঁরা পৌঁছলেন নয়াপাড়া গ্রামে। সকলেই উঠলেন সহযাত্রী সুবোধ রায়ের বাড়ীতে। সেখানে গোপন পাহারার ব্যবস্থা হল তাড়াতাড়ি। বাড়ির চারিদিকে সতর্ক পাহারা মোতায়েন হল। সকলে খুলে ফেললেন ইউনিফরম, ইনসিগনিয়া ইত্যাদি। মাস্কেটগুলো গোপন জায়গায় মজুদ রাখলেন ভবিষ্যতের প্রয়োজনের কথা ভেবে। নিজস্ব আশ্রয়ে যাঁরা চলে যেতে চাইলেন তাদের যাবার স্বাধীনতা দেয়া হল। ব্যবস্থা হল তাদের নিরাপদে পৌঁছে দেবার। তক্ষুনি রাউজান, বোয়ালখালি ও পটিয়া থানার জায়গায় জায়গায় নির্দেশ পাঠানো হল বিশ্বাসী সংগঠকদের কাছে—পলাতক কেউ এসে পড়লে যেন তাড়াতাড়ি তাদের ওয়াকিবহাল করানো হয়। পলাতকদের আশ্রয় ও অর্থের যেন ব্যবস্থা করা হয় তড়িৎগতিতে। এই যখন অবস্থা তখন এই সময় লোকা দা', রজত, মনোরঞ্জন, স্বদেশ, দেবীপ্রসাদ, ফনী নন্দী ও সুবোধ চৌধুরী গ্রামে এসে পৌঁছলেন। তাঁরা যোগাযোগ রাখলেন মাস্টার দা'র সঙ্গে।

অনন্ত দা' ও গণেশ দা'র কথা

১৮ই এপ্রিল অনন্ত দা', গণেশ দা', জীবন ঘোষাল ও আনন্দ গুপ্ত মোটরে করে মারাত্মকভাবে দগ্ধ হিমাংশুকে তার চন্দনপুরাস্থ বাসায় পৌঁছে দিয়েছিলেন। সেবা শুশ্রূষা ও তদারকের সকল ভার সুখেন্দ দস্তিদারের উপর ছেড়ে দিয়ে তাঁরা অস্ত্রাগারে ফিরে যান। অস্ত্রাগার এলাকা তখন জনমানবশূন্য। সেখানে শ্মশানের নীরবতা বিরাজমান। কেবল নিভন্ত অগ্নিশিখা মাঝে মাঝে জ্বলে উঠছিল তারপর স্তিমিত হয়ে যাচ্ছিল। তারা দেখলেন, দেয়ালগুলো মাংসহীন কঙ্কালের মত বীভৎস হয়ে গেছে। তারা এদিক ওদিক সর্বত্র খুঁজে দেখলেন সাথীদের কিন্তু কেউ নেই। গার্ড রুমের ভেতর তাঁদের চোখে পড়ল বন্ধনগ্রস্ত পাহারাদারটা। বড় করুণ তার মুখখানা। পলকহীন শূন্য দৃষ্টি প্রসারিত করে তাকিয়ে আছে আগন্তুকদের দিকে। সে দৃষ্টি অর্থহীন, ভাষাহীন।

গণেশ দা' ও অনন্ত দা' বুঝলেন ভস্মীভূত অস্ত্রাগারের সামনে আর দাঁড়িয়ে থেকে লাভ নেই। যে কোন মুহূর্তে বিপদ হতে পারে। তাই ক্ষণ-বিলম্ব না করে তারা ফিরে চললেন। মোটর হাকিয়ে সারা শহর তন্ন তন্ন করে খুঁজলেন আমাদের। আমাদের জন্য তারা তখন পাগল-প্রায়। রাত শেষ হয়ে গেল তবুও তারা আমাদের খোঁজ পেলেন না। তখন পূর্বাকাশে ভোরের আভা পরিস্ফুট হয়ে উঠছে। প্রভাতের আলোকরেখা ফোটার আগেই তাঁরা আনন্দ গুপ্তের বাসায় পৌঁছে গেলেন। সেখানেই তাঁরা গোপনে রইলেন। বাসাবাড়িখানা ছিল টিলার ওপর। বাসার পেছন দিকে বিস্তীর্ণ টিলাশ্রেণী মিশেছে দেব পাহাড়ের সাথে। আনন্দের মা ও বোনেরা সারাদিন টিলার ওপর পাহারায়। তার নয় দশ বছর বয়স্ক ছোট ভাই 'ছোটকন' এমন জায়গায় বসে পাহারা দিচ্ছিল যাতে রাস্তার বহুদূর পর্যন্ত নজরে থাকে। সন্দেহের রেশ দেখলেই যেন তুরন্ত খবর পৌঁছে দিতে পারে অনন্ত দা'দের কাছে। পুলিশকে রাস্তায় দেখলেই 'ছোটকন' ইশারায় জানিয়ে দিত। অনন্ত দা'রা পেছনের টিলাশ্রেণীর মধ্যে মিশে যেতেন। পুলিশ যদি তল্লাশিও চালাতো তবু কাউকে খুঁজে পাওয়ার উপায় ছিল না। দিনের বেলাটা তারা সেখানেই গোপনে কাটিয়ে দিলেন।

সন্ধ্যা নামলো। সমস্ত শহরে বেনিয়া ইংরেজ তখন কারফিউ জারি করে দিয়েছে। সন্ত্রাসের তপ্ত হাওয়া বইছিল সারা শহরে। কিন্তু, ঐ কারফিউয়ের ভয়ে কম্পিত নয় অগ্নিপুরুষের হৃদয়। যাঁরা পর্বতসম গোলাবারুদকে পরোয়া করেননি, সামান্য সান্ধ্য আইনকে তোয়াক্কা করবেন তাঁরা ? কারফিউর বিভীষিকা উপেক্ষা করে তাঁরা সারা শহর টহল দিয়ে ঘুরে বেড়ালেন। অলিগলি করলেন পরিক্রম। সন্ধান নিলেন আমাদের সকল সম্ভাব্য স্থানে। কিন্তু আমাদের খোঁজ পেলেন না, আমাদের সন্ধান মিলবে কোথায় ? আমরাও তখন যোগাযোগ-বিহীন, বিচ্ছিন্ন। তাই আমাদের সন্ধানে ঘোরা হয়েছে মরীচিকার পেছনে ধাওয়া করার মত। অবশ্য কারফিউ হল নামে মাত্র, শহরতলী তখনও অরক্ষিত ও অসংগঠিত।

রাত প্রায় শেষ হয়ে এলো। আশ্রয় দরকার। ভোর হবার আগে তারা উঠলেন রজত সেনের বাসায়, ফিরিঙ্গিবাজারে। ইত্যবসরে শাসককুল ধকল কিছুটা সামলে নিয়েছে, সংহত হয়েছে খানিকটা। এদিক ওদিক থেকে কিছু রিভলবার, রাইফেল ও বন্দুক যোগার করে তল্লাশির কাজ শুরু করেছে। কিছু কিছু হামলাও চালাচ্ছে।

২০শে এপ্রিল। সকাল আটটা প্রায়। একদল ইংরেজ সার্জেণ্ট পুলিশ-দল সহ অতর্কিতে ঢুকে পড়ে রজত সেনের বাসায়। ঘরের ভিতর ঢুকেই তল্লাশি শুরু করলো। রজতের বাবা রঞ্জন বাবু পুলিশ দলের আবির্ভাব

দেখেই অবাক। বুকটা তার তোলপাড় করে উঠলো। মুহূর্তে তিনি নিজেকে সামলে নিলেন। সার্জেন্টরা প্রশ্ন করতে থাকলো রঞ্জন বাবুকে, তিনি শান্তভাবে জবাব দিচ্ছিলেন। ঐ যখন অবস্থা তখন মাথার ওপরের বেড়ার ছাদের ওপর অনন্ত দা' ও তার সাথীরা তৈরি হয়ে গেলেন। বিপ্লবীদের অভিধানে আত্মসমর্পণের বালাই নেই। মৃত্যুর সাথে পাঞ্জা খেলাকে তারা খেলা হিসেবে ধরে নেন। এক শ্বাসরোধকর অবস্থার সামনে তারা। ছাদের ওপর উপুর হয়ে তারা রিভলভারের মুখগুলো নিচের দিকে নিশানা করে রেখেছিলেন পুলিশ ও সার্জেন্টদের মাথার ওপর। প্রস্তুতি দৃঢ়। ছাদের ওপর তল্লাশি করতে চাইলে যুগপৎ গর্জে উঠবে চারটে রিভলভার। পুলিশ ও সার্জেন্টদের মাথার বহ্মতালু ছিন্ন করবে গুলি ভবলীলা সাঙ্গ হবে তাদের। এ অবস্থায় অন্যান্য পুলিশ নির্ঘাত পালিয়ে যাবে। আর অনন্ত দা'রা সকলে সদলবলে কেটে পড়তে পারবেন। যা হোক, সার্জেন্ট দল কিন্তু আর বেশি দূর পা বাড়ালো না, অন্যত্র ছুটলো তল্লাশির জন্য, শিকারের সন্ধানে।

২১শে এপ্রিল তারা গোঁসাইডেঙ্গার দীনেশ চক্রবর্তীর বাসায় রাত কাটালেন। ২১শে এপ্রিল তাঁরা ঠিক করলেন, চট্টগ্রামে থাকা তাদের পক্ষে ঠিক হবে না। কারণ পরিস্থিতি তাদের পক্ষে নিরাপদ নয। তারা সিদ্ধান্ত নিলেন, গোপনে কলকাতা চলে যাওয়ার। ঐদিন সন্ধ্যার অন্ধকারে তারা শহরের বাইরে কুমিরা স্টেশনে গিয়ে পৌঁছান।

পরদিন ২৩শে এপ্রিল। সকাল বেলা অনন্ত দা'রা শুনলেন, জালালাবাদের রক্তগাথা। উপলব্ধি করলেন যথার্থ পরিস্থিতি। স্থির করলেন, চট্টগ্রামে অবস্থান করা তাদের পক্ষে যুক্তিসঙ্গত হবে না। এ পর্যন্ত তাঁরা আমাদের সঙ্গে যোগাযোগ স্থাপন করার অবিরাম চেষ্টা করেছেন। এবার মনে করলেন, এখন এই রক্তক্ষয়ী সংঘর্ষের পর যোগসেতু রচনা করা অসম্ভব। অতএব, চট্টগ্রাম আর নিরাপদ নয় তাদের জন্য। তারা সিদ্ধান্ত করলেন, কলকাতাতেই চলে যাবেন। পরের দিনই তারা ফৌজদারহাট হয়ে কুমিরা স্টেশনে পৌঁছলেন।

ফেনী সংঘর্ষ

পুলিশের তৎপরতা অতিমাত্রায় বেড়ে গেল। অস্ত্রাগারে মার খেয়ে ব্রিটিশ হায়েনা মাতাল হয়ে উঠেছে। গন্ধ শুঁকে শুঁকে তারা তল্লাশি করতে লাগলো। গণেশ দা'র বাসাও বাদ পড়ল না। ও বাসায় পুলিশ পেয়ে গেল অস্ত্রাগার দখল অভিযানে অংশগ্রহণকারী প্রায় সকলের নাম সম্বলিত

একটি তালিকা। কর্তৃপক্ষও ইতিমধ্যে কিছুটা সংহত ও সংগঠিত হয়েছে। মুক্তি সংগ্রামে অংশগ্রহণকারী অনেকেরই নাম তখন পুলিশের খাতায় অন্তর্ভুক্ত হয়ে পড়েছে।

কর্তৃপক্ষ বড়শির ছিপ ফেললো টাকার টোপ এঁটে দিয়ে। প্রায় সকলের ওপর জারি হল হুলিয়া ঘোষিত হল ইনাম। ২০০ টাকা থেকে ৫০০০ টাকা পর্যন্ত পুরস্কার মিলবে বীর সন্তানদের ধরিয়ে দিলে। ছয়জনের জন্য ৫০০০ টাকা করে দেবে—সে তালিকায় নাম ছিল অনন্ত দা', গণেশ দা', মাস্টার দা', অম্বিকা দা', নির্মল দা' ও লোকা দা'। সেই সাথে সকলের ফটো, দেহ ও চেহারার বিবরণ লিখিত বিজ্ঞাপন প্রদর্শিত হল সকল গুরুত্বপূর্ণ জায়গায়, যেখানে যেখানে জনসমাগম হয়। রেল স্টেশন, জাহাজ ঘাট, হাট-বাজারে মানুষ দেখতে লাগল অগ্নিপুরুষদের ছবি।

কুমিরা স্টেশন। আনন্দ গুপ্ত গেলেন টিকেট কিনতে। বাকি তিনজন রইলেন লোকচক্ষুর অন্তরালে। তারা সকলে ছদ্মবেশ নিলেও আনন্দের চেহারা সন্দেহের সৃষ্টি করলো। তাই স্টেশন মাস্টার টিকেটের নম্বরগুলো টুকে রাখলো এবং চেহারার বিশদ বিবরণও পাঠিয়ে দিল ফেনী স্টেশনে। অনন্ত দা'রা ট্রেনে চড়লেন। জানতে পারলেন না যে কি ঘটতে যাচ্ছে। তারা জানতেন না সম্মুখে সমূহ বিপদ আসন্ন।

ফেনী স্টেশনে ট্রেন থামলো। কেউ নামছে যাত্রা শেষ করে, কেউ উঠতে শুরু করেছে গাড়িতে। এক দারোগা কয়েকজন পুলিশ সহ উঠল অনন্ত দার কম্পার্টমেন্টে। টিকেট চেক করতে করতে ঐ চারজনের নাম ধাম পেশা ইত্যাদি জিজ্ঞেস করার পর স্টেশনের পুলিশ ফাঁড়িতে তাদের হাজির হতে হবে বলে জানালো। অনন্ত দারা সাধারণ গ্রাম্য লোক হিসেবে ভাণ করলেন। পুলিশ বেষ্টনীর ভেতর দিয়ে যাওয়ার সময়ও সাধারণ লোকের মত ভাণ করে আচরণ করায়, পুলিশদের ভেতর কিছুটা দ্বিধাও এসেছিল। কিন্তু, শেষ পর্যন্ত স্টেশন মাস্টারের কামরায় তাদের সকলকে নিয়ে ঢুকানো হল। বাইরে রেল লাইনের ওপর গুর্খা ভর্তি ট্রেন দাঁড়িয়ে। পুলিশ ফাঁড়ি থেকে পালানো দুঃসাধ্য ও অসম্ভব। ভেবে তাঁরা উদ্বিগ্ন ও চিন্তিত হয়ে পড়লেন।

স্টেশনের ফাঁড়ির ভেতর দেহ তল্লাশির দাবি করে বসলো পুলিশ। গণেশ দা প্রস্রাবের ভাণ করে সিপাই-এর জিম্মায় প্রস্রাবখানার দিকে গেলেন। তল্লাশির জন্য মাখনকে ডাকা হল প্রথম। এক অদ্ভুত অবস্থার সম্মুখীন হল সকলে। তল্লাশি করতে যাচ্ছে দেখে অনন্ত দা' গুলি করলেন পেছনে দাঁড়ানো সিপাইকে, লাফিয়ে উঠলেন সামনের টেবিলের ওপর। পুলিশ দলকে হুমকি দিলেন গর্জন করে, 'এক্ষুনি পালাও, নচেৎ গুলি করবো

তোমাদের সবাইকে।' গুলি চালিয়ে মুহূর্তে তিনি কামরা থেকে বেরিয়ে পড়লেন। পেছন ফিরে তাকালেন, দেখলেন একজন দারোগা দাঁড়িয়ে সেখানে। আর এক রাউণ্ড গুলি ঝাড়লেন তার উপর। তারপর উধাও হলেন। অনন্ত দা' বেরিয়ে যাবার সাথে সাথে অন্যরা বেরিয়ে পড়লেন। যাবার সময় দরজার পাশে দাঁড়ানো এক সিপাই মাখনের মাথায় রাইফেলের বাট দিয়ে আঘাত হানলো। ঝর ঝর করে রক্ত ঝরতে লাগলো। তবু আহত অবস্থায়ও সে দ্রুত সেখান থেকে পালিয়ে গেল।

প্রস্রাবখানায় বসে গণেশ দা' খুলে নিলেন রিভলভার। ঐ সময় স্টেশন কামরায় চলছিল হৈ চৈ, গুলির আওয়াজ। গণেশ দার হাতে তার দিকে নিশানা করা রিভলভার দেখে সিপাই ভ্যাবাচ্যাকা খেয়ে গেল। দৌড়ে গেল পালিয়ে। গণেশ দা'ও চোখের পলকে সরে পড়লেন।

আনন্দ ও মাখন বিচ্ছিন্ন অবস্থায় হাঁটতে লাগল। রাস্তা-ঘাট তাদের সম্পূর্ণ অপরিচিত। গুরুতর আহত মাখন কিশোর আনন্দের কাঁধে ভর করে খুঁড়িয়ে খুঁড়িয়ে চলছিল। তার ওপর আবার নির্ভরযোগ্য নেতৃদ্বয় থেকে তারা দু'জন বিচ্ছিন্ন। তবুও চলতে লাগল তারা অজানার পথে। রক্ত ঝরতে দেখে আনন্দ নিজের কাপড় ছিঁড়ে মাখনের মাথায় ব্যাণ্ডেজ করে দিল। কিছুদূর পথ চলার পর দেখা গেল, একজন লোক তাদের আগে আগে চলছে। আরো কিছুক্ষণ পর তারা লক্ষ্য করলো যে লোকটা কাপড় মুড়ি দিয়ে বসে পড়েছে। নিকটবর্তী হলে আনন্দ চ্যালেঞ্জ করে বসলো, 'হাত তোল, বন্ধু না শত্রু?' অজ্ঞাত ব্যক্তিটি হাত তুলতেই তারা আবার প্রশ্ন করে, 'তুমি কে?' পথিক আস্তে আস্তে বলে উঠল 'আমি গণেশ।' ঐ অপ্রত্যাশিত মিলনে তিনজনই খুশি ও আনন্দে আটখানা। তখন আফসোস কেবল যোগাযোগবিহীন অনন্ত দা'র জন্য। একটা বিরাট উদ্বিগ্নতা নিয়ে তারা হেঁটে চললেন। অবশেষে তারা সিলেটের দিকে রওনা হলেন। আনন্দের মামী সিলেটের স্কুল পরিদর্শক হিসেবে সরকারী চাকরি করতেন। ওখানেই তারা কয়েকদিনের জন্য আশ্রয় নিলেন। তারপর ঐ মহীয়সী মহিলার আর্থিক সাহায্যে অনেক ঘোর পথে তারা কলকাতা এসে পৌঁছান, এবং দিন কাটাতে থাকেন যুগান্তর পার্টির আশ্রয়ে।

অনন্ত দা' বিচ্ছিন্ন অবস্থায় তারের কাঁটায় হলেন বিদ্ধ। ওখানে কোন রকমে রেহাই পেয়ে খানিক দূরে যেতেই কাদা ভর্তি বড় একটা কুয়োয় পা ফসকে গড়িয়ে পড়লেন। কাদায় হলেন সর্বাঙ্গ লিপ্ত। কোন রকমে কাদা পরিষ্কার করে পরলেন একটা লেংটি, বোবা ও পাগল সেজে চলতে লাগলেন। অচেনা পথ-ঘাট, ক্ষিধেয় পেট চোঁ চোঁ করছিল। ছোট

ছোট ছেলেরা পাগলের পেছনে ধাওয়া করছে, ছেলেরা ছুঁড়ে ছুঁড়ে মারছিল ঢিল। নানা আঁকা-বাঁকা পথে গিয়ে রক্ষা পেলেন ছেলেদের হাত থেকে। ক্ষুধার জ্বালায় শেষ পর্যন্ত উঠলেন গিয়ে এক বাড়িতে। পেটের দিকে ইঙ্গিত করতেই গৃহস্থ ঘরের বউ এক থালা ভাত ও তরকারী এনে দিল। কিছু খেলেন, কিছু ফেললেন, কিছু নিলেন সঙ্গে। এভাবে চলতে চলতে একজনের সঙ্গে তাঁর পরিচয় হল। কিছুটা তারই দৌলতে বিপদের ঝুঁকি নিয়ে তিনি পৌছলেন কুমিল্লায়। সেখানে পিতৃবন্ধু কামিনীকুমার দত্তের বাড়িতে আশ্রয় নিলেন। তাঁরই চেষ্টায় এবং মোখলেসুর রহমান সাহেবের কৃতিত্বপূর্ণ কলাকৌশলে অনন্ত দা' কলকাতা পৌছে 'যুগান্তর' পার্টি'র আশ্রয় নিলেন। সেখানেই গণেশ দা' ও অন্যান্যদের সাথে তাঁর দেখা হল।

শত্রুর কবলে জালালাবাদ পাহাড়

২৩শে এপ্রিল সকাল বেলা। জ্ঞান ফিরে এলে অম্বিকা দা' দেখলেন আরও বেশি সৈন্য নিয়ে এসে পড়লো কর্নেল ডালাস স্মিথ ও ক্যাপটেন টেইট। দেখেই অম্বিকা দা' তার সমগ্র শক্তি জড়ো করে পাহাড়ের ঢালু থেকে গড়িয়ে পড়লেন নিচে—এক ঘনঝোপের ভেতর লুকিয়ে রাখলেন নিজেকে। দেখলেন, রাইফেলের মাথায় সঙিন চড়িয়ে চার্জ করার ভঙ্গিতে পাহাড়ের পার্শ্বদেশ ও পেছন দিক হতেই ক্যাপটেন টেইট ও কর্নেল ডালাস স্মিথের নেতৃত্বে ইংরেজ সৈন্যরা পাহাড়ে আরোহন করতে শুরু করলো। তারা তৈরী হয়েই এসেছে বেয়োনেট চার্জ ও হাতাহাতি যুদ্ধের জন্য। কিন্তু বিনা বাধায় পাহাড়ে উঠে তারা দেখতে পেল অন্য দৃশ্য। জালালাবাদ পাহাড় থেকে তাদের জীবন্ত শত্রুরা অদৃশ্য। বিপ্লবী যোদ্ধারা সরে গেছে অন্যত্র। তাদের চোখে পড়ল নয়জন শহীদ পড়ে আছে। দু'জন সাংঘাতিকরূপে আহত হয়ে মৃত্যুর অপেক্ষায় ক্ষণ গুণছে। আহত বিপ্লবী অর্ধেন্দু চিৎ হয়ে শুয়ে আছে পাহাড়ের মাঝখানে।

শহীদদের কেউ চিৎ হয়ে, কেউ উপুড় হয়ে পড়ে আছে। কেউ যেন মাস্কেট বুকে জড়িয়ে ধরে বিশ্রাম নিচ্ছে মাটির শয্যায়। কেউ উন্মীলিত নেত্রে পলকহীন দৃষ্টি প্রসারিত করে রেখেছে সকালের আবছা আলোকে, উদ্ভাসিত নীল আকাশের অসীম নীলে। মৃত দৃষ্টি যেন প্রকৃতির গভীর রহস্যের অতলে হারিয়ে গেছে। এ দেশের মাটিকে, দেশের মানুষকে তাঁরা ভালবেসেছিল। চেয়েছিল প্রিয় জন্মভূমিকে বৃটিশ সাম্রাজ্যবাদের শিকল থেকে মুক্ত করতে। মানুষ প্রাণভরে আস্বাদ করবে স্বাধীনতার অফুরন্ত

স্বাদ। তাদের দেশপ্রেমের অগ্নিপরীক্ষা হয়ে গেছে। বিপ্লবী প্রাণ পরাভব মানে না। তাঁরা যুদ্ধ করেই নিঃশেষে উৎসর্গ করলেন প্রাণ। প্রাণহীন দেহ পড়ে আছে পাহাড়ের বুকে। তাদের গায়ের খাকি পোষাক রক্তে রঞ্জিত। তারা মৃত। তাদের বুকে জড়িয়ে থাকা মাস্কেটগুলো আর কখনো গর্জে উঠবে না, উড়িয়ে দেবে না ব্রিটিশ সৈন্যের মাথার খুলি।

ব্রিটিশ সৈন্যরা গ্রুপে গ্রুপে সাজালো ইতস্তত: বিক্ষিপ্ত মৃতদেহগুলো। তারা সাথে করে নিয়ে এসেছিল ফাইন আর্ট গ্যালারীর ফটোগ্রাফার শশী দস্তিদারকে। তিনি সকলের ফটো তুলেছিলেন। অর্ধেন্দু ছাড়া অন্য সবার দেহ টেনে নেওয়া হল পাহাড়ের পূর্ব প্রান্তে। সর্বাঙ্গে ছিটিয়ে দেওয়া হল পেট্রোল। তারপর পেট্রোলে স্নাত দেহগুলোতে করা হল অগ্নি-সংযোগ। দাউ দাউ করে জ্বলে উঠলো আগুন। ঐ ভাবে সমাপ্তি ঘটল শহীদদের শেষ আচার-অনুষ্ঠানের।

অর্ধেন্দুকে হাসপাতালে এনেছিল তারা। চিকিৎসার জন্য নয়, স্বার্থ আদায় করে নেবার জন্যে। মৃত্যুপথযাত্রী অর্ধেন্দু রেহাই পেল না উৎপীড়নের হাত থেকে। পুলিশ জিজ্ঞাসাবাদ শুরু করলো। কে কে ছিল ইত্যাদি প্রশ্নবাণে জর্জরিত করে তুললো আহত বিপ্লবীকে। অর্থের লোভ দেখাতেও ত্রুটি করল না। কিন্তু তাদের সকল চেষ্টাই বিফল হল। অগ্নিমন্ত্রে দীক্ষিত অর্ধেন্দু চরম ঘৃণাভরে প্রত্যাখ্যান করলো সকল প্রশ্ন। সে মুখ খুলবে না কিছুতেই। শুধু একটি কথাই ধ্বনিত হয়েছিল তার মুখে—'আমাকে শান্তিতে মরতে দাও'।

এর কয়েক ঘণ্টা পড়েই অর্ধেন্দু এ জগৎ ছেড়ে গিয়েছিল। সেখানে সাম্রাজ্যবাদের লেলিহান রসনার প্রশ্ন কোনদিন পৌছাবে না।

অগ্নিদগ্ধ হিমাংশুকে গ্রেপ্তার করা হয়েছিল। সুখেন্দু বন্দী হবার কয়েক ঘণ্টা পরই হিমাংশু মৃত্যুবরণ করেছিল। শত চেষ্টা করেও বিদেশী বেনিয়া তাঁদের কাছ থেকে কোন কথা আদায় করতে পারে নি।

এই সব বিপ্লবী যোদ্ধারা শুধু ইতিহাস সৃষ্টি করেন নি। দৃষ্টান্ত রেখে গেছেন তুলনাহীন দেশপ্রেমের। তাঁরা একটি শিক্ষা দিয়েছেন, সমষ্টির স্বার্থে কি করতে হয়। ব্যক্তির চেয়ে সমষ্টি বড়—একথাই তাঁদের সকল কাজে সুপ্রকাশ। ব্যক্তি স্বার্থের চেয়ে মহৎ সমষ্টির স্বার্থ, দেশের স্বার্থ—জীবন দিয়ে তারা একথাই আমাদের শিখিয়ে গেলেন।

দেশ তাই তাদের ভুলতে পারেনি। আজো আকাশে বাতাসে তাদের স্মরণে ধ্বনিত হয়—'ভুলি নাই, ভুলি নাই।' তারা মরে হয়েছেন অমর।

১৯৪৬ সালে ও ১৯৫৭ সালে গিয়েছিলাম জালালাবাদ পাহাড়ে। দাঁড়িয়ে ছিলাম সে জায়গাতে যেখানে শহীদদের জ্বালানো হয়েছিল। ঐ

মাটিতে তখনো গজায়নি ঘাস, রয়েছে অনাবৃত সাদা। দেখে যেন মনে হয়, নতুন মাটি এনে রাখা হয়েছে।

বুকের তলদেশ ফেটে উদ্গত হল একটি স্পন্দন। অব্যক্ত এক অনুভূতি আলোড়িত করে দিল দেহমন। শরীরের প্রতি কণায় অনুভব করলাম বেদনাবিদ্ধ স্মৃতি। যুগ যুগান্তর হয়েছে অতীত—তবু মনে হতে লাগলো—এই তো সেদিনের কথা।

দুরন্ত আবেগের উচ্ছ্বাসে উদ্বেলিত হয়ে বসে পড়েছিলাম সেই প্রীতিভরা জায়গাটাতে। এক অদ্ভুত অনুভূতি অধিকার করে নিয়েছিল আমার সকল সত্তা।

আমি ভুলে গিয়েছিলাম সময়ের গতি। ফিরে গিয়েছিলাম বিপ্লবমুখর অতীতের প্রান্তরে। জানতাম ফেলে আসা দিন আর ফিরে পাব না। আমার অজান্তে এক ফোঁটা অশ্রু গড়িয়ে পড়েছিল।

কালারপুলের ঘটনা

১৯৩০ সালের ৬ই মে এক অবিস্মরণীয় কাহিনী রচিত হল কালারপুলের লড়াইয়ে। এই কালারপুল লড়াই বুড়ীবালামের তীরে ইংরেজ সৈন্যের বিরুদ্ধে যতীন মুখার্জির কথাই বার বার স্মরণ করিয়ে দেয়। ৫ই মে রাতের অন্ধকারে রজত সেন, দেবীপ্রসাদ গুপ্ত, মনোরঞ্জন সেন, স্বদেশ রায়, ফনীন্দ্র নন্দী ও সুবোধ চৌধুরী ইউরোপিয়ান ক্লাব ও ইউরোপিয়ান কোয়ার্টার নিশ্চিহ্ন করার উদ্দেশ্যে গ্রাম থেকে শহরে আসে। রাতের অন্ধকারে রজত তার ফিরিঙ্গী বাজারস্থ বাসায় পাঁচ বন্ধু সহ চুপি চুপি ঢুকে পড়ে। পুত্র গর্বে গর্বিতা মা হঠাৎ সামনে পুত্রকে দেখে বিচ্ছেদ বেদনা ভুলে আনন্দে হয়ে উঠেন উচ্ছসিত। তাড়াতাড়ি সকলের খাওয়ার ব্যবস্থা হয়ে গেল। খেতে বসতেই এমন সময় খবর এল পুলিশ দল আসছে। রাঁধা ভাত রইল পড়ে। বাসার পেছন দিক দিয়ে তারা ছয়জন ছুটে গেল নদী তীরে। কিন্তু সাম্পান যোগাড় করতে একটু দেরী হয়ে গেল। সাম্পানে উঠে তারা পাড়ি দিল নদীর অপর পারের দিকে। পুলিশ দল সহ ইনসপেক্টার আহসান উল্লাহ, সিদ্দীক দেওয়ান নদী তীরে গেল ছুটে। খবর পাওয়া গেল, সাম্পানে চড়ে ছয়জন লোক ওপারের দিকে রওয়ানা হয়েছে। পুলিশ দল পুলিশ লঞ্চে উঠে পিছু পিছু ধাওয়া করলো। চোখ ঝলসান তীব্র টর্চ লাইটের আলোকে তারা দেখলো একটা সাম্পান এগিয়ে যাচ্ছে। সাম্পানওয়ালাকে থামতে বললে মাঝি ভীত ও সন্ত্রস্ত হল। সে অস্বীকার করে বসল এগোতে। রজত রিভলভার হাতে লাফিয়ে উঠে সাম্পানের মাঝিকে হুকুম দিল অদূরে

ওপারে কালারপুলে তুলে দিতে, নচেৎ তার মৃত্যু অনিবার্য। অগত্যা মাঝি আবার সাম্পান চালালো। ওপারে পৌঁছাতেই ছয়জন লাফিয়ে তীরে উঠে পড়লো। ছুটলো তারা গ্রামের অচেনা পথে, ঘোর অন্ধকারে। পুলিশ লঞ্চের হর্ন অবিরত বেজে চলেছে। স্বদেশীর পেছনে পুলিশ ধাওয়া করছে গুজব গেল রটে। চারিদিকের হাকঁডাকে গ্রামবাসীরা জড়ো হতে লাগলো। এবং পেছন পেছন অনুসরণ করতে শুরু করলো। বন্ধুরা বুঝাতে চেষ্টা করলো তারা কে এবং তাদের উদ্দেশ্য কি? কিন্তু জনতা তাদের পেছন ছাড়লো না। অগত্যা তারা গুলি চালাতে বাধ্য হল। গুলিতে একজন আহত হলে লোকজন এবার ক্ষিপ্ত হয়ে উঠলো। তখন ছয়জন রাস্তা ছেড়ে নেমে পড়লো জমিতে। পাড়ায় ঢুকতেই অন্ধকারে দা'-এর এক কোপে দেবীপ্রসাদের হাতখানা গুরুতর জখম হয়ে পড়লো। তবুও ভ্রূক্ষেপ নেই। গ্রামের ভেতর দিয়ে তারা ছুটে চললো। ইউনিয়ন বোর্ডের চেয়ারম্যান সদলবলে পুলিশ দল ও মিলিটারীর সাথে যোগ দিল। গ্রামের কেউ কেউ অবশ্য বিপ্লবীদের রাস্তা দেখিয়ে সাহায্য করলো। কিন্তু সুবোধ চৌধুরী ও ফনী নন্দী হয়ে পড়লো চারজন থেকে বিচ্ছিন্ন। পরে তাদের মধ্যেও হল ছাড়াছাড়ি। এক মুসলমান চাষী ফনীন্দ্রকে আশ্রয় দিয়েছে সন্দেহে গ্রামের একজন লোক তার বাড়িতে চড়াও হল এবং ফনীন্দ্রকে বের করে দিতে বললো। তুমি খুঁজে নাও, এ কথা বলে চাষী চলে গেল। কিন্তু এক প্রতিবেশী সকালবেলায় ঘরের মাচার নীচে একটা লোককে শুয়ে থাকতে দেখে চেঁচিয়ে ওঠে। লোক জড়ো হয়ে গেলে ফনীন্দ্র ওখানেই পড়ল ধরা। সুবোধ চৌধুরীও আহত অবস্থায় ধৃত হল অন্যত্র। ওদিকে বাকি চারজন হেঁটে চললো পা যেদিকে টেনে নিয়ে যায়। এভাবে পৌঁছলো তারা জুলদা গ্রামে। এক মুসলমান চাষীর কাছে তারা চাইল খাবার ও আশ্রয়। কিন্তু প্রতিবেশীর ভয়ে সে তাদেরকে নিজের বাড়িতে রাখলো না। কিন্তু কাছেই এক ঘন ঝোপের ভেতর তাদের লুকিয়ে থাকতে ইশারা করলো। সে ওদেরকে পরে খাবার পৌঁছে দেবে বলেও আশ্বস্ত করলো। কিন্তু ঐ সময় পুলিশ ও মিলিটারী এসে পড়লো। শন গাছের ঝোপের পাশ দিয়ে যেতেই ঝোপের ভেতর লোক আছে বলে পুলিশের সন্দেহ হল। পুলিশ ও মিলিটারী এগিয়ে আসতেই বিপ্লবীরা গুলি চালালো পুলিশ ও মিলিটারীর ওপর। একটু পিছিয়ে গিয়ে মিলিটারীরা পাল্টা গুলি বর্ষণ শুরু করলো। বিপ্লবীদের হাতে যতক্ষণ কার্তুজ মজুদ ছিল ততক্ষণ তারা লড়াই করলো। একে একে রজত, স্বদেশ, দেবী গুলির আঘাতে নিহত হল। মনোরঞ্জন হল গুরুতর আহত। রক্তক্ষরণে সে এতো দুর্বল হয়ে পড়েছিল যে ট্রিগারে আঙুলের চাপও বসাতে পারছিল না। এমন সময় ব্রিটিশ অফিসার হুকুম

দিল আত্মসমর্পণ করতে। কথা শুনে তেলে-বেগুনে জ্বলে উঠলো সে। ব্রিটিশ অফিসার জানতো না, মাংস না পেলেও বাঘ ঘাস খায় না। মৃত্যুর দরজায় দাঁড়িয়ে গর্জে উঠল মনোরঞ্জনের কণ্ঠ—Monoranjon does not know how to surrender (মনোরঞ্জন আত্মসমর্পণ করতে জানে না); বলেই সে সর্বশক্তি দিয়ে আঙুলের শেষ চাপ বসালো ট্রিগারে, সঙ্গে সঙ্গে কয়েকটা রাইফেলও উঠল গর্জে। মনোরঞ্জন মৃত্যুর কোলে ঢলে পড়লো। কিন্তু অমর হয়ে রইলো তার মুখের শেষ কথাগুলো—Monoranjon does not know how to surrender. গণ দুশমন ব্রিটিশের কাছে উন্নত শির নত করেনি মনোরঞ্জন। ঐ যুদ্ধ ছিল যেমন বেদনাদায়ক তেমনই ছিল দেশ-প্রেমের এক প্রোজ্জ্বল দৃষ্টান্ত। ব্রিটিশ বাহিনী এখানেও জালালাবাদের দৃষ্টান্ত অনুসরণ করেছিল। তারা পেট্রোলে শহীদের দেহ সিক্ত করে, আগুনে পুড়িয়ে তাদেরকে ভস্মিভূত করেছিল। পরে এ কাহিনী যখন শুনি তখন ভয়, সন্ত্রাস ও বিপদের সামনে শহীদদের আশ্রয় ও খাবারের প্রতিশ্রুতি দেবার জন্য ঐ জুলদা গ্রামের চাষী ভাইকে মনে মনে জানিয়েছিলাম সালাম, জানিয়েছিলাম আন্তরিক অভিনন্দন ও গভীর শ্রদ্ধা।

আট

পলাতক জীবন

২৫শে এপ্রিল। রণধীর আর দ্বিজেনকে তাদের অভিভাবকদের হেফাজতে রেখে কৃষ্ণ চৌধুরীর বাড়ি কেলিশহরের দিকে ছুটলাম। তার অভিভাবকও তার ভার নিলেন। ২৬শে এপ্রিল খুব ভোরে কৃষ্ণের কাছ থেকে বিদায় নিলাম। সে রাস্তা পর্যন্ত এল আমাকে বিদায় দিতে। তার চোখ ছুটো জলে ভরা, যেন অশ্রু গড়িয়ে পড়বে। আমার মনটা যেন কেমন হয়ে গেল। 'আবার দেখা হবে'—বলে আমি বিদায় নিলাম। কিছুদুর গিয়ে পেছন ফিরে তাকিয়ে দেখি—তখনও কৃষ্ণ সেখানে দাঁড়িয়ে। আর পিছু ফিরলাম না। তার সঙ্গে সেই আমার শেষ দেখা।

চারদিকে গুজব রটেছে পুলিশ, মিলিটারি আর গোয়েন্দার দল সারা বোয়ালখালী চষে বেড়াচ্ছে। আমার নিজের থানা বোয়ালখালীতে তাই আর গেলাম না। ওখান থেকে আট-নয় মাইল দূরে মহিরা গ্রামের দিকে ছুটলাম। ঐদিককার গ্রামগুলো ছিল রাজনৈতিক দিক থেকে কিছুটা পশ্চাৎপদ। ফলে পুলিশের নজর ছিল কম। বেলা প্রায় দশটার সময় এক বন্ধুর বাড়িতে গিয়ে পৌঁছলাম। বন্ধু যতীন দাশ আমাকে দেখেই বিস্ময়ে ও আনন্দে লাফিয়ে উঠলো। বললো, বেঁচে আছ দেখে ভগবানকে ধন্যবাদ দিচ্ছি; তোমাদের আশা তো আমরা ছেড়েই দিয়েছিলাম। তার বাড়িতে দু'দিন থাকার পর আনোয়ারা থানার বটতলী নামে এক গণ্ডগ্রামে সে আমার আস্তানা ঠিক করে দিল। বিদায় নেওয়ার আগে সে আমাকে জানালো, সে অন্যত্র একটা কাজে যাচ্ছে। ফিরে না আসা পর্যন্ত আমি যেন নির্দ্বিধায় এখানে থাকি। কিন্তু দুদিন যেতে না যেতেই মনটা আমার আনচান করতে লাগলো। একটা অদম্য অস্থিরতা মনটাকে জুড়ে বসলো। এভাবে বসে থাকলে চলবে না মনে করে কুতুবদিয়ায় পূর্ব পরিচিত এক বন্ধুর বাড়িতে যাওয়া স্থির করলাম। বন্ধুটি এক সময় শহরে দলের ভারপ্রাপ্ত নেতা ছিল। ভাবলাম তার মাধ্যমে অন্যদের সাথে যোগাযোগ রাখার কিছুটা ব্যবস্থা হবে। কুতুবদিয়া যাওয়ার স্টিমারের খবরাখবর

নেওয়ার জন্য গেলাম বন্দরে। বন্দর হল পতেঙ্গার উল্টো দিকে আনোয়ারা থানায় সমুদ্র উপকূলে। অপরাহ্নে সেখানে গিয়ে পৌঁছলাম।

স্টিমারের খোঁজ খবর নিয়ে চাঁদ সওদাগরের প্রাসাদ নামে পরিচিত এক প্রাসাদের ধ্বংসস্তূপে গিয়ে বসলাম। বসে বসে ভাবছিলাম কোন সুদূর অতীতের কথা। চাঁদ সওদাগর বাণিজ্যের উদ্দেশ্যে সাগর পাড়ি দেবেন। সপ্তডিঙ্গা তার সাজানো। মণিমুক্তা খচিত পতাকা উড়ছে বাতাসে। অসূর্য-স্পশ্যা পুরনারীরা মঙ্গলপাত্র হাতে নিয়ে উলুধ্বনি দিয়ে সওদাগরকে বিদায় জানাচ্ছে। বহুকাল পর বাণিজ্য শেষে সওদাগর ফিরলেন। সোনা, রূপা, নানা মশলা আর সৌখিন জিনিসে ডিঙ্গাগুলো ভর্তি। আর আজ! সোনা-রূপা এদেশ থেকে পাচার হয়ে চলে যাচ্ছে ইংরেজ মুল্লুকে। বাণিজ্যের নামে চলেছে লুণ্ঠন, বাটপাড়ি, শোষণ, নির্যাতন। সোনারূপার বদলে দেশকে তারা দিয়েছে বেকারি, দুর্ভিক্ষ, ক্ষুধা, হাহাকার, মৃত্যু।

এই সব ভাবতে ভাবতে এক সময় খেয়াল হল সূর্য ডুবতে চলেছে। রঙিন সূর্য রশ্মিচ্ছটা সাগরের উর্মিমালাকে যেন শত শত শতদলে পরিণত করতে লাগলো। প্রকৃতি তার অপরূপ সৌন্দর্যকে যেন সাগরের বুকে উজাড় করে ঢেলে দিল। আমি উঠে দাঁড়ালাম, আস্তানায় ফিরতে হবে।

কুতুবদিয়া দ্বীপে

পরদিন খুব ভোরে উঠে বন্দরের ঘাটে এলাম। তখনকার দিনে ব্রিটিশ নেভিগেশন কোম্পানীর একটা জাহাজের সাথে এই পথে স্বদেশী বেঙ্গল নেভিগেশন কোম্পানীর জাহাজের প্রতিযোগিতা চলছিল। অধিকাংশ লোক স্বদেশী জাহাজে করে কুতুবদিয়া, মহেশখালী, কক্সবাজারে যাতায়াত করতো। ব্রিটিশ কোম্পানীর জাহাজটি থাকত প্রায় খালি। লোকচক্ষু যত এড়াতে পারি তত ভাল—এই ভেবে তাই ব্রিটিশ জাহাজেই উঠে পড়লাম। বিকেল প্রায় চারটার সময় পৌঁছলাম কুতুবদিয়ায়। থানা ও বাজার এলাকা এড়িয়ে গিয়ে খোঁজ করে করে বন্ধু রাজকুমার পালের বাড়ি গিয়ে উপস্থিত হলাম।

আমাকে দেখেই তিনি আঁতকে উঠলেন। দ্বিধাজড়িত কণ্ঠে কিছু খবরাখবরও নিলেন। রাতটা সেখানেই কাটালাম। কিন্তু পরদিনই রাজকুমার পাল আমাকে আর এক বন্ধুর বাড়িতে রেখে এলেন। এই বন্ধুটি অনেককাল আগে আমাদের দলে ছিলেন। পরে ধীরে ধীরে দলের সাথে আর তেমন কোন সম্পর্ক ছিল না। পরদিন তিনি ব্যক্তিগত এক কাজে কক্সবাজার গেলেন। যাওয়ার সময় আমাকে অনুরোধ করে গেলেন,

আমি যেন তাদের বাড়িতে নিশ্চিন্তে থাকি, কোথাও যেন না যাই, তিনি সহসাই ফিরে আসবেন।

কিন্তু আমি বোধহয় মানসিক ধৈর্য হারিয়ে ফেলেছিলাম। কাজ চাই কাজ। ইউরোপিয়ান অফিসার হত্যা করতে হবে—এ জন্যে রিভলভার চাই। রিভলভার যোগাড় করার এক অদম্য আকাঙ্ক্ষা যেন আমার সমগ্র সত্তাকে আচ্ছন্ন করে ফেললো। মনে পড়লো, জালালাবাদ যুদ্ধের সময় শান্তি নাগের মাস্কেটটা বিকল হয়ে গেলে আমি কোমর থেকে আমার ওয়েভলি রিভলভারটা তাকে দিয়েছিলাম। শান্তি নাগ ও সুরেশ দেব সে রাত্রেই পাহাড় থেকে উধাও হয়ে গিয়েছিল। সুতরাং রিভলভারটা সে হয়তো সঙ্গে করে বাড়িতেই নিয়ে গেছে। কাজেই স্থির করলাম, রিভলভারটা তার কাছ থেকে উদ্ধার করে নিয়ে আসতে হবে। কিন্তু তার বাড়ি তো কুমিল্লায়। তাকে ধরতে হলে তার কুমিল্লার ঠিকানাটা পাওয়া দরকার। মনে পড়লো, চট্টগ্রামের বক্সির হাটে রাখাল বসাকের কাছ থেকে তার ঠিকানাটা পাওয়া যেতে পারে। তাই ঠিক করলাম, শহরে গিয়ে প্রথমে ঠিকানাটা যোগাড় করে ফেলি।

তাই, পরদিনই দুপুরবেলা কুতুবদিয়া ঘাট থেকে জাহাজে উঠে বসলাম। এবার বিপদের ঝুঁকি নিয়েই দেশী কোম্পানীর জাহাজে চাপলাম। আর জাহাজে উঠতেই অবাক কাণ্ড। দ্বিগেন্দ্র দস্তিদারের সঙ্গে দেখা হয়ে গেল। সে ইশারায় আমাকে এক পাশে নিয়ে গিয়ে চুপি চুপি জানালো, রণধীরকে গ্রেপ্তার করে নিয়ে যাওয়া হচ্ছে। সে এই জাহাজেই আমাদের সঙ্গে যাচ্ছে। কিছুক্ষণ তার সঙ্গে আরও কিছু খবরাখবর আদান-প্রদান হল। তারপর অন্যেরা যাতে সন্দেহ করে না বসে সে জন্যে আবার আমরা আলাদা হয়ে গেলাম।

চট্টগ্রাম শহরে

সন্ধ্যার অন্ধকার নেমে এল। জাহাজ ধীরে ধীরে টার্নামরিসন ঘাটে এসে ভিড়লো। দেখলাম, লণ্ঠনের স্বল্প আলোতে মুখ দেখে দেখে এক একজন করে ছাড়ছে। সৌভাগ্যবশত আমিও ছাড়া পেলাম। শহরে তখন রোজ সন্ধ্যা থেকে ভোর পর্যন্ত কারফিউ জারি করা হচ্ছিল। লণ্ঠন ছাড়া চলাফেরা বে-আইনী ও নিষিদ্ধ। তাই ওখান থেকে একটা লণ্ঠন ও মোমবাতি কিনে নিয়ে সাম্পানে চড়ে চাক্তাই নৌ-বন্দরে গিয়ে নামলাম।

রাস্তা একেবারে জনমানবশূন্য। রাস্তার দু'পাশের দোকানগুলো বন্ধপ্রায়, দরজা-ভেজানো। মাঝে মাঝে দু-একটা আধখোলা দোকানে

মিট্‌ মিট্‌ করে আলো জ্বলছিল। দু-একজনকে দৌড়ে রাস্তা পার হয়ে দোকানে ঢুকে পড়তে দেখলাম। বোধহয় দোকানী হবে। চারিদিকে কেমন যেন আতঙ্ক, কী যেন এক বিভীষিকা! তারই মধ্যে আমি একা একা লণ্ঠন হাতে করে বড়ো রাস্তা দিয়ে প্রায় মিনিট বিশেক হেঁটে বক্সিরহাটে রাখাল বসাকের দোকানে এসে উঠলাম। সে এক্ষুণি বাসায় খেতে গেছে শুনে আবার দ্রুত রওয়ানা হলাম তার বাসার দিকে। কিন্তু পথেই তাকে ধরে ফেললাম। সে আমাকে দেখে বিস্ময়ে ও আনন্দে উচ্ছ্বসিত হয়ে উঠলো। তার আর খাওয়া হল না। সে আমাকে সঙ্গে নিয়ে ফিরে এল দোকানে। আমরা দোকানের দোতলায় গিয়ে বসলাম।

নানা কথার পর আমার আসার কারণ ও উদ্দেশ্যের কথা বলতেই সে শান্তি নাগের কুমিল্লার বাড়ির ঠিকানাটা আমাকে দিল। তার সঙ্গে অনেক কথাবার্তার পর জিজ্ঞেস করলাম পরের দিনটা তার ওখানে কাটানো যায় কি না? আঁতকে উঠে সে বললো, আজ রাতটা থাকতে পারি। কিন্তু কাল দাদা দেখলে আর রক্ষা থাকবে না। দিনের বেলা তার দাদার উপস্থিতিতে এখানে আমার থাকা অসম্ভব। তাড়াতাড়ি মনস্থির করে নিলাম। তার একখানা সাইকেল ছিল। বললাম, খুব ভোরে সাইকেলে করে চলে যাব এবং সকাল আটটার সময় একজন লোককে দিয়ে তার সাইকেলটা ফেরৎ পাঠাবো। সে তাতে রাজি হল।

রাত্রে ঘুম খুব একটা হল না। সারারাত গুর্খা, জাঠ আর বেলুচ সৈন্যদের বুটের আওয়াজ থেকে থেকে কানে আসতে লাগলো। ক্ষণে ক্ষণে বুটের শব্দ, হুঁশিয়ারির পর হুঁশিয়ারি, মাঝে মাঝে দরজায় বুটের লাথি—একটা ভয়াবহ আতঙ্কের মধ্যে রাত গেল কেটে। ভোর হবার সঙ্গে সঙ্গে সব নীরব হয়ে গেল। সেই সুযোগে সাইকেলটা নিয়ে রওয়ানা হবার সময় রাখাল আমার হাতে একটা হাতঘড়ি পরিয়ে দিল। বিদায় নিয়ে সাইকেলে চেপে বসলাম। নির্জন পথ। গতরাতের দুঃস্বপ্নের কোন চিহ্ন কোথাও নেই। নির্বিঘ্নে গোসাইলডাঙ্গা পৌঁছে উঠলাম মলিন ঘোষের বাড়িতে। সাইকেলটা ফেরৎ দেবার ব্যবস্থা করে আপাততঃ স্বস্তির নিশ্বাস ফেললাম। মলিনের বাড়ির পাশেই ছিল অস্ত্রাগার দখলের অভিযানে অংশগ্রহণকারী কালীকিঙ্কর দের বাড়ি। তার সঙ্গে দেখা করলাম। মনে হল, সে সরকারী রুদ্ররোষ থেকে বেঁচে গেছে। তাকে আমার পরিকল্পনার কথা জানালাম। তার কাছ থেকে কিছু খবরাখবর জানলাম। তারপর তাকে সাবধানে থাকতে বলে বিদায় নিলাম।

দুপুর বেলায় আরও দু'চার জনের সঙ্গে গোপনে যোগাযোগ করলাম। এতে পুলিশী তৎপরতার কিছু খবর পাওয়া গেল।

পরদিন খুব সকালে প্রফুল্ল মল্লিককে সঙ্গে নিয়ে পতেঙ্গা গেলাম। এর পরদিন তাকে বিদায় দিয়ে ফৌজদারহাট স্টেশনে গিয়ে সেখান থেকে কুমিল্লা যাওয়ার জন্য ট্রেনে চড়লাম।

কুমিল্লা অভিমুখে

ট্রেনে চড়তেই একই কামরায় কাট্টালির যদু দাসের সঙ্গে দেখা হয়ে গেল। আমার আসনের ঠিক উল্টো দিকে সে বসেছিল। আমাকে দেখে সে ফিস ফিস করে তার সঙ্গীটিকে কি যেন বললো। সঙ্গীটি তার পকেট থেকে বার আনা পয়সা বের করে আমাকে দিল। দেশকে ভালবাসার জন্য যে দান তা যত ক্ষুদ্রই হোক তা আমার চোখে মহান ও বিরাট। তাই হাত পেতে তা আমি সানন্দে গ্রহণ করলাম।

কুমিরা স্টেশনে যখন গাড়ি এসে থামলো তখন দেখলাম, খদ্দর পরা শতখানেক লবণ আইন অমান্যকারী কংগ্রেসী স্বেচ্ছাসেবক গাড়ির দিকে তাকিয়ে আছে। তাদের মধ্যে অনুশীলন পার্টির উত্তর ধর আমাকে দেখতে পেয়ে দৌড়ে এসে জানতে চাইলেন, আমি কোথায় যাচ্ছি, কে কে মারা গেছেন, মাস্টার দা' কোথায় ইত্যাদি। 'এসব প্রশ্নের উত্তর এখন দেওয়া যাবে না' বলতে না বলতেই ট্রেন ছেড়ে দিল।

ঐ ট্রেনেই পরিচিত একজন রেল-কর্মচারীর সঙ্গে দেখা হল। কলেজে পড়ার সময় তিনি চন্দনপুরার এক বাড়িতে গৃহশিক্ষকতা করতেন। তিনি মাঝে মাঝে আমাদের চন্দনপুরা ক্লাবে বেড়াতে যেতেন। মানসিক দিক দিয়ে তিনি ছিলেন আমাদের বিরোধী। তাকে দেখে আমার একটু ভয় হল, না জানি তিনি কি করে বসেন! আস্তে আস্তে তিনি আমার পাশে এসে বসলেন এবং ফিস্‌ফিস্‌ করে আমাকে বললেন, লাকসাম স্টেশনে জোর তল্লাশি চলে। আমি তার সঙ্গে থাকলে তল্লাশির হাত থেকে রেহাই পেতে পারবো।

আমি মনে মনে অবাক হলাম তার আন্তরিকতা দেখে। এবং সাথে সাথে তার কথায় রাজি হলাম।

সেদিন দিনের বেলাটা তাঁর কোয়ার্টারে কাটিয়ে সন্ধ্যার ট্রেনে যখন রও-য়ানা হতে যাচ্ছি, তখন আমার হাতে তিনি একখানা গীতা গুঁজে দিলেন। সংস্কারাপন্ন আমিও তা রক্ষাকবচ হিসেবে গ্রহণ করলাম। মনে পড়লো, রবীন্দ্রনাথের কবিতার চরণ 'পরকে করিলে আপন'। এই লোকটি ছিলেন আমাদের বিরোধী, কিন্তু অস্ত্রাগার দখল, জালালাবাদ যুদ্ধের বহ্নিশিখায় ভস্মীভূত হয়েছে তাঁর বিরোধিতা। দেশপ্রেমের অজেয় শক্তি এখন তার সত্তায় সমুন্নত।

ঠিকানা অনুযায়ী নেমে পড়লাম কমলাসাগর স্টেশনে। রওয়ানা হলাম ছয় মাইল দূরে কুঠি বাজারের দিকে। সেখানে যখন পৌঁছলাম তখন রাত প্রায় দশটা। কংগ্রেস স্বেচ্ছাসেবকরা দলে দলে গাঁজা, আফিং-এর দোকান পাহারা দিচ্ছে। এত রাত্রিতে শান্তির বাড়িতে যাওয়া সম্ভব নয়। সেখানে নৌকায় করে যে যেতে হয় তা আমার জানা ছিল না। ঠিক করলাম, রাতটা বাজারেই কাটিয়ে দেব। দোকানপাট প্রায় বন্ধ। বাকিগুলোও বন্ধ হয়ে যাচ্ছে দেখে একটা দোকান থেকে দু'মুঠো চিড়ে আর খান-কয়েক বাতাসা কিনে খেয়ে নিলাম। তারপর এক দোকানের সামনের চৌকিতে শুয়ে রাতটা কাটিয়ে দিলাম। খুব ভোরে ভোরে নৌকায় চড়ে রওয়ানা হলাম শান্তির বাড়ির দিকে।

ঠিকানামত তার বাড়িতে পৌঁছে তার নাম ধরে ডাকতে সেই দৌড়ে এল। কুশল জিজ্ঞাসার পর তার কাছে আমার এখানে আসার উদ্দেশ্য ব্যক্ত করলাম। সে জানালো, রিভলভারটা আছে এবং হেফাজতেই আছে। এরপর সে একে একে সব কথা খুলে বললো। ২২শে এপ্রিল মাঝরাতে পানির তেষ্টায় অতিষ্ঠ হয়ে সে আর সুরেশ দল ছেড়ে চলে আসে। পাহাড় থেকে নেমে হাঁটতে হাঁটতে তারা একটা বড় রাস্তায় এসে পড়ে। তারপর বড় রাস্তা পার হয়ে এক মুসলিম পাড়ায় পৌঁছুলে তারা এক মুসলমান চাষীর বাড়িতে আশ্রয় নেয়। বিদায় মুহূর্তে রিভলভারটা তারা ঐ চাষীর হেফাজতে রেখে আসে। ঠিক হয়, নির্দিষ্ট একটা দিনে লালদীঘির পাড়ে চারশো টাকার বিনিময়ে রিভলভারটা ফেরত নেওয়া হবে। তারপর ঐ চাষীর বাড়ি থেকে বের হয়ে তারা দক্ষিণ পাশের রাস্তার ধারে এক ঝোপঝাড় ঘেরা পুকুরের দক্ষিণ পাড়ে অল্পক্ষণ শুয়ে ছিল। সেখানেই পুরানো এস. এন. এস পিস্তলটা ফসকে পুকুর পাড়ে পড়ে যায়। তারপর তারা বড় রাস্তায় ফিরে এসে সোজাসুজি উত্তর দিকে চলতে থাকে। মাইল খানেক পথ অতিক্রম করার পর রাস্তার পাশে একটা হাট পড়ে। সেখান থেকে পায়ে হেঁটে প্রায় ১২০ মাইল পথ পেরিয়ে তারা কুমিল্লায় এসে পৌঁছায়। কান পেতে সব শুনলাম। তারপর বললাম আমি ভাড়া দেব। আমার সঙ্গে গিয়ে রিভলভারটা উদ্ধার করতে হবে। সে রাজি হল।

দিন দুই তার বাড়িতে কাটানোর পর চট্টগ্রামে যাওয়ার কথা পাড়লাম। কিন্তু আগে রাজি হলেও এবার সে ঘোরতর অনিচ্ছা প্রকাশ করে বসলো। 'মা ছাড়বে না', 'মা কাঁদবে' ইত্যাদি নানা অজুহাত দেখালো। বললাম, সেদিন তো মায়ের অজুহাতের প্রশ্ন ছিল না। মায়ের কান্না তো তোমার পথ থেকে, সংকল্প থেকে একচুলও নড়াতে পারতো না। আর আজ! সে চুপ করে রইলো। মনে মনে ভাবলাম, জালালাবাদের যুদ্ধ,

গুলি, মৃত্যু-বিভীষিকা তার মনে এনে দিয়েছে আতঙ্ক। দুঃসাহসী প্রেরণা, উদ্দীপনার বদলে তার মনে এখন শান্ত গৃহকোণ, তথাকথিত আরাম-আয়াশ ও স্বাচ্ছন্দের হাতছানি।

তাকে অনুরোধ করেও কোন ফল হবে না বুঝে বললাম, তবে সুরেশের ঠিকানাটা দাও। আমি ঢাকায় গিয়ে সুরেশকে সঙ্গে নিয়ে রিভলভারটা উদ্ধারের ব্যবস্থা করি। সে সুরেশের ঠিকানাটা দিয়ে বোধ হয় স্বস্তি পেল।

ঢাকা অভিমুখে

অচেনা পথ। পথও ঠিক নয়। জমি, খাল, বিল পেরিয়ে বেশ কষ্টেই পা ফেলে ফেলে হাঁটতে হচ্ছে। কোন কোন জায়গায় এক হাঁটু কাদা ভেঙ্গে নিজেকে বহু কষ্টে টেনে হিঁচড়ে নিতে হল। তবু মনের দিক থেকে আমি যেন বেপরোয়া। তরুণ দেহ, সজীব মন, উদগ্র আকাঙ্ক্ষা ও দৃঢ় সঙ্কল্প আমাকে ঠেলে নিয়ে চললো সামনের দিকে।

অবশেষে বার মাইল হেঁটে গ্রীষ্মের ঐ দুপুরে গঙ্গারামপুর হাটে গিয়ে পৌঁছলাম। সেখানে এক কালীবাড়ির বারান্দায় কিছুক্ষণ শুয়ে কাটালাম। তারপর খবর নিয়ে জানতে পারলাম, ঢাকায় যাওয়ার গয়না নৌকো ছাড়বে ঠিক সন্ধ্যায়। যথাসময়ে হোটেলে খেয়েদেয়ে নিয়ে গয়নায় চড়ে বসলাম।

মন্থর গতিতে গয়না নৌকো এগিয়ে চলছিল। হঠাৎ এক পৌঢ় ভদ্রলোক বেশ কড়া মেজাজ নিয়ে আমার সঙ্গে কথা বলতে শুরু করলেন। মনে মনে একটু ঘাবড়ে গেলাম; ভদ্রলোকের ঐ রকম অদ্ভুত আচরণের কারণ কি? বাইরে তা প্রকাশ না করে আমি শান্ত স্বাভাবিকভাবে তার কথার জবাব দিতে লাগলাম। কিছুটা ধর্মীয় সুরও ছিল তাতে। আমার কথায় ভদ্রলোক একটু নরম হলেন। চড়াসুর আস্তে আস্তে মোলায়েম হয়ে এল। তিনি বললেন, তিনি আমাকে ভবঘুরে ধরনের মনে করেছিলেন। আমার গন্তব্যস্থল কোথায় তা জানতে চাইলে আমি জানালাম, নারায়ণগঞ্জ, সোনার গাঁ। 'সোনার গাঁ-র কোন গ্রামে?' —তিনি জিজ্ঞেস করলেন। জবাবে বললাম, 'সোনার গাঁই তো গ্রাম'। পরে সোনার গাঁ যে গ্রাম নয় তা বুঝতে পারলাম। কিছুটা বিমূঢ় হয়ে গেলাম। ভদ্রলোক আমাকে বললেন, 'আপনি বৈদ্য বাজার নেমে পড়ুন। সেখান থেকে খোঁজখবর নেবেন।'

বৈদ্যবাজার ঘাটে পৌঁছলাম ভোর বেলায়। থানার সামনে দিয়ে রাস্তা দিয়ে চলেছি। মন খুব খারাপ। ভাষায় বোঝানো যায় না। ভাবছি, শেষে কি ব্যর্থতার গ্লানি বহন করে চলতে হবে?

মনে মনে ভাবছি, আর পা ফেলছি। হঠাৎ মনে পড়লো, দেবপাহাড়ে যে মাতাজী আছেন তাঁর বাড়ি হল ঢাকায়। শিব চতুর্দশী উপলক্ষে তাঁর ওখানে বিরাট মেলা বসে শুনেছি। ঠিকানা খুঁজে নিয়ে তাঁর দেবালয়ে বা শিবালয়ে যাওয়া যায় কি না ভাবতে লাগলাম। এমন সময় এক পথিককে জিজ্ঞেস করতেই তিনি বললেন, ঐ তো খানিক দূরে, ঐ সোনামুই গ্রামেই তাঁর বাড়ি। আমি ঐ পথেই পা বাড়ালাম। একটু এগিয়ে আর একজনকে জিজ্ঞেস করতেই সে আঙুলের ইশারায় গন্তব্যস্থলটা দেখিয়ে দিল।

বাড়িটার সামনে পুকুরে যখন হাত-মুখ ধুচ্ছিলাম তখন এক ব্রাহ্মণ পুরোহিত ফুলের সাজি হাতে ফুল তুলতে তুলতে আমার কাছে জানতে চাইলেন, আমি কে; কোত্থেকে আসছি? যখন তিনি শুনলেন যে আমি চট্টগ্রাম থেকে আসছি তখন তার চোখেমুখে একটা ভাবান্তর দেখা গেল। তিনি চট করে আমাকে জিজ্ঞেস করলেন, 'আচ্ছা, তুমি কি সুরেশের খোঁজে এসেছ'। আমি লুকোচুরি না করে সরাসরি 'হাঁ' বলে উত্তর দিলাম। তিনি আমার কাছে এসে বসলেন। সুরেশ কীভাবে আহত অবস্থায় তার আশ্রয়ে এসে উঠেছিল সে-সব তিনি খুলে বললেন। তারপর বললেন, সুরেশের বাড়ি পাশের গ্রামেই, আদমপুরে।

আমি যেন হাতে স্বর্গ পেয়ে গেলাম। অবাক বিস্ময়ে ও আনন্দে সমগ্র সত্তা আপ্লুত হয়ে উঠলো। এ রকম অদ্ভুত যোগাযোগ আশ্চর্যের বৈ কি। ভগবানে বিশ্বাস ছিল। তাই তাঁর মহিমা স্মরণ করে তাঁকে ধন্যবাদ দিলাম।

তারপর পুরোহিত বললেন, তাঁর নিজের বাড়িও চট্টগ্রামে। অনেক বছর ধরে তিনি এখানেই আছেন। স্বতঃপ্রবৃত্ত হয়ে তিনি আরও বললেন, 'তুই আজ আমার এখানেই থাক। কাল তোকে সুরেশের কাছে নিয়ে যাব। আর তুই আমার দেশের ছেলে। আমাকে মামা বলে ডাকিস্। এখানে ভয়ের কিছু নেই। নিশ্চিন্তে নির্বিঘ্নে আমার কাছে তুই থাকতে পারিস।' ভাবলাম, ইংরেজদের অস্ত্রাগার দখল, জালালাবাদ যুদ্ধ সত্যিসত্যিই মানুষের মনকে একেবারে বদলে দিয়েছে, উদ্বুদ্ধ করেছে দেশপ্রেমে। দেশের জন্য কিছু একটা করার স্বতঃস্ফূর্ত ইচ্ছা সবার মন থেকে ভয়, আতঙ্ক ও ত্রাসকে ক্রমেই মুছে দিচ্ছে।

পাশের গ্রামটার নাম পানাম। গ্রামটা দেখে মনে হল, এ যেন মধ্যযুগের এক ছোট ব্যবসা শহর বা গিল্ড টাউন। লোহার গেট দিয়ে ভেতরে ঢুকতে হয়। অন্য প্রান্তে আর একটা গেট দিয়ে বেরুতে হয়। সোজা রাস্তা চলে গিয়েছে গ্রামের ভেতর দিয়ে। রাস্তার দুধারে দোতলা, তিন তলা দালানের সারি। গ্রামের বেশির ভাগ লোক ব্যবসায়ী। বিভিন্ন জায়গায় বা জেলায়

তারা সোনা রূপা ইত্যাদির ব্যবসা করেন। সে দিন পুরোহিত মামা তার সন্ত পাতানো ভাগনেকে নিয়ে পানাম গ্রামে চললেন। দু'একটা বাড়িতে যাওয়া হল। সকলেই গলবস্ত্র হয়ে পুরোহিত ও তার ভাগ্নেকে সম্মান ও শ্রদ্ধা জানালো।

পরদিন বেলা তিনটের সময় পুরোহিত মামার সঙ্গে সুরেশের বাড়িতে গেলাম। সুরেশ আমাকে দেখে অবাক। যাহোক, দেখলাম সে পুরোপুরি সুস্থ হয়ে উঠেছে। গুলির দাগটাও অস্পট হয়ে যাচ্ছে দেখা গেল। অন্যান্য কথাবার্তার পর আমার আগমনের উদ্দেশ্য এবং রিভলভার উদ্ধারের জন্য তাকে চট্টগ্রাম নিতে এসেছি জানালে সে বিনম্রভাবে চট্টগ্রাম যেতে অস্বীকার করে বসলো। ভাবলাম, কালের গতি কী কুটিল। এবং মানব চরিত্র কী বিপরীত। যে সুরেশ দ্বিরুক্তি না করে কাজে এগিয়ে যেত, সেই সুরেশ চট্টগ্রাম যেতে অস্বীকার করে বসলো! হায়রে জালালাবাদ! সে কারো বুকে এনেছে অতুলনীয় সাহস, অসীম বীরত্ব, উজ্জ্বল দেশপ্রেম, কণ্ঠ চিরে রক্ত দেবার হিম্মত। আবার কারো বুকে এনেছে আতঙ্ক, ভয় ও ত্রাস। মরচে ধরা জীবন নিয়ে কোন রকমে বেঁচে থাকা।

থাক্, কী আর করা? পাহাড় থেকে বেরিয়ে তারা কোন রাস্তা ধরে কি ভাবে ফিরেছিল তার একটি বিশদ বিবরণ তার কাছ থেকে বুঝে নিতে চাইলাম। কিন্তু সে-রকম কোন নক্সাও সে দিতে পারলো না। ব্যর্থ মনোরথ হয়ে তাকে শুভেচ্ছা জানিয়ে শেষ পর্যন্ত মামার সঙ্গে ফিরে এলাম।

মামাকে সব কথা খুলে বললাম। এমন কি রিভলভার উদ্ধারের প্ল্যানটাও বাদ দিলাম না। তাকে বললাম, আমার পরিকল্পনা হল, চট্টগ্রামে ফিরে গিয়ে ফতেয়াবাদের চৌধুরীহাটের কোন এক জায়গায় কয়েকদিন থেকে অনুসন্ধান কাজটা চালানো। যতদূর অনুমান করা যায় জায়গাটা চৌধুরীহাট থেকে মাইল খানেক দক্ষিণে হবে। ঐ জায়গাটার একটা বিশেষত্ব হচ্ছে পাহাড়ি রাস্তা এসে মিলেছে বড় রাস্তার সাথে তারপর তা পূবদিক বরাবর চলে গেছে জমির ভেতর দিয়ে। ঐ রাস্তা ধরে কিছুটা গেলে একটা মুসলমান পাড়া পড়ে। ঐ পাড়ায় ঢুকতেই সামনে পড়ে ঝোপ-ঝাড়ওয়ালা একটা পুকুর। বাইরে থেকে পুকুরের কোন অস্তিত্ব আছে বলে বোঝা যায় না। তবে ভালো করে দেখলে তা ধরা পড়ে। ওখানেই এক মুসলমান চাষীর বাড়িতে রিভলভারটা রাখা হয়েছে। প্রথমত আমি খোঁজ নিয়ে বাড়িটা কোথায় তা জেনে আসবো। রাতে কিছু টাকা পয়সা নিয়ে আমিই নিজেকে শান্তি ও অন্য কাউকে সুরেশ পরিচয় দিয়ে রিভলভারটি ফেরৎ নেব।

পুরোহিত মামা আমার পরিকল্পনায় আপত্তি করলেন না। শুধু তাই নয় আমার কাজের সুবিধার জন্য ফতেয়াবাদের কাছে নীলকণ্ঠ কবিরাজ নামে

একজনের ঠিকানা দিয়ে বললেন, আমি যেন সেখানে যাই। তারপর তাকে যেন এই সংবাদ দিই যে তাঁর গুরুদেব বৈশাখ মাসে আসতে পারলেন না, আগামি আশ্বিন মাসে তিনি অবশ্যই আসবেন। আর আমার থাকার কোন অসুবিধা হলে আমি যেন ওখানেই থাকি। ওরা অবশ্যই আমাকে থাকতে দেবেন। তিনি বারবার অনুরোধ করলেন রিভলভার উদ্ধারের পর যেন আবার তাঁর এখানে আসি। এবং যদ্দিন খুশি ততদিন যেন এখানেই থাকি। নিরাপদে থাকতে পারবো।

আবার চট্টগ্রামে

খেয়ে দেয়ে রাত দশটায় পুরোহিত মামাকে সাথে নিয়ে বৈদ্যবাজার ঘাটে উপস্থিত হলাম। ঘাটে স্টিমার ভিড়লে মামার কাছ থেকে বিদায় নিয়ে উঠে পড়লাম স্টিমারে। সকাল নয়টায় নেমে পড়লাম আশুগঞ্জে। সারা-দিন ঐ আশুগঞ্জে কাটিয়ে রাত আটটায় চট্টগ্রাম অভিমুখী একটা ট্রেনে উঠে পড়লাম। ভোরে ধুম স্টেশন ছাড়িয়ে আসতেই ট্রেনের কামরায় দেখলাম কংগ্রেস নেতা মহিম দাশ ও তাঁর সাথী কয়েকজনকে ফিস্ ফিস্ করে আলাপ করতে। তাঁদের কথাবার্তা শুনে আঁচ করলাম যে, কালার পুলে এক বিরাট সংঘর্ষ হয়ে গেছে এবং কয়েকজন মারাও গেছে। বুকটা টন্‌টন্ করে উঠলো। উদ্দাম আবেগে যেন বুকটা ফেটে যাবে। হয়ত দু'চোখ দিয়ে দুফোঁটা অশ্রুও গড়িয়ে পড়েছিল।

সকাল প্রায় আটটায় ভাটিয়ারি স্টেশনে নেমে এক পরিচিত লোকের বাড়িতে আতিথ্য গ্রহণ করলাম। ওখানে খেয়ে দেয়ে বেলা দুটোর সময় গ্রাণ্ড ট্রাঙ্ক রোড ধরে যাত্রা করলাম ডবলমুরিং-এর দিকে।

রাত প্রায় আটটায় মলিন ঘোষের বাড়ী উঠতেই জানতে পারলাম যে, সে গ্রেপ্তার হয়েছে। কালী কিঙ্করের কাছে গেলাম, তাকে আমার প্লানটা বলতেই সে প্লানটা অবাস্তব বলে উড়িয়ে দিল। প্রফুল্ল মল্লিককে ডেকে তাকে প্ল্যানটা বললে সে খুব উৎসাহিত হল এবং কাজে সফল হতে পারি বলে তার দৃঢ় অভিমতও জানাল। পরিকল্পনানুযায়ী প্রফুল্লকে বললাম, আমি পরদিনই কাট্টলির শান্তি চক্রবর্তীর বাড়ী গিয়ে উঠে তার জন্য অপেক্ষা করে থাকবো। দ্বিতীয় দিন যেন সে কিছু টাকা পয়সা সঙ্গে নিয়ে সেখানে যায় এবং পয়সার সংখ্যাই যেন বেশি হয়। পরদিনই আমি কাট্টলী শান্তির বাড়ি গিয়ে জানলাম যে লবণ আইন ভঙ্গ করার উদ্দেশ্যে শান্তি কক্সবাজার না অন্য কোথায় গেছে। তখন আমি ওখানকার এক পরিচিত বন্ধু প্রফুল্ল দাশের বাড়িতে উঠলাম এবং শান্তির বাড়িতে জানিয়ে রাখলাম প্রফুল্ল

মল্লিক এলে যেন আমার সঙ্গে প্রফুল্ল দাশের বাড়িতে যোগাযোগ করে। এখানে দুদিন অপেক্ষা করার পর প্রফুল্ল মল্লিক টাকা পয়সা নিয়ে হাজির। পরদিন ভোরবেলায় দু' প্রফুল্লকে সঙ্গে নিয়ে রেল লাইন ধরে হেঁটে চৌধুরী হাটে গিয়ে পৌঁছলাম। নীলকণ্ঠ কবিরাজের বাড়ি গিয়ে পুরোহিত মামার খবর বলার পর ওরা আমার ও প্রফুল্ল মল্লিকের থাকার ব্যবস্থা করে দিল। প্রফুল্ল দাশ চলে গেল কাছাকাছি তার এক বোনের বাড়িতে। রেঁধে বেড়ে খয়ে বেলা প্রায় একটার সময় আমরা তিনজনই বেড়িয়ে পড়লাম রিভলভার উদ্ধারের অনিশ্চিত সম্ভাবনা নিয়ে।

চৌধুরী হাট হয়ে সোজা রাস্তায় প্রায় এক মাইলেরও বেশি পথ অতিক্রম করলাম। কিন্তু শান্তির কথার সাথে বাস্তবের কোন মিল না দেখে মনটা খারাপ হয়ে গেল। ফিরে যাব না এগুবো? ভাবতে ভাবতে এগোচ্ছি। আরো প্রায় আধ মাইল পথ অতিক্রম করার পর হঠাৎ চোখে পড়লো পাহাড় থেকে নেমে আসা জলস্রোত সৃষ্ট একটি রাস্তার মত বালুকাময় খাদ; এর সোজাসুজি বড় রাস্তার বিপরীত দিকেও ঐ ধরনের জলস্রোত সৃষ্ট বালুকাময় খাদ সোজাসুজি পুবদিকে চলে গেছে। যা থাকে কপালে একবার ঢু মেরে দেখি—এই ভেবে ঐ রাস্তায় নেমে পড়লাম। দুই প্রফুল্ল মন্থর গতিতে পেছন পেছন আসছিলো; তারা বেশ পিছিয়েই পড়লো। প্রায় পোয়া মাইল যাওয়ার পর হুবহু না মিললেও পুকুরটা চোখে পড়লো। একটা লোক পুকুরটার পশ্চিম পাশে এক সমতল খালি জায়গায় বসে বেতের কাজ করছিল। তাকে এড়িয়ে গিয়ে ঢুকে পড়লাম এক বাড়িতে। ডাকলাম,—'ওবা ক্য বাড়ি আছুন' (আজ্ঞে কেউ বাড়ি আছেন)? ঘরের ভেতর থেকে আওয়াজ এলো,—'কন (কে)'? 'আঁই একজন পথোয়া' (আমি একজন পথিক)। আমি উত্তর দিলাম। সে জিজ্ঞেস করলো, 'কি চাওয়্যে তুঁই' (তুমি কি চাও)? আমি জবাব দিলাম, "বড় বেশি পানির তিষ্টা পাইয়ে। পানি খাইতাম চাই" (খুব বেশি তেষ্টা পেয়েছে, পানি খেতে চাই)।—'আইও' (এস)। এই বলে ঘরে দাওয়ায় আমাকে বসতে দিল। সে পানি এনে দিল। পানি খেয়ে তার সাথে কথা জুড়ে দিলাম। তাকে জানালাম "খুব বেশি দুঃখের কথা যে, দু'মাস আগে আমার এক ভাই কোথায় চলে গেছে তার খোঁজ করছি খুঁজে পাচ্ছি না; মা, বাবা সকলেই কান্নাকাটি করছে, কি যে করব বুঝতে পারছি না, শুনেছিলাম সে এদিকে এসেছিল, কিন্তু এখনও তার কোন খবরবার্তা পাচ্ছি না।" আমার কথাগুলো সে বিশ্বাস করলো। সে জানালো, 'বাবু, দু'মাস আগে দু'জন লোক ঐ ওদের বাড়িতে এসেছিল, একটা রিভলভার দিয়ে গেছে, ওর মা জাল দিয়ে মাছ ধরার সময় আর একটা রিভলভার জালে পড়েছিল, ওটা দারোগা

এসে নিয়ে গেছে।' কথাগুলো শুনে গেলাম, কিন্তু সন্দেহজনক কোন উৎসুক্য দেখালাম না। হা-হুতাশ করতে করতে উঠে পড়লাম। রাত্রে ঐ বাড়িতে আসবো বলে স্থির করলাম।

ফিরে যেতে যে লোকটা বেতের কাজ করছিল সে আমাকে 'বাবু' বলে কাছে ডাকলো। লোকটা বললো, "তুঁই ইক্কিনী গোরা হয়গিয়, তেঁই আগের মতনই আছন, তেঁইর ঘা হুয়ায়েনি?" (তুমি একটু ফরসা হয়ে গেছ, তিনি আগের মতই আছেন, তার ঘা শুকিয়েছে কিনা?) "হুয়াই গিয়ে," (শুকিয়ে গেছে) আমি বললাম। "আঁই তোঁয়ার লাই লালডির পাড়ত গেইলাম, কিন্তু, তোঁয়ারে ন পাই আবার ফিরি আইয়ন পইজ্জে।" (আমি তোমার জন্য লালদিঘীর পাড়ে গিয়েছিলাম, কিন্তু, তোমাকে না পাওয়ার জন্য ফিরে আসতে হয়েছে।) আমি বললাম, "হিবা ঠিক আছোনি?" (সেটা ঠিক আছে তো?) সে বল্ল, "আছে, মাডির তলে গাতায়া রাখ্খি।" (আছে, মাটির তলে পুঁতে রেখেছি)। এই বলে সে উঠে পড়ল এবং আমাদের তিনজনকেই নিয়ে চললো বাড়ীর ভেতরে। কয়েক মিনিটের মধ্যে রিভলভারটি তুলে দিল আমার হাতে। তক্ষুণি রিভলভারটি পরীক্ষা করলাম। দেখলাম পাঁচটা চেম্বার তাজা কার্তুজে ভরা। শুধু একটি চেম্বার খালি। মনে মনে বললাম, এই, এই যথেষ্ট। একটা বুলেটেই দফা-রফা হয়ে যায়, আর পাঁচটা! আমার পকেটে টাকা-পয়সা যা ছিল তা লোকটার হাতে ফেলে দিলাম। আবেগ রোধ করতে পারছিলাম না। সার্ট থেকে রোল্ড গোল্ডের বোতামগুলোও খুলে দিলাম, হাত ঘড়িটা পর্যন্ত তার হাতে তুলে দিলাম, যেন তাকে আমার অদেয় কিছুই ছিল না। মনে হলো আরও কিছু থাকলে তাও দিয়ে দিতাম। সে কিন্তু আমার কাছে কিছুই চায়নি। আবেগ, বিস্ময়ে, আনন্দে ডুবে গেছি, তাকে জড়িয়ে ধরে বিদায় নিলাম।

মুগ্ধ হয়েছিলাম ঐ নাম না জানা চাষীর সততায়। রিভলভার নিয়ে ফেরার পথে আমি রেখে এসেছি অন্তরভরা শুভেচ্ছা। মনে মনে তাকে জানিয়েছি অভিনন্দন ও সালাম।

আবার নীলকণ্ঠ কবিরাজের বাড়ি গিয়ে রাতটা কাটিয়ে দিলাম। খুব ভোরে প্রফুল্লকে সঙ্গে নিয়ে উঠলাম পতেঙ্গায় তার এক আত্মীয় বাড়িতে। ওখান থেকে পতেঙ্গার বিপরীত দিকে বন্দরে নামব আমি স্থির করেছি। সঙ্গে রিভলবারটা নিলাম না। প্রফুল্লকে বল্লাম যে নারিকেল তেল ও কেরোসিন তেল মিশে খুব ভাল করে যেন রিভলবারটা পরিষ্কার করে রাখে। নির্দিষ্ট দিনে লোক পাঠালে তাকে যেন দিয়ে দেয়। কাকে পাঠাবো তার সাংকেতিক নাম ও চিহ্নাদি সব কিছু তাকে বলে দিলাম।

প্রফুল্লের কাছ থেকে বিদায় নিয়ে এসে নামলাম বন্দরে। বন্দর থেকে গিয়ে উঠলাম পরৈকোড়া গ্রামে। ঐ গ্রামের এক বাড়িতে রাত্রে বিপদ এসে পড়লো। শুয়ে আছি, হঠাৎ মাঝরাতে সে বাড়ির ছেলেটাকে তার কাকা ডাকতে শুরু করলো এবং দরজায় ধাক্কা মারতে থাকলো। দরজা খোলার পর ঘরে ঢুকেই তিনি আমার মশারী তুলে আমার নামধাম জিজ্ঞেস করলেন। আমার নাম যোগেশ বলতেই তিনি কাল-বিলম্ব না করেই দ্রুত চলে গেলেন। বন্ধুটির মা তাঁর ছেলেকে জাগালো যে লোকটা দফাদার, চৌকিদার আনতে গেছে। শীঘ্রই যেন আমি বেরিয়ে যাই। এক মুহূর্তও যেন দেরি না করি। আমি চলে যেতে না যেতেই চৌকিদার, দফাদার ও অন্যান্য লোকজন সহ তার কাকা এসে হাজির। জিজ্ঞেস করল বন্ধুটিকে যে আমি কোথায়? বন্ধুটি বললো যে, জাগিয়ে দিয়ে আপনি ভালই করেছেন, এখন শহরে যাওয়ার তিথি, তিনি শহরে চলে গেছেন।

ওখান থেকে বের হয়ে আমি দাদার সাথে দেখা করার জন্য স্বগ্রাম সারোয়ারতলী রওয়ানা দিলাম। পথে পটিয়ার কাছাকাছি মঠপাড়া গ্রামের জালালাবাদে আহত বিনোদ দত্তের বাড়ি উঠে তাঁর খোঁজ-খবর নিলাম। তাঁর বাপ-মা তাঁর কোন খোঁজ দিতে পারলেন না। তারপর হেঁটে হেঁটে প্রায় আট মাইল দুরবর্তী স্বগ্রাম সরোয়ারতলীর কাছাকাছি এসে পড়লাম। তখনও কিন্তু সূর্য ডোবেনি। সন্ধ্যার অপেক্ষায় বসে রইলাম এক দীঘির পাড়ে। সন্ধ্যার পর বাড়ির দিকে পা বাড়াচ্ছি আর মনে মনে ভাবছি—অর্ধেন্দু দত্তের বাড়ি গিয়ে মাস্টার দা'দের একবার খোঁজ নিলে কেমন হয়? সঙ্গে সঙ্গেই মনস্থির করে চললাম অর্ধেন্দু দত্তের বাড়ির দিকে। অর্ধেন্দু দত্তের বাড়ি যেতেই তার বাবা বলে উঠলেন যে, 'তোমাকে সূর্য সেনরা সবাই খুঁজে বেড়াচ্ছে, অথচ তোমার কোন খবরই নেই। এদ্দিন কোথায় ছিলে?' ঐ সব প্রশ্নের কোন জবাব না দিয়ে বিস্ময়ে ও আনন্দে জিজ্ঞেস করে উঠলাম—'মাস্টার দা কোথায়?' দু'দিন পরই মাস্টার দা'র সাথে সাক্ষাতের ব্যবস্থা হল।

মাস্টার দা'র সঙ্গে সাক্ষাৎ

বর্ষণমুখর শ্রাবণের রাত্রি, অবিরত ঝরঝর বৃষ্টি ঝরছে।ক র্ণফুলী পার হলাম। রাস্তাঘাটে এক হাঁটু কাদা, এই কাদা ভেঙ্গে পথ প্রদর্শকের সাথে চলেছি। প্রায় রাত নয়টায় সময় নেওয়া হল এক বাড়ির ছাদের ওপর। ঘরটি আলোহীন, ঘুটঘুটে অন্ধকারে কিছুই দেখা যাচ্ছিল না। পাটিতে বসতেই মাস্টার দা' জড়িয়ে ধরলেন আমাকে। হঠাৎ আর একজনের হাতের স্পর্শ

আমার পিঠের ওপর অনুভব করলাম। 'কে এ' চুপে চুপে জিজ্ঞেস করতেই শুনলাম "তোমার অম্বিকা দা"। আঁতকে উঠলাম। শেষ পর্যন্ত আমার ধারণা ছিল অম্বিকা দা জালালাবাদের যুদ্ধে শহীদ হয়েছেন, কিন্তু এ কি? বিস্ময়ে স্তম্ভিত হলাম—অদ্ভুত ঘটনা। আনন্দের আতিশয্যে অম্বিকা দা'কে জড়িয়ে বল্লাম, "মরে আবার বেঁচে উঠেছেন।" মাস্টার দা'কে আগাগোড়া ইতিহাস বল্লাম। অন্ধকারে তাঁর মুখ দেখা গেল না সত্যি, কিন্তু তিনি যে খুশি হয়েছেন তাতে সন্দেহের লেশমাত্র নেই। "তাড়াতাড়ি রিভলবারটা আনিয়ে নে, আর এই রিভলবারটা সঙ্গে রাখ" মাস্টার দা' বললেন। রিভলবারটি সাদরে তুলে নিয়ে কোমরে গুঁজলাম। মাস্টার দা' আমাকে চলাফেরা সম্পর্কে কোন শর্ত বা শৃঙ্খলা আরোপ করলেন না। অবশেষে মাস্টার দা' ও অম্বিকা দা'র কাছ থেকে সাময়িক বিদায় নিয়ে অন্ধকারে বেরিয়ে গেলাম।

লোক পাঠিয়ে শহর থেকে রিভলবারটা নিয়ে আসা হল; মাস্টার দা'র হেফাজতে তা রাখা হল। আমার রেওয়াজ হয়ে দাঁড়িয়েছিল যে, কয়েকদিন মাস্টার দা'র সাথে কাটিয়ে দিয়ে আমি আমার নিজস্ব জায়গায় চলে যেতাম। আসা-যাওয়া এভাবে আমার চলতে থাকলো। এই আঁকা-বাঁকা, কাঁকর ছড়ানো পথে কেটে যাচ্ছিল পলাতক জীবনের দিনগুলো। বহুকাল একলা কাটানোর জন্য এবং রিভলভার খুঁজে আনার জন্য নিজস্ব আরামে থাকার স্বাধীনতা পেয়েছিলাম। সাথে সাথে এদিক-ওদিক ঘুরে ফিরে অন্যান্য পলাতকদের সাথে দিনগুলি কাটিয়ে দিতাম।

আমার এই পলাতক জীবনের মাঝখানে যে সব বন্ধু যোগাযোগ ছাড়া বিচ্ছিন্ন এক পলাতক জীবন কাটিয়ে যাচ্ছিল তাঁদের খুঁজে বের করবার জন্য চেষ্টার অবধি রাখিনি। একদিন সরোয়াতলী থাকাকালীন শুনলাম যে, বিনোদ দত্ত গাছ বাড়িয়ার সাধনপুর গ্রামে এক কবিরাজের বাড়িতে আশ্রয় নিয়েছে। মাস্টার দা' বল্লেন যে, 'এ হলো প্রায় দু'মাস আগেকার খবর, এখন কি সে সেখানে আছে?" "চেষ্টা করে দেখতে পারি, ক্ষতি কি"—আমি বল্লাম। বিনোদকে খুঁজে আনার বিষয়টা মাস্টার দা' যখন অনুমোদন করলেন তখন এই অনিশ্চিত খবরের উপর নির্ভর করে এক ভোর রাত্রে শ্রীপুর রওয়ানা হলাম। ভোরে ভোরে পটিয়া থানা অতিক্রম করে প্রায় আটটার সময় গাছবাড়িয়ার সাধনপুর গ্রামে গিয়ে পৌঁছলাম। অনুসন্ধান করে কবিরাজের বাড়ি গেলাম। প্রথমে তাঁর ছেলেকে বললাম, চিকিৎসার উদ্দেশ্যে এসেছি। কিছুক্ষণ আলাপের পর ছেলেটা অনুশীলন পার্টির সংস্পর্শে আছে বলে মনে হলো। তাকে বিশ্বাস করা যায় ভেবে কথা প্রসঙ্গে আমার আগমনের উদ্দেশ্য ব্যক্ত করতেই সে কিছুক্ষণ অবাক

হয়ে আমার দিকে চেয়ে রইলো। মনে হলো বিশ্বাস ও অবিশ্বাসের দোলায় সে দুলছে। কোমর থেকে রিভলবারটা বের করার সাথে সাথে অবিশ্বাস গেল উড়ে। সে বলতে লাগলো, বিনোদ প্রায় মাসেক আগ পর্যন্ত তাদের বাড়িতে ছিল, কিন্তু এখন কোথায় আছে সে তা জানেনা। তার বাবা ব্যবসা থেকে ফিরলে তা জানা যেতে পারে। আমি কবিরাজ মশাইয়ের জন্য অপেক্ষায় থাকলাম, দুপুর গড়িয়ে অপরাহ্ণ হলো তবুও কবিরাজের দেখা নেই। রাত প্রায় আটটার সময় তিনি বাড়ি ফিরে এলেন। তার সঙ্গে দেখা হলে তিনি, বিনোদের খবর জানেন না বলতেই আমি একেবারে নিরাশ হয়ে পড়লাম।

এমন সময় ছেলেটা বললো যে, সুনীলের কাছে জানা যেতে পারে। তাড়াতাড়ি তাকে নিয়ে গেলাম সুনীলের কাছে। সুনীল ছিল আমার পুর্ব পরিচিত। তার কাছ থেকে শুনলাম যে বিনোদ সেখান থেকে চার-পাঁচ মাইল দূরে বৈলতলী গ্রামে নিরাপদ আশ্রয়ে আছে। পরদিন সকালে সুনীলের সাথে বৈলতলী রওয়ানা হলাম। সকাল আটটার সময় ঐ গ্রামের এক স্বচ্ছল কৃষকের বাড়িতে বিনোদের সাথে দেখা হলো। কিছুক্ষণ আলাপের পর দু'জনে খেয়েদেয়ে রওয়ানা হলাম। বহু আঁকা-বাঁকা পথে গন্তব্যস্থলে এসে মাস্টার দা'র সাথে সাক্ষাৎ ঘটলো।

কিন্তু, আর কাউকে খুঁজে পাওয়া সম্ভব হয়ে উঠেনি। কৃষ্ণচৌধুরী, শুধাংশ বোস, হরিপদ মহাজন, হেমেন্দু দস্তিদার ও ভবতোষ ভট্টাচার্য ইত্যাদি আরো কয়েকজনের খোঁজ করেছি, কিন্তু, তাদের কোন সন্ধান মেলেনি। মিলিটারী দৌরাত্ম, অবিরত পুলিশী টহল, গোয়েন্দাদের তৎপরতার মধ্যে এ ধরনের অনুসন্ধানের কাজ চালান ছিল বেশ কঠিন ও বিপদজনক।

পলাতক জীবনটা হলো খুব কঠিন জীবন, সব সময় একটা উদ্বেগ-উৎকণ্ঠা বুকে নিয়ে চলতে ফিরতে হয়। একটু ভুলের জন্য মারাত্মক ক্ষতি হওয়ার আশংকা থাকে। অস্ত্রাগার দখলের পলাতকদের পলাতক জীবনের কাহিনী বিশেষ করে মাস্টার দা'র পলাতক জীবনের কাহিনী বহু রোমাঞ্চ-কর ঘটনায় ভরপুর হয়ে আছে। সাধারণ লোকেরা রঙ ছড়িয়ে সে-সব কাহিনীকে বেশ উপভোগ্য করে তুলছিল। মাস্টার দা'র পলাতক জীবন লিখিত হলে ছোটদের কাছে তা হত রূপকথা, বড়দের কাছে হত বীরত্ব-গাথা। ঝড়, বৃষ্টি, রৌদ্র, গরম কাদাজল, পুলিশ, মিলিটারীর বেড়াজাল, গোয়েন্দা তৎপরতা কিছুই মাস্টার দা'কে ঠেকাতে পারেনি। আদর্শের প্রতি নিষ্ঠাবান; সংকল্পে দৃঢ় এক লৌহমানব ছিলেন বলে অহঃরহ মিলিটারী কর্তৃক গ্রাম ঘেরাও করে তল্লাশি, শত শত গোয়েন্দার চোখের সামনে

পুরা চারটা বছর পলাতক জীবন কাটিয়ে ছিলেন। তাঁর ধৈর্য্য ও কষ্ট সহিষ্ণুতার একটা নিদর্শন তুলে ধরছি।

গ্রামের এক মুসলিম বাড়িতে মাস্টার দা' ও আমি আশ্রয় নিয়েছি। ছোট একটা ধানের গোলার ভিতর থাকতে হচ্ছিল। ধানের গোলাটি ছিল প্রায় ভর্তি, দাঁড়ালে টিনের ছাউনি এসে মাথায় ঠেকতো। দুপুরের রৌদ্র-তপ্ত টিনের ছাউনির গরমে যেন আমরা প্রায় সিদ্ধ হয়ে যাচ্ছিলাম। গরমে প্রাণ যেন ওষ্ঠাগত। কিন্তু, মাস্টার দা'র মুখে আ-উঃ শব্দ ইত্যাদি কিছুই ছিল না। নির্বিকার ভাবে তিনি সব সহ্য করে যাচ্ছিলেন—যেন দেহ ও মন তার আলাদা হয়ে গেছে। কি সহিষ্ণুতা ছিল তাঁর।

ঐ চলার পথে এক ঘটনার কথা মনে পড়লে আজো হাসি পায়, উপ-ভোগও করি। অম্বিকা দা ছিলেন যক্ষ্মাক্রান্ত। রোজই তাঁর রক্ত বমি হত। বমির পর বাড়ির ছোট কামরাটা ভরে থাকতো বিকট দুর্গন্ধে। প্রায় একুশদিন একটানা ঐ আবদ্ধ ঘরে কাটালাম। তারপর একদিন মাস্টার দা, অপর কয়েকজন পলাতক বন্ধু অম্বিকা দা'কে দেখতে আসেন। মাস্টার দা'কে বল্লাম, ভাল লাগছে না, রোগীর শুশ্রূষা করে করে কাহিল হয়ে পড়েছি। মহিরা ক্ষেত্রপাল থেকে একটু ঘুরে আসি, মাস্টার দা' সম্মতি দিলেন।

শ্রাবণ মাস, বর্ষণমুখর সন্ধ্যা গড়িয়ে পড়েছে রাতের প্রথম প্রহরে। গুড়ি গুড়ি বৃষ্টি মাথায় করে শ্রীপুর থেকে পরৈকোড়া হয়ে মহিরা যেতে হবে। কৃষ্ণপক্ষের জমাট কালো রাত। বৃষ্টি ও কাদায় পিচ্ছিল পথ প্রায় আট মাইল অতিক্রম করলাম। রাত প্রায় বারটা-একটা হবে, পটিয়া থানায় মিটমিট করে আলো জ্বলছিল। আরো কিছুদুর এগিয়ে গেলাম। পাঁচ-সাতশ' হাত দুরে মিট্‌মিট্‌ করে আগুন জ্বলছে চোখে পড়ল। বুকটা দুরু দুরু করে কাঁপতে লাগল। কেমন করে ঐ রাস্তা পার হয়ে যাব। মনে হচ্ছিল ভূতের ভয়ে জড়সড় হয়ে পড়ছিলাম বুঝি। শিশুকাল থেকে গড়ে ওঠা সংস্কার সৌধের ফাটলে ভগবান নামের শক্ত পুলটিস আটানোর ব্যর্থ চেষ্টা করলাম। কিছুতেই ঠেকিয়ে রাখতে পারলাম না। হঠাৎ রিভলভারটা হাতে উঠে এলো। মনে হল পুলটিসটা এবার যেন শক্ত হয়ে লেগেছে। তখন রাস্তার ধারের চলন্ত চিতার প্রায় কাছাকাছি এসে গেছি। অর্ধ জ্বলন্ত কাঠের গুড়ো জ্বলছে নিবু নিবু হয়ে। চিতা পার হয়ে গেলাম। সে রাতে কেউ যদি রহস্যচ্ছলে ভয় দেখাতো রক্তপাত ঘটার আশঙ্কা ছিল প্রবল। রাত চারটায় মুরারীঘাটে পৌঁছলাম। খেয়াঘাটে বাঁধা নৌকাটা খুলে খাল পার হয়ে ওপাড়ে গিয়ে ওঠলাম।

অনন্ত সিংহের আত্মসমর্পণ

জুন মাসের প্রায় মাঝামাঝি থেকেই ভারতব্যাপী আইন অমান্য আন্দোলন বিদ্রোহের পথে এগিয়ে চলেছে। বিভিন্ন জায়গায় শ্রমিক ধর্মঘট। পেশোয়ারে গাড়োয়ালী সৈন্যরা পেশোয়ারবাসীদের ওপর গুলিবর্ষণে অস্বীকার করলো। দশ দিন ধরে জনতার হাতে ছিল পেশোয়ার। গান্ধীজীর গ্রেপ্তারে দেশব্যাপী বিক্ষোভ, শোলাপুরে বস্ত্রশিল্প শ্রমিকদের ধর্মঘট, মিছিল ও নিজেদের শাসন প্রতিষ্ঠা নিষ্ঠুরভাবে তা ব্রিটিশ কর্তৃক দলন। হাজার হাজার গ্রেপ্তার হল এবং অমানুষিক নিপীড়নের মুখেও আন্দোলন ব্যাপক থেকে ব্যাপকতর হয়ে চলছিল।

এমতাবস্থায় হঠাৎ একদিন খবরের কাগজে পড়লাম, অনন্ত দা' মোটরে ডি, আই, বি হেড কোয়ার্টার ইলিসিয়াম রোডে গিয়ে পুলিশ আই, জি লোম্যানের কাছে ধরা দিয়েছেন। বিস্ময়ে অভিভূত হয়ে পড়লাম, ভয়ানক অস্বস্তি বোধ করতে লাগলাম।

ধরা দেবার পূর্বে মিঃ লোম্যানের কাছে তিনি যে চিঠি লিখেছিলেন তাতে লেখা ছিল—

প্রিয় লোম্যান,

২৮শে জুন, ১৯৩০ ইং আমি আপনার সঙ্গে দেখা করতে আসছি। আমাকে তৎক্ষণাৎ গ্রেপ্তার করার সুযোগ যে আপনি হারাবেন না তা নিঃসন্দেহ। হাঁ, আমিও তার জন্য প্রস্তুত। দয়া করে একথা ভেবে খুশি হবেন না যে, আমি আত্মসমর্পণ করতে চলেছি। কখন একজন আত্মসমর্পন করে? যখন সে একেবারে অসহায় হয়ে পড়ে, আর আত্মরক্ষার কোন উপায় থাকে না, তখনই ধরা দেয়।

আমি কি এখন অসহায়? কখনও নয়। আত্মরক্ষার উপযুক্ত অস্ত্র আমার আছে। প্রয়োজনমত খরচ করার জন্য পর্যাপ্ত অর্থ আছে, অনেক সহায়কারী আছে। বাংলাদেশে, ভারতের অন্যান্য প্রদেশ কিংবা ভারতের বাইরেও আমার আত্মগোপন করে থাকার মত অনেক আশ্রয়স্থল আছে। আজও আমি আমার বন্ধুদের সঙ্গে পলাতক জীবনে বেশ নিরাপদেই আছি। তবুও আমি নিজে ধরা দিতে যাচ্ছি কেন? আপনি কি মনে করেন আমি নিজ কাজের অন্য অনুতপ্ত! না, তার জন্য আমার বিন্দুমাত্র দুঃখ নেই। কোন উর্ধতন কর্তৃপক্ষের নির্দেশে কি আমি এই কাজ করছি? না এ আমার সম্পূর্ণ ব্যক্তিগত ব্যাপার।

ইতি

বিপ্লবী অনন্ত সিংহ

২৮শে জুন অনন্তদা তাঁর আশ্রয়স্থল থেকে মোটরে চড়ে কলকাতার ইলিসিয়াম রোড্ অফিসে একটুকরা কাগজ লিখে পাঠালেন—'অনন্ত সিং গোয়েন্দা পুলিশের ডেপুটি কমিশনারের সাথে দেখা করতে চান।' এই একটি লাইনে সমস্ত গোয়েন্দা অফিসার বড় থেকে ছোট সবাই হলো বিস্মিত লেখাটা অপ্রত্যাশিত, অবিশ্বাস্য মনে হলো। ঘটনা সত্য কিনা তা তারা চুপি চুপি আড়ালে থেকে দেখে নিল। এমন দুর্দ্ধর্ষ বিপ্লবী! নিশ্চয়ই কোন চক্রান্ত বা ষড়যন্ত্র তার মগজে ঘুরপাক খাচ্ছে। সতর্কতামূলক ব্যবস্থার হলনা ত্রুটি—চতুর্দিক সশস্ত্র পাহারায় তাঁকে নেওয়া হল ভিতরে—অফিস রুমে। অবশেষে, কয়েকদিন পরই ব্যাপক সতর্কতামূলক ব্যবস্থার মাধ্যমে তাঁকে চট্টগ্রাম দিয়ে আসা হয়।

এ সংবাদে বাংলা তথা ভারতব্যাপী বিস্ময়ের ঢেউ খেলে গেল। বিখ্যাত অস্ত্রাগার দখলের অন্যতম প্রধান কেন্দ্রমনি ধরা দিয়েছেন। চতুর্দ্দিকে প্রায় সব মহলেই জল্পনা-কল্পনার অন্ত নেই। কেউ ভাবলো অস্ত্রাগার মামলা শুরু হয়েছে, দু'একজন রাজসাক্ষীও বানান হয়েছে। তাদের খতম করার জন্যই অথবা নিজেদের দিকে টেনে নিয়ে আনার জন্যই তার এ বিস্ময়জনক কাজ।

দলের অন্যতম কেন্দ্রমনি, যার শৌর্যে, বীরত্বে আমরাও গর্বিত, বুদ্ধি বিবেচনা ও চেতনার দিকদিয়ে সাধারণের চাইতেও যিনি অগ্রণী তাঁরপক্ষে ঐ কাজ নিশ্চয়ই ব্যক্তিগত ব্যাপারের ঊর্ধ্বে। যখন সমষ্টিগত স্বার্থই প্রধান তখন এ ধরনের কাজটা সঙ্গত মনে হয়নি। ভাবাবেগে পরিচালিত হওয়া—অনেক সময় ক্ষতির কারণ হয়ে দাঁড়ায়। এক্ষেত্রে যদিও তা হয়নি, বরঞ্চ রাজসাক্ষীদের মন পরিবর্তনের দিকে জয়লাভ করেছেন, তবুও দেশের জনসাধারণ এটাকে অনুসরণীয় দৃষ্টান্ত বলে মেনে নেবে না মনে হল, একটি রহস্য পূর্ণ গোলক ধাঁধার সৃষ্টি করেছেন অনন্ত দা'।

চন্দন নগর সংঘর্ষ

গণেশ দা', অনন্ত দা, জীবন ঘোষাল ও আনন্দ গুপ্ত কলকাতা পৌঁছানোর পর যুগান্তর পার্টির সর্বোচ্চ নেতা শ্রী ভুপেন্দ্র কুমার দত্তের সাথে যোগাযোগ স্থাপন করা হলে তিনি চট্টগ্রামের বীর সন্তানদের কলকাতার উল্টাডাঙ্গা ও খিদিরপুর প্রভৃতি আঞ্চলে নিরাপদ আশ্রয়ের ব্যবস্থা করলেন।

উত্তর কলকাতার 'মূক-বধির বিদ্যালয়'-এর সুপারিন্টেডেন্ট সুহাসিনী গাঙ্গুলী (পুটুদি) ও ইষ্ট ইণ্ডিয়ান রেলের কর্মচারী শ্রী শশধর আচার্য ছিলেন যুগান্তর দলের অত্যন্ত দায়িত্বশীল কর্মী। সুহাসিনী ছিলেন বিধবা।

কিন্তু বিপ্লবী নেতা শ্রী ভূপেন্দ্র কুমার দত্তের নির্দেশে বিপ্লবীদের সহায়তার জন্য তারা দু'জন স্বামী-স্ত্রীর মিথ্যা পরিচয় দিয়ে চন্দন নগরের গোন্দাল পাড়ায় একটা বাড়ী ভাড়া নিলেন।

১৯৩০ সালের মে মাসের মাঝামাঝি তাদেরই হেফাজতে গনেশ ঘোষ, অনন্ত সিংহ, আনন্দ গুপ্ত ও জীবন ঘোষাল গোন্দাল পাড়ার ঐ বাড়িতে ওঠেন। অনন্ত দা ধরা দেওয়ার আগ পর্যন্ত বিপ্লবীদের সাথে যোগাযোগ রক্ষার সুবিধার জন্য ভূপেন দার চেষ্টায় চট্টগ্রামে আত্মগোপনকারী সূর্যসেনের সঙ্গে চন্দন নগরে অবস্থানরত বিপ্লবীদের যোগাযোগ প্রতিষ্ঠিত হয়। ২৮শে জুন অনন্ত সিংহ কলকাতার প্রধান গোয়েন্দা দপ্তর ১৩ নং লর্ড সিনহা রোডে গিয়ে একান্তই ব্যক্তিগত কারণে আত্মসমর্পণ করার কিছুদিন পর জালালাবাদ যুদ্ধের সর্বাধিনায়ক লোকনাথ বল মাস্টার দা' সূর্যসেনের কাছ থেকে কয়েকটা গুরুত্বপূর্ণ সংবাদ ও নির্দেশ নিয়ে কলকাতায় আসেন। লোকাদা' ছিলেন জাপান যাত্রী। চট্টগ্রাম থেকে এক বন্ধুর সাহায্যে প্রথম শ্রেণীর রেলওয়ে কেবিনে করে ইউরোপিয়ান সাহেবের ছদ্মবেসে তিনি কলকাতায় এসে-ছিলেন। ঐ বন্ধুটি সাহেবের বেয়ারা হিসেবে ছদ্মবেসে ঐ গাড়িতে ছিলেন। কিন্তু কলকাতা পৌঁছানোর পর তাঁর আর জাপান যাত্রা হল না। ভূপেন দা' গ্রেপ্তার হওয়ায় যুগান্তর দলের অন্যতম সর্বোচ্চ নেতা কিরণ চন্দ্র মুখার্জির সহায়তায় তিনি চন্দন নগরের আশ্রয় স্থলে সহকর্মীদের সাথে মিলিত হলেন।

২৩শে আগস্ট প্রকাশ্য দিবালোকে কলকাতার ডালহৌসী স্কোয়ারে পুলিশ কমিশনার টেগার্টের উপর আক্রমণ, ঐ দিন ইডেন গার্ডেন পুলিশ ফাঁড়িতে বোমা নিক্ষেপ, ২৯শে আগস্ট ঢাকায় পুলিশের ইন্সপেক্টর জেনারেল লোম্যানকে হত্যা এবং ঢাকায় পুলিশ প্রধান হাডসনকে আহত করার ঘটনা গুলো ছিল ঐ সময় বিপ্লবীদের তৎপরতার ফল।

ঐ সমস্ত বিপ্লবী তৎপরতার জন্য বিভিন্ন অঞ্চলের বিপ্লবী নেতা ও কর্মীকে জেলে বন্দী করে তখন অমানুষিক নির্যাতন করা হয়। এই সময় জেলে বন্দী একজন নেতৃস্থানীয় ব্যক্তি পুলিশকে চন্দন নগরের গোপন আশ্রয়স্থলের কথা প্রকাশ করে দিলে তারই সাহায্য নিয়ে পুলিশ ৩১শে আগস্ট সন্ধ্যার অন্ধকারে চন্দন নগরের ঐ বাড়িটি আক্রমণ করে।

৩১শে আগস্ট। রাত্রি প্রায় ২টা। ভোর হবার তখনও দু'তিন ঘণ্টা বাকি, রাত্রির অস্পষ্টতা ঘোচেনি, এমন সময় কলকাতার পুলিশ কমিশনার কুখ্যাত টেগার্ট সাহেবের নেতৃত্বে বাছা বাছা গোরা সার্জেন্টদের এক বিরাট বাহিনী চন্দন নগরের গোন্দাল পাড়ার ঐ বাড়ি চারিদিক থেকে ঘিরে ফেলে। সুপরিকল্পিত নির্দেশ অনুযায়ী সুদক্ষ সার্জেন্ট বাহিনী তাদের

লৌহ বেষ্টনীতে এতটুকু ফাঁক না রেখে এমনভাবে বাড়িটা ঘেরাও করেছিল যে তাদের এড়িয়ে নিষ্ক্রমণের কোন উপায় ছিল না।

বিপ্লবীরা কিছুদিন আগে থেকেই রাত্রে পালা করে ছাদের ওপর থেকে বাড়িটা পাহারা দিয়ে আসছিলেন। কারণ চারিদিকের অবস্থা তখন ক্রমশঃই ঘোরালো হয়ে উঠেছিল। সে রাতেও যথারীতি ছাদ থেকে বাইরের দু'দিককার রাস্তার ওপর দৃষ্টি রাখা হয়েছিল। দায়িত্বে ছিলেন জীবন ঘোষাল। শেষ রাত্রের দিকে হঠাৎ তার নজরে পড়ে অস্পষ্ট মূর্তি, মাথায় হেলমেট—ক্ষিপ্র গতিতে এ বাড়িটার দিকে এগিয়ে আসছে। পুলিশের তৎপরতা চোখে পড়তেই তিনি বাকি সবাইকে তা জানালেন। তৎক্ষণাৎ বিপ্লবীরা প্রস্তুত হয়ে তড়িৎগতিতে দোতলা থেকে একতলায় নেমে পেছনের দরজা দিয়ে বেরিয়ে পড়ার উদ্যোগ নিলেন।

তারা ভেবেছিলেন, সবাই বাড়ির পেছন দিক দিয়ে বের হয়ে যেতে পারবেন। কিন্তু সমস্ত সার্জেন্ট বাহিনী বাসার পেছন দিককার পাঁচিলের আড়ালে তাদের প্রহরা বসিয়ে অপেক্ষা করছিল শিকারের আশায়। বিপ্লবীরা পুকুর পার দিয়ে কলা বাগানের ভেতর দিয়ে যেতেই সার্জেন্টদের টর্চলাইটের তীব্র আলোয় আলোকিত হয়ে উঠলো কলাবাগানটা। মুহূর্তেই তীব্র আলোর রেখা কেন্দ্রীভূত হল বিপ্লবীদের ওপর আর সেই আলো-কোজ্জ্বাল দেহগুলোকে লক্ষ্য করে বর্ষিত হতে লাগল গুলি।

বিপ্লবীদের আগ্নেয়াস্ত্রগুলোও অবশ্য নিষ্ক্রিয় হয়ে বসে ছিলনা, তারাও পাল্টা গুলি চালালেন। কিন্তু শত্রু পক্ষের প্রত্যেকটা দেহই ছিল পাচিলের আড়ালে সুরক্ষিত। তাছাড়া এতগুলো টর্চের তীব্র আলো বিপ্লবীদের দৃষ্টিশক্তিকে এমন বিভ্রান্ত করে দিয়েছিল যে, তাদের রিভলভার ও পিস্তলের গুলি আদৌ শত্রুপক্ষের গায়ে লাগছে কি না তা বোঝার কোন উপায় ছিল না। বিশেষ করে গুলির যোগানও ছিল সামান্য।

সুতরাং বেশিক্ষণ এই অসমান যুদ্ধ চললো না। একদিকে বিপুল পুলিশ-বাহিনী অপরদিকে মাত্র এই চারজন লোক। গণেশ দা', লোকা দা', জীবন ঘোষাল ও আনন্দগুপ্ত। অল্প কয়েক সেকেণ্ডের মধ্যে জীবন ঘোষালের মাথায়, বুকে ও শরীরের বিভিন্ন জায়গা গুলিতে ঝাঁঝরা হয়ে গেল। মুহূর্ত তার মৃতদেহ লুটিয়ে পড়ল পাশের পুকুরে, তলিয়ে গেল জলের ভেতর। যেভাবে চারদিক থেকে গুলি বৃষ্টি হচ্ছিল তাতে তাদের কারুরই অক্ষত থাকার কথা নয়, কিন্তু সবগুলো গুলিই যেন কেবল জীবনের দেহেই বিঁধলো। কেবল একটা মাত্র গুলি এসে লাগল আনন্দের বাঁ পায়ে, আর বাকি দু'জন যে শেষ পর্যন্ত অক্ষত ছিলেন ব্যাপারটা সত্যি অদ্ভুত বলতে হবে।

লোকা দা', গণেশ দা' ও আনন্দকে বন্দী করা হল। তারপর শশধর আচার্য্য ও সুহাসিনী গাঙ্গুলীকেও তারা গ্রেপ্তার করলো। এরপর শুরু হল তাদের উপর নির্যাতন। সার্জেন্টদল যেন মৃত গরুর সন্ধান পেয়েছে। তারা শকুনের মত ঝাঁপিয়ে পড়লো শিকারের উপর।

প্রায় দু'ঘণ্টা ধরে এই কয়েক জনের উপর চলল অবিরাম নির্যাতন—বীভৎস, অমানুষিক নির্যাতন, হাতের ব্যাটন থেকে আরম্ভ করে পায়ের বুট ও রাইফেলের কুদো—সবকিছুই সুপ্রচুর প্রয়োগ হল তাদের শৃঙ্খলিত দেহের উপর।

এমনকি সুহাসিনী দিও রেহাই পাননি সেই নিষ্ঠুর নির্যাতনের হাত থেকে। তার দেহের উপরও চড়, ঘুষি, ব্যাটনের ঘা, বুটের লাথি—এর কিছুই বাদ গেল না।

প্রায় দু'ঘণ্টা ধরে পুলিশের এই বীরত্বলীলা শেষ হবার পর তাদের টেনে উঠানো হল পুলিশ ভ্যানে—হাতে হাত কড়া, কোমরে দড়ি। ভ্যানগুলো এদের নিয়ে হাজির হল চন্দন নগরের পাবলিক প্রসিকিউটারের অফিসে।

চন্দন নগর থেকে মোটরযোগে পুলিশ পরিবেষ্টিত অবস্থায় পাঁচ জনকে উপস্থিত করা হল হুগলী জেলে। পরদিন সকাল হতেই আবার মোটরে করে গণেশ দা' লোকনাথ বল ও আনন্দ গুপ্তকে নিয়ে হাজির করা হল কোলকাতার বিখ্যাত লালবাজার থানায়। তাদের তিনজনকে তিনটা আলাদা সেলে ঢোকানো হল।

পরদিন ভোর হতে না হতেই একদল সার্জেন্ট ও তাদের একজন উর্দ্ধতন কর্মচারী খুব তাড়াহুড়া করে তাদেরকে জেল থেকে বের করে হাতে হাতকড়ি ও কোমরে দড়ি বেঁধে আবার ঢোকালো পুলিশ ভ্যানে। তারপর শিয়াল দা স্টেশনে। তিনজনকে নিয়ে ওঠানো হল একটি বড় প্রথম শ্রেণীর কামরায় এবং এদের সঙ্গে সঙ্গে উঠল চারজন সার্জেন্ট, একজন উর্দ্ধতন শ্বেতাঙ্গ কর্মচারী, একদল গারোয়ালি মিলিটারি পুলিশ ও তাদের হাবিল-দার। যথাসময়ে গোয়ালন্দ গামী ট্রেন ছাড়ল এবং এভাবে তাদের নিয়ে আসা হল চট্টগ্রামে।

এখানে একটা কথা বলা দরকার। চন্দননগর ছিল ফরাসীদের নিয়ন্ত্রিত এলাকা। ফরাসী অধিকৃত রাজ্যে ঢুকতে হলে প্রয়োজন হয় তাদের অনুমতির। টেগার্ট সার্জেন্ট দলসহ যখন চন্দননগরের ঐ গোন্দলপাড়ায় ঢুকে পড়লো তখন ফরাসী সরকারের অনুমতি নেবার প্রয়োজন মনে করেনি। এ নিয়ে যখন হৈচৈ পড়ে যায় এবং চন্দননগরবাসীর তরফ থেকে ব্রিটিশ সরকারের বিরুদ্ধে মামলা রুজু করা হল তখন ফরাসী সরকারও পড়লো বে-কায়দায়। পারস্পরিক সাম্রাজ্যবাদী স্বার্থ রক্ষার মানসে ফরাসী

সরকার ঘোষণা করলো যে, ব্রিটিশ সরকার ফরাসী সরকারের অনুমতিক্রমেই চন্দননগরে প্রবেশ করেছে। সাম্রাজ্যবাদীরা উপনিবেশিক স্বার্থ নিয়ে পরস্পর লড়াই চালালেও গণস্বার্থের বিরুদ্ধে তারা এক ও অভিন্ন। এই ঘটনা তারই প্রমাণ রাখলো। আরো প্রমাণ হলো, আইন মানা না মানা নির্ভর করে সাম্রাজ্যবাদী স্বার্থের ওপর।

জীবন ঘোষালের মৃতদেহ সরানোর জন্য সরকারের তরফ থেকে মেথর-কুলের তিনজন লোক ঠিক করা হয়েছিল। চন্দননগরের ছাত্র সমাজ ও নাগরিক মহল একথা শোনার পরই বিক্ষোভে ও ক্রোধে জ্বলে উঠলো। ছাত্র সমাজ এগিয়ে এলো এবং নিজেরাই মৃতদেহ বয়ে নিয়ে গেল শশ্মান-ঘাটে। মৃত বীরের প্রতি তারা জানলো হৃদয়ের স্বতস্ফূর্ত শ্রদ্ধা ও অভিনন্দন। জীবন ঘোষালের স্মৃতি অমর করে রাখার জন্য তারা গড়ে তুললো স্মৃতিসৌধ।

এ ঘটনার কিছুদিন আগে থেকে আমাদের পরিকল্পনা ছিল যে চট্টগ্রাম অস্ত্রাগার দখলকারীদের একটা গ্রুপ কলকাতায় গিয়ে সিনেমা হলে কিংবা হোটেল রেঁস্তরায় ইউরোপিয়ানদের হত্যা করবে। সেই অনুযায়ী প্রস্তুতিও আমাদের চলছিল। হঠাৎ খবরের কাগজে দেখলাম, ডালহৌসী স্কোয়ারে দুর্দান্ত পুলিশ কমিশনার টেগার্টের ওপর বোমা নিক্ষিপ্ত হয়েছে। কিন্তু, সে মরেনি, আহত ও হয়নি, বোমার একটুকরা এলুমিনিয়াম খণ্ড টেগার্টের গাড়ীর গায়ে এসে লেগেছিল।

ঐ একটিমাত্র বোমা বিস্ফোরিত হবার সময়টুকু ছিল ত্রুটিপূর্ণ। তিন সেকেণ্ডের মধ্যেই বোমা বিস্ফোরণ ঘটান হলো, অতি সংক্ষিপ্ত সময়। ফলে কাজটা হলো ব্যর্থ; এবং এক শোচনীয় বিয়োগান্তক ঘটনায় পরিণতি লাভ করলো। সাথে সাথে কলকাতায় গিয়ে আমাদের পরিকল্পনাটা বাস্তবায়িত করার সঙ্কল্পটুকুও হল পরিত্যক্ত।

এরপর কলকাতাব্যাপী বহু ধরপাকড় হল। নামকরা অনেকেই পড়লেন ধরা। কলকাতা কর্পোরেশনের কাউন্সিলার ডাঃ নারায়ন রায়, ডাঃ ভূপাল বোস ও রসিক দাশ প্রমুখ নেতৃবৃন্দ গ্রেফতার হয়ে পড়লেন। সরকার পক্ষ থেকে ডালহৌসী স্কোয়ার বম্বকেস নাম দিয়ে মামলা রুজু করা হল। যাব-জ্জীবন দীপান্তর থেকে আট, দশ বৎসর পর্যন্ত সাজা হল অনেকেরই।

এ সময়ে কাজের জন্য একটা তীব্র অস্থিরতা অনুভব করছিলাম। মনে হচ্ছিল সময়টা এগিয়ে আসছে। ভাবলাম দাদার সাথে একবার দেখা করে আসি। এক রাত্রে প্রায় দশটায় গেলাম বাড়িতে। আমাকে দেখে দাদা অভিভূত হয়ে পড়লেন। আফসোস করলেন সংসার ধর্ম কিছুই আমি করতে পারলাম না দেখে দুঃখ করলেন এই বলে যে, ছয় সাত বৎসর

পরিভ্রমণ করে সংস্কৃত পড়লাম, পণ্ডিতিও পাশ করলাম। কিন্তু সব হয়ে গেল মাটি, সব হয়ে গেল ব্যর্থ। তিনি উদ্বিগ্ন হয়ে পড়লেন, কীভাবে আমি রক্ষা পেতে পারি ইত্যাদি। ভাইয়ের প্রতি ভাইয়ের দরদ উছলে পড়েছিল সেদিন। কি সান্ত্বনা দেব ভাবছিলাম। বললাম, ধরা যেন না পড়ি তার চেষ্টায় আছি। দরকার হলে অন্যত্র চলে যাব বলে তাঁকে আশ্বস্ত করতে চেষ্টা করলাম। তিনি শীতের মৌসুমে একবার এসে গায়ের গরম চাদর ইত্যাদি নিয়ে যেতে বললেন। বিদায় দিতে তিনি কেঁদে উঠলেন। যেন ভেঙে পড়বেন। দাদার সঙ্গে সেবারকারের মতো এটাই ছিল আমার শেষ সাক্ষাৎ। আবার তাঁর সঙ্গে দেখা হয়েছিল প্রায় দেড় যুগ পরে।

অম্বিকা দা' গ্রেফতার

ভাবি, অবাক হই। সাম্রাজ্যবাদীদের শাসন কবলিত পুঁজিপতিদের সমাজে কত রকমের মানুষই না জন্মে। ক্লেদাক্ত জীবনে অভ্যস্ত হয়ে পড়ে মানুষ। স্বার্থান্ধ, লোভাতুর মানুষের দল গজায় দেশে। ওই ধরনের মানুষ ব্রিটিশের এই উপনিবেশে আমাদের দেশে গজিয়েছিল। স্বাভাবিকভাবে এরা সাম্রাজ্যবাদী স্বার্থের পরিপোষকও বটে। ঐসব অদ্ভুত গোত্রের লোকেরা টাকার লোভে অম্বিকা দা'কে ধরিয়ে দেয়। তখন অক্টোবর মাস। গুরুতর অসুস্থাবস্থায় ধরা পড়েন তিনি। ক্লান্তির অবসাদে তাঁর সমস্ত দেহ এলিয়ে পড়েছিল। তৃষ্ণায় 'জল, জল' বলে চেঁচাচ্ছিলেন তিনি। পুলিশ ইনসপেক্টর আহসান উল্লাহ বিকট মুখভঙ্গিতে বলেছিল—'বেটা জল খেতে চাচ্ছে, পেসাব করে পানির তেষ্টা মেটা' বলেই পেসাব খাইয়েছিল অম্বিকা দা'কে। জানি না, একেই কি বলে ব্রিটিশ ভক্তির চরম নিদর্শন? হয়ত ব্রিটিশ সভ্যতা (!) মানুষকে তাই করে তোলে।

কিন্তু ভবি ভুলবার নয়। রক্তের বিনিময়ে উচিত শোধ নিয়েছিল বিপ্লবীরা। সাথীরা অম্বিকা দা'র প্রতি অসদাচরণ ভুলে নাই। এক বছর কেটে যায়। নিজাম পল্টনের মাঠে হরিপদের রিভলভার গর্জে উঠল। আহ-সান উল্লাহর বুকের পাঁজরগুলো চৌচির হয়ে পড়ল। বিপ্লবীরা ক্ষমা করল না। প্রতিশোধ গ্রহণের ক্রোধ এদ্দিন জ্বলছিল ছাই চাপা আগুনের মত। এবার দাউ দাউ করে জ্বলে উঠলো—রক্তের শোধ রক্ত দিয়েই আদায় হল।

চট্টগ্রাম। জালালাবাদ। রক্তগাথা ছড়িয়ে পড়ল সবখানে। বিপ্লবাত্মক যুদ্ধের কাহিনী বাংলার মাঠ-ঘাট কাঁপিয়ে তুলল। জাগরণের তরঙ্গ উঠল গ্রামে-গ্রামে, গঞ্জে-গঞ্জে, বন্দরে-বন্দরে সর্বত্র। সে তরঙ্গের আঘাত এসে পড়ল ঢাকায়। দিনের বেলায়, সকাল নয়টায় ঢাকার বুকে ঘটল এক অবাক

কাণ্ড। সরকারী সমস্ত সতর্কতামূলক ব্যবস্থা লণ্ডভণ্ড করে পুলিশ ইনস-পেক্টর জেনারেল লোম্যানকে হত্যা করা হল। পুলিশ সুপার হাডসন হল গুরুতর জখম। এই ঘটনার নায়ক বিপ্লবী বেঙ্গল ভলান্টিয়ার দলের বিনয় উধাও হয়ে যান। সরকার দিগবিদিক জ্ঞানশূন্য হয়ে পড়ে।

ঢাকার ঘটনা পলাতক জীবনের একঘেয়েমিতে এনেছিল বৈচিত্র্যবোধ। এক অব্যক্ত আনন্দে ভরে উঠেছিল মন। চঞ্চল হয়ে উঠেছিলাম, সাম্রাজ্য-বাদের চিতাভস্মের ওপর নতুন করে স্বাধীন সমাজ গড়ে তোলার জন্য। অধীর হয়ে উঠেছিলাম। কতদিন, আর কতদিন! কত দিন অপেক্ষা করব।

অক্টোবর কেটে গেল। দেখতে দেখতে নভেম্বরও প্রায় গেল ফুরিয়ে।

'না মেরে ফিরে আসবে না'

বিনোদ দত্ত ও আমি কোয়েপাড়া গ্রামের এক বাড়িতে যখন পলাতক জীবনের দিনগুলো কাটিয়ে যাচ্ছিলাম, ঠিক সেই সময়ে একদিন বেলা ১১টা কি ১২টার সময় হঠাৎ বিনয় দা' এসে বললেন যে, একটুও দেরি না করে আমাদের দুজনকে নদীর ওপারে শ্রীঘর গ্রামে যেতে হবে। শ' পাঁচেক হাত দূরেই নদী। তক্ষুণি বেরিয়ে পড়লাম। সেদিন ছিল ২৯শে নভেম্বর। আধ ঘন্টার মধ্যে ঐ গ্রামের শ্রী মনীন্দ্র মজুমদারের বাড়ি গিয়ে পৌঁছলাম। দেখলাম, সেখানে মাস্টার দা', নির্মল দা' সহ প্রায় ১০/১২ জন পলাতক বন্ধু আমাদের জন্য বসে রয়েছেন মনে হল। রামকৃষ্ণ ও শচীন সেন এবং সারোয়াতলীর শচীন সেনকেও তাঁদের মধ্যে দেখতে পেলাম।

আমরা পৌঁছানোর সঙ্গে সঙ্গে মাস্টার দা' আমাদের জানালেন যে, শচীন একটা খবর এনেছে। জেলের ভেতর খবর পাঠানো হয়েছে যে, বাংলার পুলিশ প্রধান নিহত লোম্যানের স্থলাভিষিক্ত মিঃ টি. জে. ক্রেইগ একটা হামলার ব্যাপারে চট্টগ্রামে গোপন সফরে এসেছে। কাজকর্ম সেরে সে দু'একদিনের মধ্যেই আবার কলকাতায় ফিরে যাবে। তারা প্রস্তাব দিয়েছে যে, ফিরে যাওয়ার পথেই যেন ক্রেইগকে দুনিয়া থেকে চিরতরে সরিয়ে দেওয়া হয়।

মাস্টার দা' বললেন, "আগস্ট মাসে বিনয় বসুর গুলিতে লোম্যান মরেছে। এখন তার জায়গায় ক্রেইগ নামে যে ইংরেজটা বসেছে তাকে যদি অচিরেই সরিয়ে দেওয়া যায় তবে তাতে বাংলার ব্রিটিশ মহলে এক ভয়াবহ আতঙ্কের সৃষ্টি হবে। অন্যদিকে বিপ্লবী আন্দোলনে জাগবে নতুন প্রেরণা। তিন মাসের মধ্যে আরও একজন পুলিশ প্রধান নিহত হলে এক

বিভীষিকার রাজত্ব বলে তাদের কলিজার রক্ত যাবে শুকিয়ে, ত্রাসে বুকটা কাঁপতে থাকবে তাদের। ঔপনিবেশিক আরামপূর্ণ জীবনে হলাহল পড়বে ঝরে ঝরে, কোটি কোটি লোকের রক্তে গড়া ঔপনিবেশিক স্তম্ভগুলো ফেটে ফেটে চৌচির হয়ে পড়বে। লোম্যান গেছে, ক্রেইগ যাবে, তারপর আরও অনেককেই জীবন দিয়ে মৃত্যু পরওয়ানার জবাবদিহি করতে হবে।" রামকৃষ্ণ বিশ্বাস ও আমার ওপর এই কঠোর দায়িত্ব পালন করার প্রস্তাবটা তিনিই দিলেন। প্রস্তাবে সকলে হলেন একমত এবং ঐ রাত্রেই আমাদের দু'জনের রওয়ানা হওয়ার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হল।

প্রায় রাত বারটা। রিভলবার দুটো দু'জনে কোমরে বেঁধে নিলাম। এন. টি বিস্ফোরক দ্রব্যে তৈরী বিভীষিকা সৃষ্টিকারী মৃত্যুবাণ বোমা দুটো দু'জনে ভরে নিলাম পকেটে।

এরপর মাস্টার দা' কাজের খুঁটিনাটি দিকগুলো আমাদের বুঝিয়ে দিলেন। মনে পড়ছে তিনি বলেছিলেন, "বোমার চাইতে রিভলভারের দিকে জোর দেবে, কারণ রিভলভার শট্ নিশানা রাখতে অনেকখানি নিশ্চিত। 'বোমা' ব্যবহার করবে কেবল শেষ অস্ত্র হিসাবে যদি অকুস্থলে অনেক লোক জড়ো হয়ে যায় এবং কোনভাবেই কাছে ঘেঁষা যাচ্ছে না বলে মনে হয় হেন অবস্থায় কেবল বোমা ব্যবহার করবে। এতে নিশানা বা লক্ষ্যবস্তুর গায়ে আঁচড় নাও লাগতে পারে। তাই বোমার আঘাতে ছত্রভঙ্গ হয়ে পড়লে হয়তো শেষে রিভলভার নিয়ে ধাওয়া করে নির্দিষ্ট ব্যক্তিকে নিশ্চিতভাবে নিশ্চিহ্ন করার চেষ্টা করবে।" মাস্টার দা' এভাবে নানা খুঁটিনাটি বিষয় আমাদের বুঝিয়ে দিলেন।

দুপুর গড়িয়ে সন্ধ্যা নামলো। রাত্রে খেয়ে দেয়ে দুপুর রাত্রে রওনা দেওয়ার জন্য প্রস্তুত হতে লাগলাম।

রাত প্রায় বারটা। নাইট্রোগ্লিসারিন পাউডার দিয়ে তৈরি এল্যুমিনিয়াম সেলে পূর্ণ করা বোমা এবং ওয়েভলি রিভলভার সঙ্গে নিয়ে আমরা রওয়ানা হলাম। শচীন আগে আগে, তার পেছনে রামকৃষ্ণ ও আমি। সঙ্গে মাস্টার দা' ও অন্যান্য বন্ধুরা এলেন আমাদের বিদায় দিতে। সেই বাড়ির উত্তর ধারের এক পুকুর পারের আম গাছতলায় এসে থমকে দাঁড়ালাম। কয়েক মুহূর্ত পরে মাস্টার দা' ও অন্যান্য বন্ধুদের কাছ থেকে বিদায় নিলাম। মনে হল, ঐ শেষ বিদায়। কী এক অদ্ভুত অনুভূতি যেন মনটাকে নাড়া দিয়ে গেল। মৃত্যু যে অনিবার্য তা যেন উপলব্ধি করলাম।

'না মেরে ফিরে আসবে না'—এই বলে মাস্টার দা' আমাদের বিদায় দিলেন। একটা অব্যক্ত অনুভূতি আমার সত্তাকে আচ্ছন্ন করে ফেললো।

পাশেই কর্ণফুলী নীরবে বয়ে যাচ্ছিল। কয়েক মিনিট পরে শচীনের

ইঙ্গিতে আমরা সাম্পানে উঠে পড়লাম। শচীন গাইড হিসেবে আমাদের সঙ্গে উঠলো। পাতলা অন্ধকারে সাম্পানটা যেন বেদনা ভরা এক অদ্ভুত সুরে এগুচ্ছে। নক্ষত্রগুলো আকাশ জুড়ে আলো জ্বালিয়ে রেখেছে বিদায়ের পথরেখাতে আলোকপাত করে। নিচে জলরাশি সেই ক্ষণে কী যেন বলতে গিয়ে থেমে গেল। দূরে ওপারের ঘনবৃক্ষরাজি অন্ধকারের ঘোমটা টেনে যেন দাঁড়িয়ে আছে আমাদের বিদায় দিতে। মনে হল এদের কাউকে আর দেখতে পাব না। শেষ দেখাটাও যেন রইলো অস্পষ্ট। মনে হল, বিদায় দেওয়া-নেওয়ার পালাটা শেষ হতে চলেছে। এর মধ্যেই ঘুমিয়ে পড়লাম। রাত প্রায় চারটার সময় শচীন আমাদের দু'জনকে জাগিয়ে দিল। শচীনের নির্দেশমত সবাই বাকলিয়ায় নেমে পড়লাম।

তারপর এগিয়ে একটা বড় সড়ক ধরে এসে পৌঁছলাম গ্রামের আঁকা-বাঁকা পথে শহরের উত্তর ধারে কাঙালগঞ্জের এক বাড়ীতে। রামকৃষ্ণের কলেজ সহপাঠী সরোজ রায় তখন ঐ বাড়িতে থাকতো। আমরা যে আসবো তা সরোজ আগেই থেকেই জানতো। নাম ধরে ডাকতেই সে উঠে এসে দরোজা খুলে আমাদের দু'জনকে দোতলায় নিয়ে গেল। পাটি বিছানোই ছিল। আমরা শুয়ে পড়লাম। অপারেশনের আগে আমাদের বিশ্রাম দরকার। অর্ধেন্দু গুহকে পাঠিয়ে দিতে বলে শচীনকে বিদায় দিলাম।

সকাল প্রায় আটটার সময় অর্ধেন্দু এসে হাজির হলেন। তার সঙ্গে আমাদের আলাপ-আলোচনা হল। ঠিক হল, ক্রেইগের চেহারাটা কি ধরনের, চেহারায় কি কি বৈশিষ্ট্য আছে তা নিখুঁতভাবে জানবার জন্য এবং তার গতিবিধি লক্ষ্য করার জন্য জেল, কোতোয়ালী, ডি. আই. বি অফিস, পুলিশ লাইন ও স্টেশনে আমাদের পক্ষ থেকে যেন সতর্ক পাহারার ব্যবস্থা করা হয়। বিকেল চারটায় আমরা দু'জন মোটর গাড়িতে করে কুমিরা স্টেশনে চলে যাব। স্টেশনে যেন ক্রেইগকে অনুসরণকারী আমাদের কেউ প্রয়োজনীয় খবর ইত্যাদি নিয়ে আসে। ক্রেইগের কোন সন্ধান না মিললেও কুমিরা স্টেশনে দেখা করতে যেন সে ভুল না করে। প্রয়োজন-বোধে কেবিনের দরজা খুলে তাকে যাতে হত্যা করা যায় সেজন্য সম্ভব হলে যেন চাবি যোগাড় করার চেষ্টা করা হয়। আরো ঠিক হল, কুমিরা স্টেশন থেকে আমরা সীতাকুণ্ড ও কলকাতার টিকেট কাটব। ঘটনাচক্রে ক্রেই-গের কোন সন্ধান না মিললে পথে সীতাকুণ্ডে নেমে আবার কুমিরায় ফিরে আসব। পরদিনও আমরা টিকেট কেটে আগের দিনের মত অপেক্ষা করে থাকব। সেদিনও যদি তার কোন পাত্তা না মিলে তবে সরাসরি পলাতক আবাসে ফিরে আসবো।

কতগুলো বিশেষ অসুবিধার জন্য সেদিন সকালে নাস্তা হল না। দুপুরেও আমাদের উপবাসে কাটাতে হল। ঠিক চারটার সময় একটা মোটর ভাড়া করে আনা হল। আমরা দু'জনই সার্ট-কোট পরে গায়ে লাল ও নীল র‍্যাপার জড়িয়ে মোটরে চড়ে বসলাম। লালদীঘির পারে পেট্রোল পাম্প থেকে পেট্রোল নেবার জন্য গাড়িটা এসে থেমে পড়লো, সন্দেহ ও শঙ্কার রেশ মনের মধ্যে উঁকি ঝুঁকি মারছিল। র‍্যাপারের নীচে কোটের তলায় লুকানো রিভলভারটার হাতলটা দৃঢ় মুষ্টিবদ্ধ করে ধরলাম। পেট্রোল ট্যাঙ্ক ভর্তি করে মোটরখানা আবার চলতে শুরু করলো। প্রায় সাড়ে পাঁচটায় আমরা কুমিরা বাজারে মোটর থেকে নেমে পড়লাম। ভাড়া চুকিয়ে দিয়ে চায়ের দোকানে কিছু খেয়ে নিয়ে সন্ধ্যার একটু পরে কুমিরা স্টেশনে এসে পৌঁছলাম। গাড়ি আসার তখনও অনেক দেরি। অন্ততঃ রাত নটার আগে ট্রেন স্টেশনে আসছে না। তাই ট্রেনের অপেক্ষায় স্টেশনেই পায়চারি করতে লাগলাম। ট্রেন আসার কিছুক্ষণ আগে টিকেট কাটতে গিয়ে দেখি, ছোট স্টেশন বলে এখানে কলকাতার টিকেট বিক্রি হয় না। অগত্যা লাকসামের টিকেট কাটলাম।

অপারেশন চাঁদপুর : ভুল লক্ষ্যভেদ

রাত প্রায় সাড়ে ন'টায় ট্রেনের ঝক ঝক আওয়াজ শোনা গেল। হেড-লাইট অস্পষ্ট থেকে স্পষ্ট হতে লাগল। ধীরে ধীরে ট্রেন স্টেশনে এসে থামলো। আমরা দু'জন ট্রেনের ও খবরের জন্য উন্মুখ হয়ে অপেক্ষা করছিলাম। পূর্ব নির্দিষ্ট প্ল্যান অনুযায়ী আমাদেরই বন্ধু সুশীল সেন দ্রুত নেমে এল ট্রেন থেকে, এগিয়ে এল আমাদের দিকে। ফিস্ ফিস্ করে বললো যে, এই ট্রেনের প্রথম শ্রেণীর কামরায় ক্রেইগ সাহেব আছে। তার ফরসা লম্বা চেহারা, ওভারকোট আছে গায়ে জড়ানো। জিজ্ঞেস করলাম, 'কি করে বুঝলে যে এই হল ক্রেইগ সাহেব?' জবাবে সে বললো, 'তাকে বিদায় দেবার জন্য ম্যাজিষ্ট্রেট, পুলিশ সুপারিনটেণ্ডেণ্ট, সুপার সাহেব, পুলিশ ইন্সপেক্টর আহসান উল্লাহ ও অন্যান্য উচ্চ সরকারী কর্মচারীর দল স্টেশনে এসেছিল।' কোন কামরায় সে উঠেছে তা সে দেখিয়ে দিল ইশারা ও ইঙ্গিতে। দেখলাম, মিলিটারী গার্ড রাইফেল হাতে কামরাটির সামনে টহল দিচ্ছে। বন্ধুটিকে বিদায় দিয়ে আমরা দু'জন ট্রেনে চড়ে বসলাম। লাকসামে ট্রেন থামতেই তাড়াতাড়ি নেমে কলকাতার টিকেট করে নিলাম। ক্রেইগের দরজার সামনে কোন গার্ড দেখলাম না বলে মনে হল। দরজাটা ভেতর থেকে বন্ধ। গাড়ি ছেড়ে দেবার খানিক আগে ঐ কামরাটার

পাশেই একটা তৃতীয় শ্রেণীর কামরায় আমরা ছু'জন চড়ে বসলাম। ঝক-ঝক করে গাড়ি চললো চাঁদপুরের দিকে। গাড়িতে বার বার মাস্টার দা'র শেষ কথাটা মনে পড়ছিল—'না মেরে ফিরে আসবে না।'

মাস্টার দা'র কথা মনে পড়ায় সব অনিশ্চয়তা দ্বিধা কেটে গেল। কর্তব্য পালনের দৃঢ় সংকল্পে মন কঠিন হয়ে উঠলো। চাঁদপুর হোক, স্টিমারে হোক, গোয়ালন্দ ঘাটে হোক, শিয়ালদা স্টেশনে হোক, যেখানেই সুযোগ পাব তাকে খতম করে দেব—এই দৃঢ় সংকল্পে বলীয়ান হয়ে উঠলাম।

ভোর রাতে প্রায় চারটার সময় চাঁদপুর স্টেশনে ট্রেন এসে থামলো। যাত্রীরা নেমে পড়লো। আমরা ছু'জনও ঝট্পট্ গাড়ি থেকে নেমে পড়-লাম। কুয়াশাচ্ছন্ন অস্পষ্ট আলোতে দেখলাম, ক্রেইগের সামনে জনা তিরিশেক লাঠিধারী পুলিশ একটা বেষ্টনী তৈরি করে দাঁড়িয়ে আছে। কেবিনের দরজায় ওভারকোট গায়ে আমাদের দিকে পেছন ফেরা এক লম্বা লোক নামছে চোখে পড়লো। পুলিশরা তাকে অভিবাদন জানাচ্ছে। ছু'জনেই কর্ডন ভেদ করলাম। মুহূর্তেক বিলম্ব না করেই নামন্ত লোকটাকে ছুই-তিন হাত দূর থেকে গুলি করলাম। হঠাৎ গুলির আওয়াজে লাঠিধারী পুলিশ দল যে যেদিকে পারলো উর্দ্ধশ্বাসে দৌড়ে পালিয়ে গেল। গুলিবিদ্ধ লোকটাও দৌড়াতে চেষ্টা করলো। কিন্তু দৌড় দিয়ে সে যাবে কোথায়? আমাদের ওয়েভলি রিভলভারের নল প্রায় তার পিঠে বসিয়ে গুলি চালিয়ে গেলাম। তার পৃষ্ঠদেশ একেবারে ঝাঝরা হয়ে গেছে বলে মনে হল। ছুটো রিভলভারের এগারো রাউণ্ড গুলি শেষ হতে না হতেই সে 'বাবাগো গেলুম বাবাগো' বলে প্ল্যাটফরমের মাটিতে হুমড়ি খেয়ে পড়ে গেল। রামকৃষ্ণ বুকের উপর নিশানা করে শেষ গুলিটা ছুঁড়তে যাচ্ছিল। 'এ কি! এ তো বাঙালী, ক্রেইগ নয়।'—কথাটা স্বতই আমার মুখ দিয়ে বের হল। ওখানে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে চেম্বার খালি করে রিভলভারে গুলি ভরলাম। পাশে আরেকটা ট্রেন দাঁড়াল। রামকৃষ্ণকে বললাম, চল সরে পড়ি। প্ল্যাট-ফরমে দাঁড়ানো গাড়িটার ছুটো বগীর মাঝখানের ফাঁকা জায়গা দিয়ে লাফিয়ে ছু'জন পর পর পার হলাম। ঘুটঘুটে অন্ধকারে অচেনা পথে এগিয়ে যেতেই হুমড়ি খেয়ে নদীতে পড়তে পড়তে হুঁশিয়ার হয়ে গেলাম। বাধ্য হয়ে আবার পা বাড়ালাম প্ল্যাটফরমের দিকে। মনে হল যে-কোন মুহূর্তে আমরা আক্রান্ত হতে পারি। তাই রামকৃষ্ণকে সিগারেট জ্বালাতে বললাম। কারণ বোমা বিস্ফোরণ করতে হলে আগুন দরকার হবে। রামকৃষ্ণ সিগারেট ধরালো। তারপর সতর্ক পদক্ষেপে প্ল্যাটফরমে ঢুকলাম। কিন্তু কি আশ্চর্য! প্ল্যাটফরমটা নীরব, নিস্তব্ধ, জনমানবহীন যেন এক শ্মশানপুরী। আমরা একজন সামনে অপরজন পেছনে পেছনে অগ্রসর

হচ্ছি। ধরতে এলে মাথার খুলি উড়িয়ে দেয়া হবে এমনি সাবধানতা নিয়ে কদম ফেলে চলেছি আমরা। চাঁদপুর পুলের গোড়ায় আসতেই টিকেট কালেক্টর টিকেট চাইলো। পকেট থেকে কলকাতার টিকেট খুঁজে পেতে দেরি হচ্ছিল বলে লোকটা লাকসাম থেকে চাঁদপুরের ভাড়া চেয়ে বসলো। যাহোক শেষ পর্যন্ত টিকিট দেখে লোকটা আর কিছুই বললো না। টিকিট দেখানোর সময়ও আমাদের সতর্কতা অবলম্বন করতে হয়েছিল। একজন যখন টিকিট দেখাচ্ছিলাম অন্যজন তখন চারিদিকে সতর্ক চোখ রাখছিলাম। এরপর দু'জনে পুলের উপর উঠলাম। দেখলাম, জনমানবের কোন চিহ্ন কোথাও নেই। পুল থেকে নেমে গেলাম চাঁদপুর বাজারে। তখনও বেশ অন্ধকার, কিছুই দেখা যাচ্ছিল না। পথ ঘাট অচেনা বলে রেললাইন ধরে রওয়ানা হলাম চট্টগ্রামের দিকে।

নয়

কারা জীবনের শুরু

পহেলা ডিসেম্বর ১৯৩০। অগ্রহায়ণের মাঝামাঝি। সকাল বেলা। হাড় কাঁপুনে শীত না হলেও বেশ শীত পড়েছে। আমাদের দুজনার গায়ে নীল ও লাল র‍্যাপার জড়ানো। কোথাও কোথাও চারপাশ ঘন কুয়াশায় ঢাকা। রেল লাইনের পাশে ক্ষেতের ওধারের গ্রামগুলো কুয়াশার ঘোমটা টেনে যেন দাঁড়িয়ে আছে।

আমরা রেল লাইন ধরে এগিয়ে চলেছি। কয়েকটা স্টেশন পার হলাম হেঁটে হেঁটে। এমন সময় আমাদের পাশ দিয়ে সশস্ত্র পুলিশ ভর্তি একটা ট্রেন চলে গেল দ্রুত বেগে। নিশ্চয়ই খবর পেয়ে চাঁদপুরের দিকে চলেছে।

প্রায় ১০টার সময় ১৮ মাইল দূরে হাজিগঞ্জ স্টেশন পার হলাম। এসে পৌঁছলাম গ্র্যাণ্ড ট্রাঙ্ক রোড ও রেল লাইনের সংযোগ স্থানটাতে। আগের দিন সন্ধ্যায় এক চায়ের দোকানে দু'টুকরো বিস্কুট ও এক কাপ চা খেয়েছি। তারপর এ পর্যন্ত পেটে আর কিছুই পড়ে নি। তার উপর এতো উত্তেজনা এবং পায়ে হেঁটে এতটা পথ আসা। ক্ষুধায় ও ক্লান্তিতে যেন অবসন্ন হয়ে আসছিল সারা শরীর। তার উপর মনটা ছিল খুবই ভারাক্রান্ত। কোন অজ্ঞাত ব্যক্তিকে মারলাম সে চিন্তা মনটাকে পিষে মারছিল।

শরীর ও মনের এ অবস্থায় যখন একটা দোকানে বসে চা খাচ্ছিলাম তখন কথায় কথায় দোকানদার বললো, চাঁদপুরে খুব হৈ চৈ পড়ে গেছে। ভোর রাতে এস. ডি. ও না কাকে যেন গুলি করে মেরে ফেলেছে ইত্যাদি ইত্যাদি। আশ্চর্য। এত তাড়াতাড়ি ঐ ঘটনার খবর এখানে এসে পৌঁছেছে।

তাড়াতাড়ি চা খেয়ে উঠে পড়লাম। এবার চলতে থাকলাম গ্র্যাণ্ড ট্রাঙ্ক রোডের রাস্তা ধরে। সূর্য মাথার উপর উঠে এসেছে। গায়ের নীল র‍্যাপারটা মাথায় জড়িয়ে সূর্যের তাপ থেকে যে বাঁচবো, তারও উপায় নেই। গায়ে র‍্যাপার না থাকলে কোমরে বাঁধা লম্বা মুখওয়ালা রিভলভারটার বাঁকানো মোটা হাতলটা যে মাথা বের করে রয়েছে সেটা লুকোনো যায় না।

হেঁটে চলেছি। এলাকাটা সম্পূর্ণ অচেনা। আমাদের একমাত্র লক্ষ্য তখন চট্টগ্রামে পৌঁছানো। পাশ দিয়ে স্কুলের ছাত্ররা স্কুলে যাচ্ছিল। তাদের অস্পষ্ট কথাগুলোর মধ্যেও যেন 'চাঁদপুর' শব্দটা কানে ভেসে এল। তবে কি ওরাও ঘটনাটার কথা শুনেছে? না কি আমার মনের ভুল?

দু'একখানা মোটর গাড়ি ঐ পথে আসা-যাওয়া করছিল। পাতলুন পরা ও গেঞ্জি গায়ে দুজন সাদা চামড়াকে পাশ কাটিয়ে হেঁটে যেতে দেখলাম। আমরা দুজনেই কৌতূহলী চোখে তাদের দেখতে লাগলাম। দুজনের মনেই হয়ত একটা চিন্তা মুহূর্তে পাক খেয়ে গেল, চাঁদপুরের অপারেশনটা সফল হল না! ক্ষতিটা কি এখানেই পুষিয়ে নেব? ভাবলাম বটে কিন্তু কোন আবেগ অনুভব করলাম না। ওদের লক্ষ্য করে চলতে চলতে আমাদের হাঁটার গতি বেশ মন্থর হয়ে এসেছিল। আবার দ্রুত পা চালাতে লাগলাম। এ ভাবে আরো কয়েক মাইল পেরিয়ে এসে পৌঁছলাম মেহেরকালী স্টেশনের পেছনে।

ভরা দুপুর। সূর্যকে বৈশাখ-জ্যৈষ্ঠ মাসের সূর্য বলে মনে হচ্ছিল। কোট র‍্যাপার সব ঘামে ভিজে চপচপ করছে। এত রোদে ও গরমে ঐ কোট আর র‍্যাপার গায়ে জ্বালা ধরিয়ে দিয়েছিল। ভাবছিলাম এই অস্বস্তিকর অবস্থা থেকে কখন যে মুক্তি পাই। কিন্তু চট্টগ্রামে না ফেরা পর্যন্ত এ অবস্থার হাত থেকে মুক্তি নেই। অথচ চট্টগ্রাম তখনো অনেক দূরে। আর ঠিক ঐ সময়েই একটা মোটর গাড়ি আমাদের একেবারে সামনে এসে হঠাৎ ঝট করে থেমে পড়লো। একজন অফিসারের নেতৃত্বে সশস্ত্র পুলিশ আমাদের চোখের পলকে ঘিরে ধরলো এবং রাইফেল তাক করে রইলো। অফিসারের নির্দেশে তখনি দু'জন পুলিশ টান মেরে খুলে ফেললো আমাদের গায়ের র‍্যাপার।

বুঝতে পারলাম, তাদের এই আক্রমণ পুরোপুরি পরিকল্পিত এবং ভুলটা আমাদেরই। প্রায় প্রত্যেক স্টেশন থেকেই কুমিল্লায় খবর যাচ্ছিল যে, লাল ও নীল র‍্যাপার গায়ে দুজন যুবক রেল লাইন ধরে চট্টগ্রামের দিকে এগিয়ে চলেছে। ঐ লাল ও নীল র‍্যাপারই শেষ পর্যন্ত আমাদের ধরা পড়িয়ে দিল।

কোমর থেকে রিভলভার বের করার সুযোগ হল না। বোমা ছুঁড়তে হলে বোমার মুখের সলতেয় আগুন লাগাতে হবে। তারপর ছুঁড়তে হবে। তিন সেকেণ্ডের মধ্যে তা ফাটবে। কিন্তু আগুন জ্বালাবার সময় কোথায়? কোমর থেকে রিভলভার দুটো খুলে আমাদের নিরস্ত্র করে অফিসারটি হঠাৎ উচ্ছ্বসিত উৎসাহে বলে উঠলো, এরা অস্ত্রাগার লুটের মামলার পলাতক আসামী। তার উচ্ছ্বসিত ভাবাবেগ দেখে বুঝতে পারলাম, অপ্রত্যাশিত

ছুটো মস্ত শিকার পেয়ে তার আনন্দের সীমা নেই। সাম্রাজ্যবাদী ব্রিটিশের পাহারাদার পুলিশী রাজত্বের সিঁড়ির ধাপ বেয়ে উপরে উঠার স্বপ্ন বুঝি এবার তার সফল হতে চলেছে। এডিশনাল পুলিশ সুপারের পদ থেকে একেবারে পুলিশ সুপার পদে প্রমোশন (ছু'মাসের মধ্যেই ঐ অফিসার ইনাম হিসেবে বাঁকুড়ায় পুলিশ সুপারের পদ পেয়েছিল)। আমাদের সঙ্গে চোখাচোখি হতেই পলকে তার মুখের হাসির ভাব মিলিয়ে গেল। পরিবর্তে ফুটে উঠলো নিষ্ঠুর ক্রূর হাসির রেখা।

প্রথমে রাস্তার ধারের খাদ থেকে পানি তুলে এনে তাতে বোমা ছুটো খুব সাবধানে ডুবিয়ে রাখা হল। তারপর আমাদের ছু'জনের উপর চললো এক প্রস্থ মারধোর। কিছুক্ষণ পর অফিসারটি কি ভেবে মারধোর করতে নিষেধ করলো। তারপর হাতকড়া পরিয়ে দিয়ে ওরা আমাদেরকে তুলে নিল। তারপর শোঁ শোঁ করে মোটর দ্রুত ছুটলো কুমিল্লার দিকে।

আমাদের ছু'জনকে যখন মোটরে উঠানো হচ্ছিল, অফিসারের দেহ-রক্ষী হঠাৎ বলে উঠলো, এরা তারিণী মুখার্জিকে মারতে যায়নি, আসলে মারতে গিয়েছিল ক্রেইগ সাহেবকে। শোনা মাত্রই মনটা আরও খারাপ হয়ে গেল। ভরে উঠলো তিক্ততা ও উদ্বিগ্নতায়। ক্রেইগ তাহলে ওখানে হাজির ছিল। ভাবতেই প্রচণ্ড আঘাত পেলাম। আফসোস ও ছুঃখ মন তোলপাড় করতে লাগলো। রামকৃষ্ণের দিকে তাকালাম। সে যেন পাথর বনে গেছে। দেখলাম, সে পলকহীন চোখে সামনের দিকে চেয়ে আছে।

মোটর খুব জোরে চলছিল। মনে হচ্ছিল যেন উল্টে গিয়ে একটা ছুর্ঘটনা ঘটে যাবে। মনে হল, সেটা হলেই ভাল হত। মোটর ছুটে চলছে। কখনো রাস্তা চওড়া, কখনো সরু, কখনো আঁকা-বাঁকা, কখনো সোজা। কখনো ক্ষেতের পাশ দিয়ে কখনো ঝোপ-ঝাড় পাশে ফেলে মোটর গাড়িটা যেন ঝড়ের গতিতে উড়ে চলছে। বিকেল প্রায় পাঁচটায় কুমিল্লা শহরে পৌঁছেই পুলিশ অফিসারটি আমাদেরকে পুলিশ সুপারিনটেণ্ডেণ্ট মিঃ মারের বাংলোয় নিয়ে হাজির করলো। মিঃ মারের চোখে প্রতিহিংসার আগুন দেখতে পেলাম। যেন পারলে এখনই গুলি করে মেরে ফেলে। ভাবভঙ্গি এমন যেন বহুদিন পরে ক্ষুধার্ত বাঘ শিকার খুঁজে পেয়েছে। হাত ছুটো গলার পাশে নিয়ে সে ফাঁসিতে ঝোলাবার ইঙ্গিত করলো। তারপর তার নির্দেশমত আমাদেরকে নিয়ে যাওয়া হল ডি. আই. বি হেড কোয়ার্টারে। খবর পেয়ে ম্যাজিস্ট্রেট মিঃ স্টিভেন্স এলেন আমাদের জবানবন্দী নিতে। রিভলভারগুলো আমাদের কি না জিজ্ঞেস করলেন। আমরা জানালাম যে ওগুলো আমাদের নয়। তারিণী মুখার্জির হত্যাকাণ্ডের দায় চাপিয়ে

দেওয়ার জন্য আমাদের যা যা প্রশ্ন করলো সবই অস্বীকার করে বসলাম। মৃত্যু যেখানে তুচ্ছ, ফাঁসি যেখানে অনিবার্য, দ্বিধাহীন চিত্তে আমরা যেখানে মৃত্যুকে বরণ করতে যাচ্ছি তখন ওদের সাধ্য কি আমাদের কাছ থেকে কোন স্বীকারোক্তি আদায় করে? বেশি কথা বলা অযৌক্তিক ও অপমানকর বলে প্রায় প্রশ্নের জবাবেই চুপ করে রইলাম। অটল দৃঢ়তা ও গাম্ভীর্যের সামনে তারা হল ব্যর্থ ও পরাস্ত।

কুমিল্লা কারাগারে

সূর্য অস্তমিত। গোধূলি লগ্নে আমরা দু'জন কুমিল্লা জেলে ঢুকলাম। জেলে ঢোকানোর আগে আমাদের ধুতিগুলো খুলে নেওয়া হল। তাদের ভয়, পাছে ধুতিকে ফাঁস বানিয়ে তাতে লটকে মরি। ইচ্ছে হল তাদের চিৎকার করে বলি, আহাম্মকের দল, ভয় নেই। বুক ফুলিয়ে মাথা উঁচু করে জীবনের গান গাইতে গাইতে ফাঁসির মঞ্চে উঠার হিম্মত আমরা রাখি। আমাদের নিয়ে তাদের উৎকণ্ঠা, সাবধানতা এবং চরম সতর্কতামূলক ব্যবস্থা দেখে মনে মনে না হেসে পারলাম না। সন্ধ্যার অন্ধকারে আমাদের দুজনকে আলাদা দুটি সেলে ঢুকিয়ে দেওয়া হল। শুরু হল জীবনের আর এক নতুন অধ্যায়।

সেলের একধারে কম্বল দুটো পেতে নিয়ে শুয়ে পড়লাম। উত্তেজিত মস্তিষ্কে কেবল এই কথাটা বার বার আনাগোনা করছিল যে, অবশেষে পুলিশ ইনস্পেক্টর তারিণী মুখার্জিকে হত্যা করলাম। একটু অপেক্ষা করলেই তো বাঞ্ছিত শিকার মিঃ ক্রেইগ বের হত। তাহলে কি ইতিহাসটা অন্যরকম হোত না? তারিণী মুখার্জি মিঃ ক্রেইগকে বাঁচিয়ে দিয়ে গেল। সেই লম্বা চেহারা, ওভারকোট গায়ে পরা, সিপাইদের সালাম গ্রহণ ইত্যাদি সবটাই ঠিক ঠিক মত চলছিল। কিন্তু ক্রেইগ না হয়ে মারা পড়লো তারিণী মুখার্জি। আহা, হত্যার পরেও যদি জানতে পারতুম যে ক্রেইগ ব্যাটা কামরার ভেতরে লুকিয়ে আছে তাহলে সেখানেই ঢুকে পড়তাম। তাহলে তার মৃত্যুও অনিবার্য হয়ে পড়তো। আরও ভাবতে লাগলাম, ধরা পড়েছি নিজেদের বোকামির জন্য। সোজাসুজি চাটগাঁ রওয়ানা না হয়ে যদি দিনের বেলাটা কোন গ্রামে লুকিয়ে থেকে রাতে চলাফেরা করতাম তাহলে এমনভাবে আহাম্মকের মতো ধরা পড়তাম না। চাটগাঁ ফিরতে দেরি হলে তো কোন ক্ষতি ছিল না। তবু কেন এমন বোকামি করতে গেলাম। যদি ধরা না পড়তাম তবে আবারও হয়তো এ ব্যর্থতা ঘুচাবার আরও একটা সুযোগ নেওয়া যেত। আহ্, কি করতে কি করে ফেললাম!

প্রশ্নগুলো মনের ভেতর তোলপাড় করছিল। মনে হচ্ছিল যেন কেউ কলজেটা ছিঁড়ে কুড়ে খাচ্ছিল। মনে হচ্ছিল এ দুঃখ আর সইতে পারবো না। পাহাড় সমান এই দুঃখ আর অনুশোচনার হাত থেকে একমাত্র নিষ্কৃতি হল মৃত্যু। ভাবতে ভাবতে একসময় ঘুমিয়ে পড়লাম।

রাত প্রায় একটা কি দুটো হবে। জেলের দরজা খুলে গেল। কারারক্ষীরা আবার আমাদের ধুতিগুলি পরতে বললো। কাপড় বদলানো হলে আমাদের দু'জনকে জেলের বাইরে নিয়ে যাওয়া হল। কিছুই বুঝতে পারছিলাম না। জিজ্ঞেস করেও কোন জবাব পেলাম না।

জেল গেটের পাশে জেল সুপারের কামরা। সেখানে আমাদের ঢোকানো হল আলাদা আলাদা করে। দেখলাম সেখানে উঁচুদরের দু'জন বিলেতি সাহেব বসে আছে। একজন হলেন চট্টগ্রামের পুলিশ সুপার মিঃ সুটার। অন্যজনকে চিনতে পারলাম না। কে জানে হয়ত স্বয়ং মিঃ ক্রেইগই হবেন। সুটার বাংলায় আমার নামধাম জিজ্ঞাসা করে তারপর জেরা করতে শুরু করলো। অন্যজন নীরবে সব শুনে গেল। দু'একটা প্রশ্নের জবাব দিলাম, জানালাম চাকরির জন্য কলকাতা যাচ্ছিলাম। বাকি প্রশ্নের জবাব দিলাম না। প্রশ্ন করা থামছে না দেখে শেষে বললাম, আমি তোমাদের প্রশ্নের জবাব দেওয়া নিরর্থক মনে করি। শেষ পর্যন্ত আবার আমাকে জেলে ফেরত নিয়ে দরজা বন্ধ করে দিল।

সকালে হাত মুখ ধোয়ার জন্য সেল থেকে কিছুক্ষণের জন্য বের হতে দিল। তারপর আবার সেলের দরজা বন্ধ হল। টিফিনের জন্য শুকনো দুটো রুটি আর সামান্য চিটে গুড় দিয়ে গেল। কিছুক্ষণ পরে ডাক্তার এল, ওজন নেওয়া হল। সবকিছুই আমার কাছে নতুন ও অদ্ভুত মনে হচ্ছিল।

দেয়াল দিয়ে ঘেরা ছয়টি সেল। দুটো পাশাপাশি সেলে আমাকে আর রামকৃষ্ণকে রাখা হয়েছিল। কিন্তু দু'জনের মধ্যে দেখা হওয়া বা কথা বলার কোন সুযোগ ছিল না। খাওয়ার সময় কয়েক মিনিটের জন্য সেলের দরজা খোলা হলেও বাকি ২৪ ঘণ্টা সেলের দরজা বন্ধই রইলো।

দুপুর বেলা লোহার থালায় করে খাবার দেওয়া হল। লোহার থালা এবং খাবারের চেহারা দেখে ঠিক করলাম—এ খাবার খাব না। সে কথা জানাতেই জমাদারসহ জেলর এল উর্দ্ধশ্বাসে দৌড়ে। জেলর বলতে লাগলো, না, না, আপনাদের জন্য এ থালা নয়। তারপর মেটকে দিল ধমক। আমাদেরকে আবার বললো, আপনাদের খাবার অন্য জায়গা থেকে এক্ষুণি নিয়ে আসা হচ্ছে। তারপর তৃতীয় শ্রেণীর কংগ্রেসী ভলাণ্টিয়ারদের রান্না থেকে আমাদের জন্য খাবার এল। বেঙ্গল জেলগুলোতে সদ্য প্রচলিত এল্যুমিনিয়ামের থালায় করে যে খাবার এল, দেখলাম, তা আগের

চেয়ে একটু পরিষ্কার। প্রায় ৬২ ঘণ্টা পর পেটে ভাত পড়লো।

সেদিনই জেলা ম্যাজিস্ট্রেট মিঃ স্টিভেন্স এলেন। জানালেন, আমাদের ব্যক্তিগত জিনিস ও টাকা পয়সাগুলি নিরাপদে রাখা হয়েছে। যদি কোন কিছু কিনতে হয় তা আমরা কিনতে পারবো।

একদিন দুদিন করে সময় বয়ে চললো। খাওয়া ও স্নানের সময়টুকু ছাড়া ২৪ ঘণ্টাই আমাদেরকে সেলের ভেতরে আবদ্ধ হয়ে থাকতে হত। চারিদিকের উঁচু দেয়ালগুলো রোদে ভরা দিনের আলো সেলের ভেতরে ঢুকতে দিত না। রাতে ঘুটঘুটে অন্ধকার। আর রোদভরা দিনের বেলা মনে হতো মেঘলা, মেঘলা। যেন বর্ষণ হবে। স্নান বা খাবারের সময় সেলের বাইরে রামকৃষ্ণের সঙ্গে দু-একটা কথা বলার সুযোগ করার চেষ্টা করতাম। সেপাইদের কড়া পাহারায় তিনটে সেলের মাঝখানে পার্টিশনের কাছে ঘেঁষাও অসম্ভব হয়ে যেত। তবু দু-একটা কথা বলার সুযোগ নিতে ত্রুটি করিনি। রামকৃষ্ণ ম্যালেরিয়ায় পড়লো। মাঝে মাঝে সুস্থ হয়ে উঠলেও আবার তার জ্বর হতে লাগলো।

প্রায় দিন আটেক পর জেল ডাক্তারবাবু একটু এদিক ওদিক চেয়ে চুপিচুপি আমাকে জানালেন যে আগের দিন ৭ই ডিসেম্বর কলকাতার রাইটার্স বিল্ডিংয়ের তেতালার লিফটে চড়ে তিনজন যুবক জেল ইন্সপেক্টর জেনারেল সিমসন সাহেবকে হত্যা করেছে। আর একজন সাহেব মারাত্মকভাবে আহত হয়েছে। যুবক তিনজনের দু'জন সেখানেই বিষপানে আত্মহত্যা করেছে। অপরজন আত্মহত্যা করতে গিয়ে গুলিবিদ্ধ হলেও মরে নি, হাসপাতালে আছে। বেঁচে গেছে শুনে ভাল লাগলো। কিন্তু পরক্ষণেই এই ভেবে আবার খারাপ লাগলো যে, বাঁচিয়ে তুললেও ইংরেজরা আবার তাকে মারবে। এক ঝলক আলোর পাশে এক ফালি অন্ধকারের মত মনে হল ব্যাপারটা। তারপর আমাদের নিজেদের কথা ভেবে আফসোসে মনটা আচ্ছন্ন হয়ে গেল। লোম্যান গেছে, সিমসন গেছে। আহ্, যদি ক্রেইগটাও যেত! তিন মাসের মধ্যে তিনজন ইসপেক্টর জেনারেলকে গুলির মুখে ধরাপৃষ্ঠ থেকে বিদায় দিতে পারলে ইউরোপীয়দের কলজের কাঁপুনিটা আরও ভয়ানক হত, অন্যদিকে জোরদার হত বিপ্লবী স্বাধীনতা আন্দোলন। তবু যে লোম্যান ও সিমসনকে হত্যা করা হয়েছে তার প্রভাবও কম নয়। বেদনার্ত অন্তর থেকে শহীদের উদ্দেশে বেরিয়ে এল স্বতঃস্ফূর্ত অভিনন্দন। তাদেরকে মনে মনে সালাম জানালাম।

এর দু'একদিন পর এক বিকেল বেলা প্রায় চারটার সময় আমাদের দু'জনকে সেল থেকে বের করে জেল গেটের সামনে খোলা জায়গায় নিয়ে আসা হল। প্রায় শ'খানেক কংগ্রেস ভলান্টিয়ারকে দেখলাম। বুঝতে

বাকি রইলো না যে, আমাদের নিয়ে আসা হয়েছে শনাক্তীকরণের জন্য। কংগ্রেস ভলান্টিয়ারদের সাথে আমাদের মিশিয়ে দিয়ে সারিবদ্ধভাবে দাঁড় করানো হল। কয়েক মিনিটের মধ্যেই শনাক্তকারীরা একজন একজন করে আমাদের দু'জনকেই শনাক্ত করলো। ষষ্ঠ ব্যক্তিকে দেখে আমার মনে হল, একে যেন কোথায় দেখেছি। তখনি মনে পড়ে গেল, এ হল চাঁদপুর স্টেশনের সেই টিকেট কালেক্টর যে পুলের গোড়ায় দাঁড়িয়ে আমাদের টিকিট নিয়েছিল। পরে শুনেছিলাম এর নাম রজনী বাবু। তিনি আমাদের দিকে তাকিয়ে বললেন যে, তিনি কাউকেই চিনতে পারছেন না। মনে হল, আমাদের তো ওর না চেনার কথা নয়। কারণ, আমাদের কাছ থেকে যখন তিনি টিকেট নেন তখন আশেপাশে কেউ ছিল না। সম্ভবত ব্রিটিশ বিরোধী জাতীয় আন্দোলনের ছোঁয়াচ তাঁর মনটাকে নাড়া দিয়ে গেছে। তাই তিনি আমাদেরকে চিনতে না পারার ভাণ করছেন। মন খুশিতে ভরে উঠলো।

আলিপুর জেলে

প্রায় ২৬ দিন পর একদিন গভীর রাতে হঠাৎ সেলের দরজা খুলে গেল। জেলর, ডেপুটি জেলর, জমাদার ইত্যাদি সকলেই এসে হাজির। আমাদের দু'জনকে নিয়ে আসা হল জেল গেটে। জনা বিশেক সশস্ত্র পুলিশ ও একজন গুর্খা হাবিলদার আমাদের জন্য অপেক্ষা করছিল। আমাদের দু'জনকে হাতকড়া পরিয়ে গেটের বাইরে আনা হল। আমাদেরকে মাঝখানে রেখে সামনে ও পেছনে গার্ডের প্রহরায় স্টেশনে নেওয়া হল। তারপর ট্রেনে উঠানো হল। ভেবেছিলাম, আমাদের চাটগাঁয় নেওয়া হচ্ছে। ভুল ভাঙ্গলো যখন গাড়ি এসে পৌঁছলো চাঁদপুর স্টেশনে। এই সেই চাঁদপুর। এখানে ঐ প্ল্যাটফরমটিকে আমরা ক্রেইগ ভেবে তারিণীর রক্তে লাল করেছি। ক্রেইগ প্রাণে বেঁচে গেল আর আমরা বন্দী। ব্যর্থতার ব্যথা মনের ভেতরে গুমড়ে মরতে লাগলো।

আমরা ঘাটের দিকে এগিয়ে গেলাম এবং গোয়ালন্দগামী স্টিমারে উঠলাম। চারদিকে বর্ডন দেওয়া একটা জায়গায় আমাদের বসতে দেওয়া হল। অন্যরা আমাদেরকে ঘিরে বসলো। সামনে রাইফেল হাতে একজন মোতায়েন রইলো গার্ড হিসাবে। তন্দ্রায় ঝিমুতে ঝিমুতে এক সময় সকাল হল।

চোখের সামনে ভেসে উঠলো তরঙ্গসঙ্কুল পদ্মার জলরাশি। সকালের সূর্যের আলোয় শত-সহস্র তরঙ্গ ঝলমল করছিল রূপালি ঝলক দিয়ে।

কখনো তা মনে হচ্ছিল কোটি কোটি স্বর্ণকণার মতো। কী সুন্দর! কী অপূর্ব!

কী বিশাল এই পদ্মা নদী। এই প্রথমবার এর সঙ্গে পরিচয় হল। একে ঘিরে কত কাহিনী, কত না উপাখ্যান গড়ে উঠেছে। একদিকে পদ্মা ধ্বংস করে চলেছে জনপদ, লোকালয়, অন্যদিকে তা আবার জন্ম দিচ্ছে নতুন ভূখণ্ড। ধ্বংস ও সৃষ্টির আবর্ত চলেছে হাত ধরাধরি করে। পূর্ব বাংলা শস্য-শ্যামলা হয়ে উঠেছে। পুরনো, জীর্ণ যা-কিছু সব বিলীন হয়ে যাচ্ছে। ধ্বংস আর সৃষ্টি — প্রকৃতির এই অমোঘ নিয়মে পদ্মা শৃঙ্খলিত।

আমরাও কি তাই নই? তূর্য-নিনাদে ধ্বংসের বিষাণ ফুঁকড়ে চলেছি আমরা ওই পদ্মারই তীরে তীরে। বাংলার ঘরে ঘরে কত বীরের হাতেই না ঐ বিষাণ রুদ্র গর্জনে বেজে উঠেছে। কতজন প্রাণ দিল। আজ তাদের হাতের বিষাণ তুলে নিয়েছি আমরা। বিষাণ বাজছে রক্ত নিতে আর দিতে।

হয়তো কয়েকদিন পরে ফাঁসির মঞ্চ থেকে আমারও রক্ত ঝরে ঝরে পড়বে টপ্ টপ্ করে। রক্ত নিয়েছি বলে রক্ত দিতেও যাচ্ছি।

এভাবে রক্ত নিতে ও দিতে এগিয়ে আসছে হাজার হাজার মানুষ। এগিয়ে আসবে আরও অনেক অনেক দেশপ্রেমিক? ইংরেজ রাজত্বের ধ্বংসস্তূপের উপর গড়ে উঠবে সুখী সমৃদ্ধ স্বাধীন বাংলা, স্বাধীন ভারতবর্ষ। ধ্বংসের পর কি নতুন সৃষ্টি হবে না?

উৎসুক চোখে আমাদের চারপাশে জড়ো হওয়া যাত্রীদের প্রতি গার্ডের ধমক শুনে আমার চিন্তাসূত্র ছিঁড়ে গেল। পদ্মার বুক চিরে স্টিমার গোয়ালন্দের দিকে এগিয়ে চলেছে। বেলা প্রায় তিনটায় আমরা গোয়ালন্দ ঘাটে নেমে শিয়ালদা অভিমুখী ট্রেনে উঠলাম।

ফরিদপুর অতিক্রম করে ট্রেন এগিয়ে চলেছে কুষ্টিয়ার দিকে। স্টেশনের পর স্টেশনে ট্রেন থামছে। আবার এগিয়ে চলেছে। স্টেশনে স্টেশনে কত না বিচিত্র লোকের ভিড়। অন্ধ, খঞ্জ, গরিব, ধনী সব রকমের লোককে দেখা গেল। দেখলাম মূল্যবান পোষাকে সজ্জিত ভদ্রলোকদের। লজ্জা ঢাকবার ব্যর্থ-প্রয়াসী লোকের সংখ্যাও কম দেখলাম না। সন্তান কোলে অশ্রুবিগলিত বুভুক্ষু মেয়েদেরও দেখলাম। ওরা হাত পাতছে শুধু একটা পয়সার জন্য। গ্রাম বাংলার বিচিত্র মানুষের জীবনের ছবিটি স্টেশনে স্টেশনে আমার চোখের উপর ভেসে উঠলো।

শেয়ালদা স্টেশনে গাড়ি এসে থামলো। প্রিজনভ্যান তৈরি হয়েই ছিল। আমাদের দুজনকে ভ্যানে উঠানো হল। শোঁ শোঁ করে ভ্যান গাড়ি এগিয়ে চললো আলিপুর জেলখানার দিকে। ভেতরে আমরা যেন

অসূর্যম্পশ্যা—বাইরের কিছুই দেখতে পারছি না, আমাদেরকেও কেউ দেখতে পারছে না।

আধঘণ্টার মধ্যে আলিপুর সেণ্ট্রাল জেলের সামনে এসে গাড়িখানা থামলো। আমরা নামার পর পরই জেলগেট খুলে গেল। আবার কারাগারের ভেতরে ঢুকতেই গেট বন্ধ হল।

জেলরের কাছে খবর পৌঁছতেই হন্তদন্ত হয়ে হাজির হল আইরিশ জেলর। তার হাতে আমাদের দু'জনকে সঁপে দিয়েই হাবিলদার বেরিয়ে গেল। জেলর আমাদের নিয়ে গেল ১৩ নং ওয়ার্ড সেলে। ওখানে ছিলেন অস্ত্র আইনে ধৃত আরও তিনজন বিচারাধীন রাজনৈতিক বন্দী। পরদিন সকালে তাদের সঙ্গে বেশ জমাট আলাপ হল। ভাবলাম এখানে সময়টা বেশ ভালই কেটে যাবে। কিন্তু একটু পরেই সে আশা ভাঙ্গলো। বেলা ৮ টার সময় ১৪ নম্বর সেল ওয়ার্ডে আমাদের দুজনকে স্থানান্তরিত করা হলো। ওখানে সিমসন হত্যার কারণে বন্দী আহত দীনেশ গুপ্ত একা ছিলেন। আমাদের দু'জনে মিলে সেখানকার বাসিন্দা হলাম মোট তিন জন।

সারিবদ্ধ ১৪টি সেল। তার সামনে 'এণ্টিসেল'। স্নানাহার ওখানেই চলে। ঐ এণ্টিসেলের সামনে হাত তিনেক চওড়া লম্বা বারান্দা সেলগুলোর সামনে দিয়ে বরাবর চলে গেছে। তার চারপাশে প্রাচীর বেষ্টনী। একমাত্র জমাদারের হাঁক-ডাক ছাড়া বাইরের কোন শব্দ শুনবার জো নেই। সার্জেণ্ট ও জেল সেপাই চব্বিশ ঘণ্টা নিরন্তর পাহারায় মোতায়েন। তবে কুমিল্লার জেলের মত এখানে সর্বক্ষণ বন্ধ থাকতে হল না। প্রত্যেক দিন দুপুরে এক ঘণ্টা এবং সূর্যাস্ত থেকে পরদিন ভোর পর্যন্ত কেবল সেলে আবদ্ধ থাকতে হয়। অন্য সময় সেলের বাইরে সেল ওয়ার্ড এলাকার মধ্যে ঘোরাফেরা করা চলত।

শারীরিক অসুস্থতার জন্য রামকৃষ্ণ ভোরে উঠতে পারতো না। দীনেশ গুপ্ত ও আমি একত্রে ঐ সময়টুকু লম্বা বারান্দায় পায়চারি করতাম। দীনেশ গুপ্ত ছিলেন বেঙ্গল ভলাণ্টিয়ার দলের একনিষ্ঠ কর্মী। সিমসনকে হত্যা করে নিজে মারাত্মক বিষ পটাসিয়াম সায়ানাইড খেয়ে এবং গলায় গুলি চালিয়ে আত্মহত্যা করতে চেয়েছিলেন। তখনও তার ক্ষতের দাগটা শুকায় নি। ফাঁসি দেবার জন্য ওরা ওকে বাঁচিয়ে তুলেছে। তারপর বিচারের প্রহসন চলবে কিছুদিন। হুকুম হবে গলদেশে দড়ি লটকে মৃত্যু না হওয়া পর্যন্ত তাকে ঝুলিয়ে রাখা হবে। এর নাম হল ফাঁসি। উপনিবেশের জনগণকে দাবিয়ে-দমিয়ে রাখার জন্য ধূর্ত ইংরেজরা কতগুলো বাঁধাধরা আইন বানিয়ে রেখেছে। বিচারকরা ঐ আইনের বাঁধা সড়কে চলে।

এদিক ওদিক হবার জো নেই। কেবল সাম্রাজ্যবাদের স্বার্থ রক্ষায় প্রয়োজন পড়লে ঐ আইন নির্দ্বিধায় লঙ্ঘন করা হয়। এরই নাম বিচার। আইনের সামনে সবাই সমান—এই গালভরা বুলির আড়ালে রয়েছে এক বিরাট ধাপ্পা। আসলে আইন ক্ষমতাবানদের স্বার্থে রচিত এবং তাদের স্বার্থই রক্ষা করে চলে। শ্রেণী বৈষম্যের সমাজে আইনের চোখে সব সমান হতে পারে না।

বিশেষ আদালতের সামনে

২৮শে ডিসেম্বর আমাদের মামলা শুরু হবার দিন ধার্য্য হল। রামকৃষ্ণের সঙ্গে আলোচনা করে ঠিক করলাম, মামলায় আমাদের আত্মপক্ষ সমর্থন করা উচিত। ফলাফল কিছু হয়তো হবে না। তবু লোকজনের কাছে এর প্রচারের গুরুত্ব তো কম নয়। কিন্তু কলকাতা আমাদের কাছে সম্পূর্ণ অচেনা জায়গা। এখানে আমরা কার সাহায্য পাব? অনেক ভেবে চিন্তে রামকৃষ্ণের পরিচিত উকিল বিনোদ বাবুকে একটা চিঠি পাঠালাম। তিনি অন্তত মামলার দিন যেন কোর্টে হাজির থাকেন, বা অন্য কোন ব্যবস্থা করেন।

২৮শে ডিসেম্বর। গার্ড পরিবেষ্টিত ভ্যানে করে আলিপুর কোর্টে আমাদের হাজির করা হল। পুলিশ ও সার্জেণ্ট ভরা কোর্ট। লৌহজাল দিয়ে ঘেরা ডকের ভেতর আমাদের দুজনকে ঢুকানো হল, যেন কোন হিংস্র জানোয়ারকে খাঁচায় ঢুকানো হচ্ছে। দেখলাম, সামনে হাত পনেরো দূরে একটু উঁচু প্ল্যাটফরমে তিনখানা চেয়ার ও একখানা টেবিল সাজানো রয়েছে। স্পেশাল ট্রাইবুনালে অর্থাৎ বিশেষ আদালতে হবে আমাদের বিচার। তিনজন বিচারক নিয়ে গঠিত সে আদালত। প্রেসিডেণ্ট ছিলেন ইউরোপিয়ান। নাম মিঃ গার্লিক। বিচারকদের আর দুজনের একজন ছিলেন হিন্দু, অন্যজন মুসলমান। এদের নাম আমার মনে নেই। যে উকিলকে চিঠি লিখেছিলাম, দেখলাম তিনি এসেছেন। আরও দু'জন ব্যারিস্টারও এসেছেন। একজন মেঘনাথ মিত্র, অন্যজন বি. সি. চৌধুরী। দু'জন আমাদের পক্ষ সমর্থন করবেন। জানতে পারলাম দেশগৌরব সুভাষ বসুই এদের দু'জনকে নিয়োগ করেছেন। অপ্রত্যাশিত আনন্দে বুক ভরে গেল। মনে মনে ধন্যবাদ ও কৃতজ্ঞতা জানালাম তাঁকে।

একটু পরে বিচারকের কালো গাউনে গা ঢেকে মিঃ গার্লিক এসে বিচারকের আসনে বসলেন। অন্য দু'জন বাঙালি বিচারকও আসন নিলেন। পাবলিক প্রসিকিউটর নগেন ব্যানার্জি শুরু করলেন তাঁর নাটকীয় পালা। স্বর কখনো উঁচুতে তুলছেন, কখনো নিচে নামাচ্ছেন, যেন চুপি চুপি কথা কইছেন। নানা ভঙ্গিতে অঙ্গভঙ্গি করে তিনি ঘটনার রোমাঞ্চকর লোমহর্ষক

বর্ণনা দিলেন। তাঁর কণ্ঠে ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদের স্বার্থ সংরক্ষণের জন্য গভীর উৎকণ্ঠা ফুটে উঠলো। স্পষ্টত তিনি নৃশংস নারকীয় হত্যাকাণ্ডের আসামীদের জন্য ক্ষমাহীন প্রতিশোধমূলক শাস্তি দাবি করলেন। আমা-দেরকে তিনি নির্দয়, নিষ্ঠুর, অতি বিপজ্জনক দুশমন বলে অভিহিত করতে ছাড়লেন না। মামলার গুরুত্ব বোঝানোর জন্য বক্তৃতার মাঝখানে তারিণীর রক্তাক্ত পোষাক বিচারকদের সামনে হাজির করা হল। দেখলাম রক্তরঞ্জিত জামা ফুটো ফুটো হয়ে গেছে। ওটা দেখে বিচারকমণ্ডলী আমাদের দিকে একনজর তাকিয়ে দেখলেন।

মামলা চলতে লাগলো। একদিন সরস্বতী পুজো উপলক্ষে রাজবন্দীরা উৎসব করছিল ২নং ওয়ার্ডে। বিকেল প্রায় পাঁচটার সময় আইরিশ জেলার সাহেব এসে আমাদের নিয়ে গেলেন দু'নম্বর ওয়ার্ড বা স্পেশাল ওয়ার্ডে। সেখানে যাওয়া মাত্রই প্রায় ৩০-৪০ জন রাজবন্দী আমাদের চারপাশে জড়ো হলেন। কথাবার্তা হল। কিছু খাওয়া-দাওয়াও হল। সুভাষ বাবু একান্তে ডেকে জিজ্ঞেস করলেন, হাইকোর্ট করবেন না কি? প্রয়োজনে করা উচিত। আরো কিছু কথা বলেছিলেন। সে-সব আজ আমার মনে পড়ছে না। তবে এটুকু মনে আছে যে তিনি বুঝতে পেরেছিলেন যে ফাঁসির দড়ি থেকে আমাদের বোধহয় রেহাই নেই। পরে জানতে পেরে-ছিলাম সে দিন পুজোর অছিলায় জেলরকে বশ করে আমাদের সাথে দেখা করার সুযোগ তিনিই করে নিয়েছিলেন। তার সেই দরদমাখা কথা, অকৃ-ত্রিম বন্ধুসুলভ ব্যবহার কখনো ভুলবার নয়। তিনি আমাদেরকে গ্রহণ করেছিলেন একান্ত আপনার জন বলে। সত্যিকারের দেশপ্রেমিক বলে দেশপ্রেমের সঠিক মর্যাদা দিয়েছিলেন। আমরা মুগ্ধ না হয়ে পারি নি।

মামলা প্রায় প্রতিদিনই চলছিল। শুনানি, সওয়াল জবাব চলতে থাকলো। মাঝে মাঝে দিনগুলো মনে হতে লাগলো একঘেয়ে তবে বন্ধের দিন বেশ ভালো কাটতো। দু'জন বসে বসে গল্প গুজব করতাম। দেশের অবস্থা সম্পর্কে আলাপ করতাম। একদিন কী একটা বিষয় নিয়ে আমরা দু'জন গভীর আলাপে ডুবে আছি। হঠাৎ রামকৃষ্ণের অবাক-করা একটা কথায় আমি বেশ চমকে উঠলাম। সে বলেছিল, বিস্ফোরণে আহত হয়ে আমি অস্ত্রাগার দখলের সংগ্রামে অংশ নিতে পারি নি। ক্রেইগকে মারতে গিয়ে ব্যর্থ হলাম। সারাজীবন জেলবন্দী থেকে লাভ কি? এই অভিশপ্ত জীবনের বোঝা আমার সইবে না। আমার মনে হয় ফাঁসিই আমার জন্য ভাল। রামকৃষ্ণের ব্যথাভরা বেদনাসিক্ত কথাগুলো আমার সমগ্র সত্তাকে যেন আচ্ছন্ন করে ফেললো। স্তব্ধ হয়ে তার দিকে চেয়ে রইলাম। কিছুক্ষণ নীরব থেকে সে আবার বলতে লাগলো, যাবজ্জীবন দ্বীপান্তরে পচে মরার

চেয়ে ফাঁসির মঞ্চে জীবনের জয়গান গেয়ে মৃত্যুবরণ হাজার গুণে শ্রেয়। এ আত্মদান হাজারো তরুণের মনে প্রেরণা যোগাবে। দেশমাতার মুক্তির সংগ্রামে তারা অকাতরে ঢেলে দেবে বুকের তাজা রক্ত।

তার কথা শুনে আমার মুখের ভাষা থমকে গেল। কিছুক্ষণের জন্য অফুরন্ত দরদ ও সহানুভূতিতে প্রাণ আমার ভরে উঠলো। ভাবলাম দেশকে কতো নিবিড় করে ভালবেসেছে সে। তুলনাহীন সে ভালবাসা। কত দৃপ্ত তার স্বাধীনতার শপথ। অতুলনীয়, মহান, মৃত্যুহীন তার দেশপ্রেম।

মামলায় হাজিরা দিতে নিয়মিত কোর্টে আসা-যাওয়া করতে হচ্ছে। একদিন টেলিগ্রাম এল, রামকৃষ্ণের বাবা মারা গেছেন। খবরটা শুনলো সে। কিন্তু প্রিয়জনের এই বিচ্ছেদ তাকে খুব একটা বিচলিত করতে পারলো বলে মনে হল না। শুধু ধীরস্থিরভাবে আস্তে আস্তে আমাকে জানালো, তার বাবা মারা গেছেন। জানিনে বাইরে অবিচলিত ভাব দেখালেও অতি নিভৃতে তার চোখে দু'ফোটা অশ্রু জমা হয়েছিল কিনা। অনেকেরই সাক্ষ্য নেওয়া হল। হঠাৎ একদিন ক্রেইগ এল সাক্ষ্য দিতে। আশ্চর্য! সে আমাকে সনাক্ত করলো। সে বললো, সে আমাকে গুলি করতে ও ভরতে দেখেছে, আমি নাকি তাকে লক্ষ্য করে গুলি করেছি। কেবিনের মধ্যে লুকিয়ে থাকলে এবং না দেখতে পেলে তাকে কীভাবে গুলি করা সম্ভব হতে পারে? যে-আমি তাকে দেখিনি, সেই লোক কিনা জবানবন্দি দিচ্ছে আমি নাকি তাকে লক্ষ্য করে গুলি ছুঁড়েছি। মিথ্যারও একটা সীমা থাকে। বুঝতে পারলাম মিথ্যে দিয়েই ওরা নিজেদের রক্ষা করতে চাইছে। কিন্তু আমি জানি, এ মিথ্যার মসনদ একদিন ভাঙবেই।

খানিকক্ষণ পরে ডকের ভেতরে ঢুকে ব্যারিস্টার বি. সি. চৌধুরী আফসোস করে বললেন, আর তো আশা-ভরসা করতে পারছি নে। বললাম, "এ মামলার পরিণতি তো আপনাদের জানাই আছে। আপনার কর্তব্য আপনি সাধ্যমত করেছেন। সে জন্যে আমরা কৃতজ্ঞ। আর চিন্তা করবেন না। ক্রেইগ মিথ্যা বলে সনাক্ত না করলেও সাক্ষ্যপ্রমাণের জঞ্জাল ঠেলে এগুনো মোটেই সম্ভব নয়।"

সত্যিই ব্রিটিশ রাজ সব চেষ্টাই করেছিল। কুমিল্লা জেলে হয়েছে সনাক্তীকরণের কাজ। চাঁদপুর স্টেশনের প্ল্যাটফরমে পড়ে থাকা কার্তুজের খোল, রিভলভারের চেম্বারের ভেতরে ধোঁয়ার চিহ্ন, কোন রিভলভার থেকে কোন কার্তুজ বেরিয়েছে সে বিষয়ে অস্ত্র বিশেষজ্ঞদের মতামত সবই আছে। সবটা মিলে শুধু একটা পথেরই ইঙ্গিতই দিচ্ছিল—ফাঁসি।

শুনানি সওয়াল জবাব—সব শেষ হয়ে গেল। তারপর এল আমাদের জবানবন্দির পালা। ভাবছিলাম ভগৎ সিংহের মতো আমরা একটা বলিষ্ঠ

বিবৃতি দেব কিনা। ব্যারিস্টাররা নিষেধ করলেন। জবানবন্দি দেবার বেলায় প্রথমে এল রামকৃষ্ণের পালা। তাকে বিচারকের সামনে সাক্ষীর কাঠগড়ায় নেওয়া হল। মামুলি ধরনের ছু-একটা কথা বলে সে তার বক্তব্য শেষ করলো।

রামকৃষ্ণকে তার বয়স জিজ্ঞেস করা হলে সে জানিয়েছিল যে তার বয়স বিশ বছর। বিচারকেরা তার কথা বিশ্বাস করতেই চাইলো না। ওদের ধারণা, তার বয়স আরও বেশী। পরে তার ম্যাট্রিক সার্টিফিকেটের সন তারিখ জানানো হলে তারা বিশ্বাস করতে বাধ্য হল। ১৯২৮ সালের ম্যাট্রিক পরীক্ষায় রামকৃষ্ণ চট্টগ্রাম ডিভিশনাল স্কলারশিপ পেয়েছিল এ কথা বলায় তাদের আরও প্রত্যয় হল। আসলে রামকৃষ্ণের চেহারাটা এমন ধরনের ছিল যে দেখলেই বেশ বয়স্ক মনে হত। রোগে ভোগা সত্ত্বেও তাকে বেশ জোয়ান ও বলিষ্ঠ দেখাতো। সে ছিল ভাল স্পোর্টসম্যান, দক্ষ ফুটবল খেলোয়াড়। শ্মশ্রু-গোঁফ মণ্ডিত শক্ত পেশি ও সামর্থ্যপূর্ণ দেহ-গঠনের জন্য তার বয়স সম্পর্কে বিভ্রান্তি হত।

এরপর এল আমার পালা। বিচারকদের সামনে হাজির করা হল আমাকে। রামকৃষ্ণের বিবৃত কথাগুলোকে সমর্থন করে আমি আমার বক্তব্য শেষ করলাম। আমার বয়স বললাম সতেরো বছর। শুনে বিচারকেরা খানিকক্ষণ আমার দিকে তাকিয়ে রইলেন। তারপর তারা নিজেদের মধ্যে কী সব আলাপ করে নিলেন। সতেরো বছর বয়স ঠিক কিনা এটাই ছিল তাদের কাছে মহা চিন্তার বিষয়। অবশ্য তখন আমার চেহারা ছিল কিশোরের মত কচি। দাঁড়ি-গোঁফ কিছুই গজায় নি। অথচ বয়সে আমি রামকৃষ্ণের চেয়ে সামান্য বড় ছিলাম। শেষে বিচারকেরা আমার বয়স সতেরো বছর বলে মেনে নিলেন এবং বয়স পরীক্ষার হাত থেকে আমাকে নিষ্কৃতি দিলেন। আমাদের পক্ষের ব্যারিস্টাররা আরও একটা কথার উপর জোর দিলেন। তারা জানালেন, আমি সংস্কৃত টোলের ছাত্র, আধুনিক ভাবধারায় আমার শিক্ষা হয় নি। কারো ইঙ্গিতে ঝোঁকের মাথায় এ ধরনের কাজ করে ফেলেছি।

ফাঁসি ও দ্বীপান্তর দণ্ড

রায় দেবার দিন এগিয়ে এলো। ২৪শে জানুয়ারী, ১৯৩১, শনিবার। ছুপুর বেলা আমাদের ছু'জনকে কোর্টে হাজির করা হল। আই. বি. এবং পুলিশে কোর্ট ভর্তি। আমাদেরকে ডকের ভেতরে ঢুকানো হল। চারপাশে সশস্ত্র পাহারা মোতায়েন। ট্রাইবুনালের প্রেসিডেন্ট আমাদের

বিরুদ্ধে অভিযোগ ও প্রমাণাদির বিস্তৃত বিবরণ ও ব্যাখ্যা দিলেন। আদালতের আনুষ্ঠানিক আনুষঙ্গিক বিষয়গুলো সমাপ্তির পর ঘোষণা করা হল মামলার রায়। রামকৃষ্ণকে দেওয়া হল মৃত্যুদণ্ড। গলায় দড়ি ঝুলিয়ে হত্যা করা—ফাঁসি। আদালত আমার সম্পর্কে তাদের রায় ঘোষণার সময় বললো, আদালতের মত হল বিধিগতভাবে আমাকেও মৃত্যুদণ্ড দেওয়া। তবে বিঘ্ন ঘটিয়েছে আমার বয়স। ১৮ বছর বয়সের নিচে ফাঁসি দেওয়া আইন-বহির্ভূত। তাই আমাকে দেওয়া হল যাবজ্জীবন কারাদণ্ড।

রামকৃষ্ণের চোখে-মুখে ফুটে উঠলো হাসির ঝিলিক। আমার কাছে এসে সে আমাকে বুকে জড়িয়ে ধরলো। অকৃত্রিম দরদের ছোঁয়া পেলাম। ধীরে ধীরে সে বললো, "দু'জনের মধ্যে একজন যে বেঁচে গেলাম, এই তো বিরাট লাভ। তুমি কোনমতে রক্ষা পাও—এ আমি মনে মনে চেয়েছিলাম।"

মনে হল, শোক, দুঃখ, আনন্দের অতীত হয়ে গেছি। স্তব্ধ হয়ে নিথর পাথরের মত দাঁড়িয়ে রইলাম।

আমাদের ব্যারিস্টার দু'জন ডকের ভেতরে এলেন। তারা হাইকোর্টে আপিল করার ব্যাপারে কথা তুলতেই রামকৃষ্ণ জানালো, তার জন্য যেন হাইকোর্টে আপিল করা না হয়। তা হলে সব ভণ্ডুল হয়ে যাবে।

নিজের জন্য তার কোন চিন্তা নেই। আমি যে বেঁচে গেছি, তাতেই সে মহাখুশি। ফাঁসির মঞ্চে সে দেশমাতৃকার বন্ধন মুক্তির জয়গান গেয়ে মৃত্যুকে অসংকোচে জয় করবে। নিজের জীবন তার কাছে তুচ্ছ। সে ভাবছে অন্যের কথা। অন্যের জীবন বাঁচাতেই তার সবচেয়ে বেশি আনন্দ। ব্যক্তি বাদ দিয়ে সে ভাবছে সমষ্টির কথা। তাকে দেখে মনে হল, বিপ্লবী আদর্শের এক মূর্তিমানরূপ আমার সামনে দাঁড়িয়ে আছে।

অন্য দিনের মতই সশস্ত্র প্রহরী-বেষ্টিত প্রিজন ভ্যানে করে সেণ্ট্রাল জেলে এসে পৌঁছলাম। কিন্তু আজ যেন কেন অন্য রকম লাগছে। জেলের ভেতর ঢুকতেই প্রাণের ভেতর অনুভব করলাম বিচ্ছেদ বেদনা—কয়েক মুহূর্ত পরেই রামকৃষ্ণের সঙ্গে আমার ছাড়াছাড়ি হয়ে যাবে। চিরবিদায় নেবে রামকৃষ্ণ। নির্দিষ্ট ওয়ার্ডে আমাকে আলাদা করার জন্য যখন গার্ড এসে গেল তখন চোখ ভরে গেল অশ্রুর প্লাবনে। তার হাত দুটো হাতে নিয়ে বললাম, ভাই, মহান তুমি। তোমাকে ভুলতে পারি না, ভুলবো না।

ভুলি নাই রামকৃষ্ণকে। সাম্রাজ্যবাদী শিকল ছিঁড়ে স্বাধীন হয়েছে দেশ। ব্যথা লাগে মনে, স্বাধীন জাতির ইতিহাসে রামকৃষ্ণ কেন অনুপস্থিত। সে দিন কত দূরে যখন স্বাধীনতা সংগ্রামের অগ্নিযুগের ইতিহাসে সে শ্রদ্ধার আসন পাবে।

গেটের ভেতর দরজাটা সশব্দে খুলে গেল। জমাদার আগে আগে

চলছে। পেছনে পেছনে চলছি আমি। পাশে এক ওয়ার্ডের সামনে যেতেই দরজা খুলে গেল। ঢুকলাম ৩নং ওয়ার্ডের বোম ইয়ার্ডে। পান্না বাবু পায়চারী করছিলেন। তিনি হাত ধরে দোতলার এক প্রান্তে অপেক্ষমান রাজনৈতিক বন্দীদের কাছে নিয়ে গেলেন। আমাদের দু'জনেরই ফাঁসি অবধারিত মনে করছিলেন তাঁরা। ফাঁসি সেলে নেবার সময় শুধুমাত্র এক পলক দেখবার জন্যই সকলে দাঁড়িয়ে অপেক্ষা করছিলেন বারান্দারই এক প্রান্তে। আমাকে দেখে তারা খুবই আশ্চর্য হলেন। খুশি ও আনন্দে ওয়ার্ডটা গুলজার করে তুললেন।

সূর্য অস্তমিত। গোধূলির আলো-আঁধারের খেলা চলছে। একটু পরেই সন্ধ্যা নামবে। অদূরে ফাঁসির ওয়ার্ডে যেন রাজকীয় সম্মানে ঢুকিয়ে দেয়া হল রামকৃষ্ণকে। তার গায়ে নতুন জামা ও জাঙ্গিয়া।

হাইকোর্টে আপিল চললো। রায় রইল বহাল। প্রিভি কাউন্সিলে মামলা উঠলো। চললো মাসের পর মাস। ডালহৌসী স্কোয়ার বোমার হামলায় যাবজ্জীবন দ্বীপান্তর দণ্ডে দণ্ডিত ডাঃ নারায়ণ রায় (পরে হাই-কোর্টে সাজা কমে ১৪ বছর হয়) ও ময়মনসিংহের প্রতুল ভট্টাচার্যের প্রচেষ্টায় ও ব্যক্তিত্বের প্রভাবে আইরিশ জেলর সোয়ান সাহেব এক নির্জন দুপুরে আমাকে গোপনে রামকৃষ্ণের সাথে দেখা করতে নিয়ে গেলেন। জেল আইনে কাজটা অত্যন্ত বে-আইনী। ধরা পড়লে জেলরের শুধু চাকরিই খতম হবে না, গুরুতর শাস্তিও ছিল অনিবার্য।

ফাঁসির ওয়ার্ডে ঢুকলাম। প্রথম সেলে ছিলেন দীনেশ গুপ্ত। আগে তাঁর কাছেই গেলাম। লৌহ-কপাটে মোটা শিকগুলোর ফাঁক দিয়ে হাত বাড়িয়ে দিলেন। 'কেমন আছেন' জিজ্ঞেস করলেন আমাকে। হাত ধরে বললাম, 'ভালো আছি'। মনে হলো হৃষ্টপুষ্ট সুন্দর চেহারার অধিকারী দীনেশ গুপ্ত যেন আরও স্বাস্থ্যবান ও সুন্দর হয়ে উঠেছেন। মৃত্যুকে তিনি স্বাভাবিক বলে ধরে নিয়েছেন। তাই স্থান পায়নি কোন উদ্বেগ, কোন দুশ্চিন্তা। স্বাভাবিক নিষ্ঠা তার অটুট বিশ্বাসের পর্বত সদৃশ স্থৈর্য্য। বৈপ্লবিক নিষ্ঠা ও দৃঢ়তা দেখে মুগ্ধ হলাম! মৃত্যু হয়ে গেছে তুচ্ছ তার কাছে। কত মহানই না মনে হচ্ছিল তাঁকে। জেলর তাড়া দিতে লাগল। দীনেশ গুপ্তের হাতটা ছেড়ে দিলাম। মনে মনে জানালাম বিপ্লবী অভিবাদন। বিদায় নিয়ে শেষ সেলের কাছে গিয়ে দাঁড়ালাম।

রামকৃষ্ণের সেলের সামনে এসে দাঁড়াতেই দেখলাম, কম্বল পেতে রাম-কৃষ্ণ বই পড়ছে, আশেপাশে আরো কয়েকটা বই ছড়িয়ে আছে। আমাকে দেখে খুশি হয়ে বসতে বললো। বাইরের বন্ধ দরজার সামনেই বসে পড়-লাম। সে আমার দিকে লক্ষ্য করে বলল, "তোমার শরীর বেশ খারাপ

হয়ে গেছে দেখছি।" হাঁ-না কোন সাড়া দিলাম না, নীরবে তার বক্তব্যটুকু শুনতে লাগলাম। সে বলে গেল, "গত তিন মাসে যা পড়লাম, শিখলাম ও জানলাম তা ফেলে আসা সারা জীবনের চাইতেও বেশি, তুমিও পড়াশুনা করবে, দু'একটা ভাষাও শিখতে চেষ্টা করো। পড়াশুনা করে জেল জীবনের সময়টুকু কাজে লাগাবে।" রামকৃষ্ণ মৃত্যুর মুখোমুখি দাঁড়িয়ে, অথচ তার জীবন চলছে অত্যন্ত স্বাভাবিকভাবে। ভাবছি এ পড়াশুনা তার কি কাজে লাগবে! ভাবতেই যেন একটা ধাক্কা খেলাম। তার এই জ্ঞান আহরণতো তাকে অবচেতন স্তর থেকে চেতনার স্তরেই উন্নীত করে চলেছে। উপলব্ধি হয়ে উঠেছে তার গভীর। জ্ঞানের নতুন আলোকে আদর্শ হয়ে উঠেছে তার কাছে স্বচ্ছ ও সমৃদ্ধতর। হয়তো নতুন আলোকের সন্ধানও মিলেছে তার। জেলর তাড়া দিচ্ছিল তাড়াতাড়ি কথা শেষ করতে। রামকৃষ্ণ বললো, 'মা মারা গেছেন'— এ বলে সে তার হাতখানা বাড়িয়ে দিল লোহার শিকের মধ্যে দিয়ে। হাতখানা চেপে ধরলাম। মুখ দিয়ে একটা কথাও আর বের হল না। নিঃশেষে যে প্রাণ দিতে যাচ্ছে তাকে কিছু বলার ধৃষ্টতা যেমন ছিল না, বলার কোন কথাও খুঁজে পেলাম না। ব্যথিত মনের আকুলতা নিয়ে বিদায় নিলাম, বিদায় নিলাম চিরতরে।

এর কিছুদিন পর এক দুপুর বেলা হঠাৎ শুনতে পেলাম আমাদের বিশেষ আদালতের প্রেসিডেন্ট মিঃ গার্লিককে কোর্টে গুলি করে খুন করা হয়েছে। কলকাতার পার্টি শপথ নিয়েছিল, ফাঁসির আগে রামকৃষ্ণ ও দীনেশ যেন শুনে যেতে পায় যে গার্লিককে খতম করা হয়েছে। গার্লিক তাই রক্ষা পেল না।

শুনলাম, একদিন দুপুর বেলা গার্লিক বিচারাসনে বসে কোর্টের কাজ করে যাচ্ছিল। এক অজ্ঞাতনামা তরুণ কোর্টে ঢুকে গার্লিকের মাথা লক্ষ্য করে গুলি ছোঁড়ে, গুলির আঘাতেই গার্লিক ঢলে পড়ে। সাথে সাথে ঐ তরুণ যুবকটিও নিজের কপাল লক্ষ্য করে গুলি করে। নিজের ব্রহ্মতালু উড়িয়ে দিয়ে আত্মহত্যা করে।

যে জীবন মানুষের কাছে সবচেয়ে প্রিয়, যে জীবনকে বাঁচাতে মা পর্যন্ত ছেলের মুখের অন্ন কেড়ে নেয়, তেমনই এক তাজা প্রাণ যুবকটি আহুতি দিল। আত্মত্যাগের এমনি মহিমোজ্জ্বল দৃষ্টান্ত মানুষের বন্ধনমুক্তির সংগ্রামেই কেবল দেখা যায়।

আনন্দে ভরে গেল মন প্রাণ। কলকাতার পার্টির কথা ও কাজের মিল দেখে মনে মনে পার্টি ও শহীদ বন্ধুকে জানালাম সশ্রদ্ধ অভিবাদন।

মে মাস। প্রিভি কাউন্সিলও রায় বহাল রেখেছে। দীনেশ গুপ্তের ফাঁসি অনিবার্য। জুন আগত প্রায়। এক ভোরে বেলা চারটার সময় দীনেশ গুপ্তের ফাঁসি হয়ে গেল। সে রাতে রাজবন্দী ও রাজনৈতিক বন্দীরা কেউ ঘুমালো না। সেল থেকে বের করে যখন তাঁকে ফাঁসি মঞ্চের দিকে নিয়ে যাওয়া হচ্ছিল তিনি তখন বজ্রকণ্ঠে আওয়াজ তুললেন, 'ইনকিলাব জিন্দাবাদ'। তাঁর কণ্ঠে কণ্ঠ মিলিয়ে সকল রাজবন্দী গর্জে উঠলো, 'ইনকিলাব জিন্দাবাদ' 'বন্দে মাতরম'। সেদিন জেলের প্রতি ইটের টুকরো কেঁপে উঠেছিল ইনকিলাবের বজ্রধ্বনির আঘাতে আঘাতে। দীনেশের মৃতদেহ বাইরে নিতে দেয়া হল না। আত্মীয় স্বজনের হাতেও দেয়া হল না। ব্রিটিশ শাসকগোষ্ঠী ভয় করেছিল, দীনেশের মৃতদেহ পেলে এদেশের মুক্তিকামী মানুষেরা বের করবে শোক মিছিল, গড়ে উঠবে ব্রিটিশ বিরোধী তীব্র আন্দোলন। ঘুমন্ত মানুষের মনেও অঙ্কুরিত হবে ব্রিটিশ বিরোধী তীব্র বিক্ষোভ। গণমনের বিক্ষোভ শেষে বিদ্রোহের পথে হবে অগ্রসর। তাই তাকে দাহ করা হল জেলের চৌহদ্দির ভেতরেই। দাহ করা হল আত্মীয় স্বজনের অন্তরালে, লোকচক্ষুর বাইরে।

এবার রামকৃষ্ণের পালা। সর্বোচ্চ বিচারালয় প্রিভি কাউন্সিল হাইকোর্টের রায় বহাল রাখল। হাইকোর্ট বা নিম্ন আদালতের রায় বিলাতের প্রিভি কাউন্সিলের চোখে হল অসহনীয়। ফাঁসি হল অনিবার্য। পুনঃ পুনঃ ম্যালেরিয়ায় আক্রান্ত হচ্ছিল বলে রামকৃষ্ণের ফাঁসি দু দু'বার স্থগিত রাখতে হয়েছিল। ফাঁসি দেয়ার বিরুদ্ধে বাইরে তখন আন্দোলনের ঢেউ উঠেছে, সম্পাদকীয় স্তম্ভে ফাঁসি মওকুফের জন্য জোর দাবি উঠলো। ব্রিটিশ সরকারের সমালোচনায় পত্রিকাগুলো হল মুখর। জনসাধারণের মনেও সঞ্চারিত হল অসন্তোষ। সরকারও একটু একটু আতঙ্কগ্রস্ত হয়ে পড়লো। ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদী সরকারের ভিত্তিভূমি ছিল লৌহ কঠিন 'আমলাতন্ত্র'। পীড়ন ও শোষণ অবাধে চালাবার মন্ত্রে দীক্ষিত সকল আমলারা। জনতার প্রাণের দাবি, জনতার অন্তরের কথা শুনবে কেন? সব দাবি হল পদদলিত। ফাঁসির দিন নির্ধারিত হল। গোপনেই তাকে ফাঁসি দেওয়া হবে। সব গোপনীয়তার প্রাচীর ভেদ করে আমাদের কাছে খবর এলো, রাত বারোটায় হবে তার ফাঁসি। ব্রিটিশের আইন হলো, অসুস্থকে সুস্থ করে ফাঁসি দেওয়া। কিন্তু সে আইন অবহেলায় হল লজ্জিত, বে-আইনী পথে কর্তৃপক্ষ পা বাড়াল। কত হিংস্র সাম্রাজ্যবাদ!

আমরা সকল রাজবন্দী গভীর উৎকণ্ঠায় জেগে জেগে প্রহর গুণছি।

আমাদের ৩ নং ওয়ার্ডের সেল থেকে ফাঁসির মঞ্চটি দেখা যায়। বারোটার খানিক আগে রামকৃষ্ণের ফাঁসির মহড়া চলতে থাকে। দড়ি ঝোলাবার লোহার বীমগুলো প্ল্যাটফরমে লাগানো হল। রামকৃষ্ণের সমান ওজনের বালির বস্তা নিয়ে ফাঁসি দেবার পরীক্ষা-নিরীক্ষা চললো। মঞ্চটাও ঠিকঠাক করা হল। বিজলী বাতির আলোকে সব খুঁটিনাটি ঠিকঠাক আছে কিনা পরীক্ষা করে নেওয়া হল। হঠাৎ রামকৃষ্ণের কণ্ঠ শোনা গেল—'ইনকিলাব জিন্দাবাদ', 'বন্দে মাতরম' শব্দ ভেসে এল কানে। কারাগারের দেয়ালগুলো যেন চকিতে সচকিত হয়ে উঠলো। ঝড়ের আঘাত লাগা বৃক্ষের মতো কেঁপে কেঁপে উঠলো দেওয়ালগুলো। হাতে হাতকড়া, পায়ে বেড়ি। কালো কাপড়ের মুখোশ পড়িয়ে রামকৃষ্ণকে প্ল্যাটফরমে নিয়ে তোলা হল। রামকৃষ্ণ 'বন্দে' বলতে না বলতেই প্ল্যাটফরমের লিভার টেনে নেওয়া হল। গুড়ুম করে গুলির একটা শব্দও হল। আর চিরতরে নিস্তব্ধ হয়ে গেল রামকৃষ্ণের জীবন। দূর থেকে দেখলাম, ফাঁসির দড়িটা একটু একটু করে দুলছে।

সে রাতে বারোটা বাজার কিছু আগে থেকেই জেলের চারপাশে ঘোড়-সওয়ার সৈন্যদের মোতায়েন করা হয়েছিল। কলকাতার শাসকেরা আশঙ্কা করেছিল বিক্ষুব্ধ জনতা যদি জেলের ওপর চড়াও হয়! যদি অল্পক্ষণের জন্যও মাথাচাড়া দিয়ে ওঠে! যদি কোন অঘটন ঘটে যায়! তাই অসুস্থতা সত্ত্বেও গোপনে রাত বারোটায় রামকৃষ্ণকে ফাঁসি দেওয়া হল। তার মৃতদেহ যদি আবার আন্দোলনের ইন্ধন জোগায় তাই মৃতদেহ বাইরে দেওয়া হল না। দিনের আলো ফুটতে না ফুটতেই নিশীথ রাতের অন্ধকারে জেলের মধ্যেই শবদাহ হল।

দশ

দণ্ডিত জেল জীবনে

কোর্ট থেকে আমাকে দ্বিতীয় শ্রেণীর বন্দী করা হয়েছিল। সশ্রম দণ্ডে দণ্ডিত বলে কাজকর্ম ছিল অবশ্যকরণীয়। তবে দেশের তখনকার পরিস্থিতি এবং কর্তৃপক্ষের কিছুটা আতঙ্কজনক দুর্বল মনোভাবের দরুণ বন্দীদের শান্ত রাখার কৌশল হিসেবে কাজকর্মের ব্যাপারটা কাগজে কলমে ছিল। আমার নাম তালিকাভুক্ত ছিল তাঁতের কাজে। কিন্তু আদতে কাজ করতে হত না।

সাজার পরদিন ২৫শে জানুয়ারি সকাল বেলা ওয়ার্ডের সকলে একত্রে জনৈক আমেরিকান লেখকের 'রুশ বিপ্লব' বইখানি পড়ছিলেন। আমাকে প্রায় জোর করেই ঐ ক্লাশে নেয়া হল। বইখানি ইংরেজিতে লেখা বলে ক্লাশে যোগ দিতে দ্বিধা বোধ করছিলাম। বুঝতে বেশ অসুবিধা হচ্ছিল। তবুও শেষ পর্যন্ত ক্লাশে ছিলাম। এভাবেই জেলের মধ্যে পাঠচক্রের সঙ্গে জড়িত হয়ে পড়ি। পড়ার মাঝে যে আলোচনাটুকু হত মনোযোগ দিয়ে তা শুনতাম। কিছু কিছু বুঝতাম, আবার অনেক কিছু অবোধ্য থেকে যেত। ক্রমে সে সময় পড়াশুনার ইচ্ছেটা হয়ে উঠেছিল খুবই প্রবল। ইংরেজি ভাষা শেখার আকাঙ্ক্ষা হয়ে উঠেছিল দুর্বার। তাই উঠে পড়ে লেগে গেলাম।

জেলখানায় স্বাধীনতা দিবস

২৬শে জানুয়ারি সমগ্র দেশে পতাকা উত্তোলন, মিছিল ইত্যাদির মাধ্যমে স্বাধীনতা দিবস উদযাপিত হবে বলে কংগ্রেস থেকে আগেই প্রচার ও ঘোষণা করা হয়েছিল। জেলের ভেতরেও এ খবর এসে পৌছেছিল। আমরা কারাবন্দীরাও দিবসটি পালনের উদ্যোগ নিয়েছিলাম।

সেদিন সকাল বেলা দোতলার রেলিং-এর লোহার রড খুলে নিয়ে আমাদের লাল, নীল ও সবুজ রং-এর গায়ের চাদরগুলো তাতে বেঁধে

পতাকা উত্তোলন করা হল। পতাকার নিচে সিঁড়ির ধাপে ধাপে আমরা তেইশ জন রাজনৈতিক বন্দী পর পর লাইনবদ্ধ হয়ে দাঁড়িয়ে 'ইনকিলাব জিন্দাবাদ' 'স্বাধীনতা কি জয়' আওয়াজে জেলখানা কাঁপিয়ে তুললাম। জেলর এলো, এলো সুপারিন্টেণ্ডেণ্ট মেজর পাটনি। অনেক অনুরোধ-উপরোধ করলেন পতাকা নামিয়ে ফেলার জন্য। আমরা কিন্তু বেপরোয়া।

পতাকা উত্তোলন ইত্যাদি ছিল জেল আইনে ঘোরতর বে-আইনী কাজ, বিদ্রোহের সমতুল্য। অবশেষে ঢং ঢং করে পাগলা ঘন্টি বেজে উঠলো। হুইসেলের পর হুইসেলের শব্দে কানে যেন তালা লাগলো। ওয়ার্ডের বাইরের কয়েদিরা দৌড়ে স্ব স্ব ওয়ার্ডের ঘরের ভেতর ঢুকে পড়লো। সমস্ত ওয়ার্ডগুলো ঝটপট বন্ধ হয়ে গেল, যেন জেলে কোন কয়েদি নেই। সিপাহিরা যে যে অবস্থায় ছিল লাঠি হাতে দৌড়ে এসে ঢুকলো—কারো পরনে শুধু লেঙ্গুট, কেউ বা খালি গায়ে, কেবল ঠিক ছিল লাঠিটা। লাইন থেকে বের হয়ে আসা সশস্ত্র পুলিশ বাহিনী ওয়ার্ডের সামনে বাইরে লাইনবদ্ধভাবে দাঁড়িয়ে গেল। ঘণ্টা অবিরাম বেজে চললো। অবশেষে ইউরোপিয়ান ও এ্যাংলো ইণ্ডিয়ান সার্জেন্টের দল ব্যাটন হাতে আমাদের ওয়ার্ডে ঢুকে পড়লো—পেছন পেছন এলো জমাদার ও সিপাহিরা। জোর করে আমাদেরকে ঢুকিয়ে দেওয়া হল সেলের ভেতর। তারপর সেলবন্দী করা হল। দু'দিন সেলে আবদ্ধ থাকার পর তৃতীয় দিন পরিস্থিতি স্বাভাবিক অবস্থায় ফিরিয়ে আনা হল।

রুটিন মাফিক আমার পড়াশোনা চলছিল। প্রধানতঃ ইংরেজি শেখার ওপর জোর দিয়েছিলাম। উপন্যাস ও সাপ্তাহিক ইংরেজি পত্রিকাগুলো যথাসাধ্য পড়তে ও বুঝতে চেষ্টা করতাম। প্রত্যেক ইংরেজি শব্দের অর্থ অভিধানে দেখে নিতাম। একই শব্দ আগে পড়া সত্ত্বেও মনে থাকতো না। নিরলসভাবে অভিধান খুলে তা আবার ঠিক করে নিতাম। দৈনিক প্রায় দশ-বারো ঘণ্টা করে পড়া চলছিল। তত্ত্বগত বইগুলো পড়ে জানবার ইচ্ছে এত প্রবল হয়ে উঠেছিল যে মনে হতো ইংরেজি ভাষাটা যেন স্বল্প সময়েই আয়ত্ত করে ফেলি। অন্তত বুঝবার মত জ্ঞান অর্জন করি—এমন ইচ্ছে হতো।

ঐ সময় কর্তৃপক্ষ আমাদের কিছু সুযোগ সুবিধা তুলে নিয়েছিল। রামকৃষ্ণের ফাঁসির কিছুদিন পর কর্তৃপক্ষের এই তৎপরতার বিরুদ্ধে নয়দিন যাবৎ অনশন করতে হল। স্থানীয় কর্তৃপক্ষের অবশ্য ঐ সব সুবিধাগুলো দেওয়ার ক্ষমতা ছিল না। এমন কি প্রথম শ্রেণীর কয়েদিদের পক্ষেও সুবিধাগুলো স্থানীয়ভাবে পাওয়া সম্ভব ছিল না। অনশনের নয়দিনের দিন বেঙ্গল প্রভিন্সিয়াল কাউন্সিলের সভাপতি মহোদয় শ্রী সত্যেন

মিত্র, শ্রদ্ধেয় চারু বন্দ্যোপাধ্যায় ও তার স্ত্রী বিমল প্রতিভা দেবী অনশন ভঙ্গ করাবার উদ্দেশ্যে আমাদের সাথে সাক্ষাৎ করেন। তাদের একান্ত অনুরোধে আমরা অনশন ভঙ্গ করি। সেবার কেবলমাত্র জল খেয়েই নয়দিন কাটিয়েছিলাম। ঐ ছিল অনশনে আমার প্রথম হাতেখড়ি। পরে আরো অনেকবার অনশন করতে হয়েছিল।

একদিন সকাল বেলা আমরা কয়েকজন সেলের ভেতর বসে পত্রিকার অপেক্ষায় উন্মুখ হয়ে ছিলাম। তখনকার দিনে দৈনিক পত্রিকা দেওয়া হত না। 'সাপ্তাহিক সঞ্জীবনী' ও 'সাপ্তাহিক ইংলিশম্যান' বরাদ্দ ছিল। দৈনিকগুলো অবৈধ উপায়ে আনা হত। সেদিন পত্রিকা খুলতেই দেখলাম, বড় বড় হরফে লেখা—মেদিনীপুর স্কুল প্রদর্শনীতে জেলা ম্যাজিস্ট্রেট মিঃ পেডিকে হত্যা করা হয়েছে—কে বা কারা হত্যা করেছে এখনও তার হদিস পাওয়া যায় নি। ঐ সাফল্যের জন্য আমরা সকলে সেদিন এক অনাবিল আনন্দ পেয়েছিলাম।

সংস্কারের বাঁধন শিথিল হল

পড়াশোনার ভেতর দিয়ে দিনগুলো আমার কেটে যাচ্ছিল। জ্ঞানচর্চায় সিদ্ধি লাভের জন্য সাধনা করছিলাম। ছয়-সাত মাসে এতটা এগিয়েছিলাম যে, আজও ভেবে অবাক হয়ে যেতে হয়। এইচ. জি. ওয়েলস-এর 'পৃথিবীর ইতিহাস' বইটা যখন পড়তে শুরু করি তখন বুঝতে তত অসুবিধা হচ্ছিল না। পড়ে যাচ্ছিলাম 'ক্রমবিকাশ' বা বিবর্তনবাদ অধ্যায়টা। একেবারে নতুন বিষয় বলে আনন্দে যেন ডুবে যাচ্ছিলাম। কখনো কখনো হোঁচট খাচ্ছি, খটকাও লাগছে। পড়ার মাঝখানেই যেন কিলবিল করে এক একটা প্রশ্ন, এক একটা জিজ্ঞাসা মূর্তিমান হয়ে ওঠে। তবে কি আমাদের এই পৃথিবীখানা সূর্যের থেকে ছিটকে পড়া এক টুকরো পদার্থ? এই গাছপালা জীবজন্তু কি ভগবৎ সৃষ্ট নয়? অজৈব পদার্থ থেকেই কি জৈব পদার্থে পরিণতি? বিশেষ ধরনের বানর জাতি থেকেই কি মানুষের জন্ম—মানবজাতির উদ্ভব? বেদ কিংবা বিভিন্ন ধর্মশাস্ত্র সৃষ্টিতত্ত্ব সম্পর্কে যা' বলে তা' কি মিথ্যা? কল্পনাপ্রসূত? মিশরীয় দেব-দেবী অমিত্ররিস, ইপিস, হারমিজ ইত্যাদির চেহারা দেখে অবাক হয়ে যেতাম। হাসিও পেত। সাথে সাথে আমাদের দেব-দেবীদের চেহারাও চোখের সামনে ভেসে উঠতো। হাসি যেত নিভে। একই নিয়মে যে তারাও সৃষ্টি হয়েছে জেনে অবাক হয়ে যেতাম। দ্বন্দ্ব, উদ্বিগ্নতা, অতৃপ্তি যেন পেয়ে বসেছিল। অন্যান্য বন্ধুদের সাথে আলাপ-আলোচনা, তর্ক-বিতর্ক ইত্যাদি চলতো।

কেউ কেউ বলতেন—ঐগুলো নেহায়েত মানুষের কল্পনাপ্রসূত—বাস্তব ভিত্তি নেই। আবার কেউ কেউ বলতেন, ঐ ধরনের চিন্তা বা কল্পনার বাস্তব ভিত্তি আছে। ঐ ধরনের কল্পনা বা চিন্তা সে আমলের সামাজিক অবস্থার প্রতিফলন। নতুন একদিন পুরাতন হয়। পুরাতনগুলো সমাজের সাথে খাপ খাইয়ে চলতে না পারলে তা হয়ে ওঠে সংস্কার ইত্যাদি। শুনে যেতাম। অনেক কিছুই অস্পষ্ট ও অবোধ্য বলে মনে হত।

লৌহ বন্ধনে যে সংস্কার আমাকে আষ্টেপৃষ্ঠে বেঁধে রেখেছে—তা থেকে রেহাই পাওয়া কত কঠিন তা বুঝতে পারছিলাম। অবশেষে সংস্কারের বাঁধন হল শিথিল। অবচেতন স্তর থেকে ক্রমে যে চেতনার স্তরে উঠছি—তা ছিল আমার অগোচরে। পরে বাস্তবের মোকাবেলায় শুধু আমি আমাকে জানতে পেরেছিলাম।

রুশ বিপ্লবের ইতিহাস শুনতে ও পড়তে খুব ভালো লাগতো। পাঠ চক্রে সামান্যই জেনেছিলাম। সব ধরতে পারিনি। ট্রটস্কির লেখা ক্ষুদ্র সংস্করণের 'রুশ বিপ্লব' বইখানা পড়লাম। তাতে বিভ্রান্তিকর কিছু আছে কি না তা ধরতে পারিনি। চমকপ্রদ ঘটনাবলী শুধু জেনে গেছি। বাইরে আব্দুল হালিম কর্তৃক অনূদিত 'রুশ বিপ্লব' বইখানা পড়েছি। কিন্তু ব্যাপারটা হৃদয়ঙ্গম করতে পারিনি। কেনইবা ১৯০৫ সালের বিপ্লব ঘটলো, তারপর ১৯১৭ সালের ফেব্রুয়ারীর বিপ্লবইবা কেন সংঘটিত হল, আবার অক্টোবর বিপ্লবটাই বা কি? ঐ সবের মর্মার্থ তখনো বুঝতে পারিনি। শুধু ঐটুকুই বুঝেছিলাম যে, জারের অত্যাচার বা নিপীড়নের হাত থেকে রেহাই পাবার জন্য সংগ্রাম হয়েছিল ও রাজতন্ত্রের উচ্ছেদ সাধিত হয়েছিল। জেলখানায় বিশ্রামের অবকাশে চিন্তারও অবকাশ পেলাম। অন্যের সঙ্গে আলোচনার মাধ্যমেও অনেক কিছু স্পষ্ট হতে লাগলো। রুশ বিপ্লবের পর্যায়গুলো ক্রমে বুঝতে পারলাম। অনেক কিছু তখনও ছিল অস্পষ্ট ও ধাঁধাঁ জড়িত। রুশ দেশে শ্রমিক শ্রেণীই হল রাষ্ট্রের কর্ণধার, ধনিক নেই, জমিদার নেই—তাই শোষণও নেই। 'অর্থনৈতিক অসাম্য' অতীতের কাহিনীতে পর্যবসিত। অর্থনৈতিক, রাজনৈতিক সাম্য প্রতিষ্ঠিত।—এ সব কথা যেন মনে যাদু সৃষ্টি করত, মোহগ্রস্ত হয়ে কল্পনায় ডুবে যেতাম।

ডিনামাইট ষড়যন্ত্র মামলা

অক্টোবর মাসের দিকে চট্টগ্রাম থেকে ডিনামাইট ষড়যন্ত্র মামলায় সাজাপ্রাপ্ত কয়েকজন ট্রান্সফার হয়ে আলিপুর সেন্ট্রাল জেলে এল। তাদের গুরুতর সাজা হবার আশঙ্কাই ছিল বেশি। কিন্তু বিশেষ কারণে ছয়মাস থেকে

পাঁচ বৎসরের অধিক সাজা কারো হয়নি। জেলে বসেই সে-সব ঘটনার কথা শুনলাম। ঘটনাটা এই রকম:

দ্বিতীয়বার নতুন করে চট্টগ্রাম অস্ত্রাগার মামলা শুরু হওয়ার পর এই ঘটনা ঘটে। অনন্ত সিংহ, গণেশ ঘোষ, লোকনাথ বল প্রমুখ আরো অনেককে চট্টগ্রাম জেলে আবদ্ধ করে রাখা হয়েছিল। চট্টগ্রাম জেলকে সুরক্ষিত করে রাখার যতোগুলো পন্থা আছে সবগুলো অবলম্বন করা হল। জেলের বাইরে প্রাচীরের পার্শ্বে কাঁটাতার দিয়ে প্রায় সম্পূর্ণটাই ঘিরে দেওয়া হল। জেলের সাধারণ নিরাপত্তা ব্যবস্থা ছাড়াও একটি সামরিক ইউনিটের উপর অর্থাৎ 'ইস্টার্ণ ফ্রন্টিয়ার রাইফেল' বাহিনীর উপর নিরাপত্তা রক্ষার ভার দেওয়া হল। বাইরের নিরাপত্তা রক্ষার লক্ষ্যে জেলখানার চারপাশে ফৌজি ঘাঁটি বসানো হল। জেলের ভেতর অস্ত্রাগার সংক্রান্ত মামলার বিচারাধীন বন্দীরা যে ওয়ার্ডে থাকেন কারাগারের সাধারণ নিয়ম লঙ্ঘন করে সেই ওয়ার্ডের মধ্যেই দিনরাত্রির জন্য সশস্ত্র প্রহরার ব্যবস্থা করা হল। কলকাতার জেল থেকে বিশেষ ক'জন ইংরেজ ও ফিরিঙ্গি সেপাইকে চট্টগ্রাম জেলে পাঠানো হলো ঐ বিচারাধীন বন্দীদের অঙ্গন পাহারা দেয়ার জন্য। চট্টগ্রাম জেলার সিভিল সার্জন ছিলেন ভারতীয় এবং সাধারণ প্রথা ও নিয়মানুযায়ী তিনিই ছিলেন চট্টগ্রাম জেলের অধ্যক্ষ। কিন্তু তাঁকে সরিয়ে চট্টগ্রামের পুলিশ প্রধানকে জেলের অধ্যক্ষ মনোনীত করা হল।

এই পরিস্থিতিতে মাস্টার দা' স্থির করলেন বিচারাধীন বন্দীদের মুক্তির জন্যে চেষ্টা করার। জামিনে মুক্ত বিচারাধীন বন্দী অর্ধেন্দু গুহের মাধ্যমে কারাগারে আবদ্ধ নেতৃদ্বয়ের সাথে আলোচনা করে মাস্টার দা' সিদ্ধান্ত নিলেন, বন্দীদের মুক্ত করবার এই প্রচেষ্টা জেলের ভেতর থেকে করা হবে, বিস্ফোরণে প্রাচীর উড়িয়ে দিয়ে।

এই পরিকল্পনা অনুযায়ী অর্ধেন্দু গুহের প্রচেষ্টায় ক'টি আগ্নেয়াস্ত্র, বিদেশে প্রস্তুত অতি শক্তিশালী দু'ডজন 'ডিনামাইট', প্রায় আধমণ বিশেষভাবে প্রস্তুত বারুদ, প্রায় ৫০ গজ বিদ্যুতের তার, বেশকিছু পরিমাণ 'গানকর্টন' এবং অন্যান্য নানাবিধ প্রয়োজনীয় দ্রব্য গোপনে জেলখানার ভেতরে পাঠিয়ে দেওয়ার ব্যবস্থা হল। তারপর জেলের ভেতরে বিভিন্ন জায়গায় মাটির তলায় ঐ সকল অতি বিপজ্জনক ও নিষিদ্ধ দ্রব্যসমূহ পুঁতে রাখার ব্যবস্থা করা হল।

পরিকল্পনা হয়েছিল যে, যে সময় জেলের প্রাচীর উড়িয়ে দেয়া হবে ঠিক সেই সময়ই বাইরে থেকে ফৌজী ঘাঁটি ও ফৌজী প্রহরার ওপর নানা দিক থেকে যুগপৎ আক্রমণ চালানো হবে এবং সেই সময় ক'খানা মোটর গাড়ী বন্দীদের দ্রুত অন্য কোন নিরাপদ স্থানে নিয়ে যাওয়ার জন্য প্রস্তুত থাকবে।

ঠিক একই সময়ে চট্টগ্রাম জেলার প্রশাসনে অচলাবস্থা সৃষ্টির জন্য অত্যন্ত সতর্কতার সাথে এবং অতিশয় গোপনে অনেকগুলো 'ল্যাণ্ড মাইন' প্রস্তুত করা হয়েছিল। এই 'ল্যাণ্ড মাইন'গুলো ছিল বিশেষ ভাবে প্রস্তুত বারুদে ভর্তি। এক একটা 'মাইনে' প্রায় ১৫ সের বারুদ ছিল। চট্টগ্রামের প্রধান আদালত ভবনের যে অংশে বিভাগীয় কমিশনারের এবং জেলা ম্যাজিস্ট্রেটের অফিস, সেই অংশটি বিস্ফোরণে উড়িয়ে দেয়ার জন্য খুব গোপনে এবং অত্যন্ত সুকৌশলে আদালত ভবনের সেই অংশের নিচে মাটির তলায় দুটো বড় বড় 'ল্যাণ্ড মাইন' বসানো হয়েছিল। শহরের প্রায় কেন্দ্রে 'লাভ লেন' নামে যে রাস্তাটি দিয়ে সাধারণত সব সময়েই উচ্চ সরকারী ও সামরিক অফিসারেরা যাতায়াত করতো সেই রাস্তার তিনটি স্থানে মাটির তলায় তিনটি 'মাইন' বসানো হয়েছিল। এবং আস্কর খাঁর দীঘির ধারে একটি নির্জন জায়গায় একটি খালি বাড়ির ভেতরে ও বাইরে কয়েকটা স্থানে কয়েকটি 'ল্যাণ্ড মাইন' মাটির তলায় পুঁতে রাখা হয়েছিল।

এই 'মাইন'গুলোর প্রত্যেকটির সাথেই বৈদ্যুতিক তার ও ব্যাটারী সংযুক্ত ছিল যাতে বেশ দূরের এক একটা কেন্দ্র থেকে এক একটা 'মাইন'কে বিস্ফোরিত করা যায়। এই মাইনগুলো বসানো হয়েছিল রাত্রিবেলা সান্ধ্য-আইনে জন-মানবহীন নির্জনতার সুযোগে। অবশ্য প্রতিমুহূর্তেই টহলদার পুলিশ অথবা ফৌজের গুলিতে নিহত হবার আশঙ্কাও ছিল।

অসম সাহসী বিপ্লবী কর্মী অপূর্ব সেন (ভোলা), নিবারণ ঘোষ, সুশীল সেন, প্রফুল্ল মল্লিক, প্রমোদ দাশগুপ্ত (ভুলু), প্রভাত দত্ত, অরুণ দস্তিদার এবং আরও ক'জন অল্পবয়সী বালক মৃত্যুর প্রায় সুনিশ্চিত আশঙ্কা উপেক্ষা করে অতি সতর্কতার সাথে এবং সুকৌশলে সান্ধ্য আইন লঙ্ঘন করে দিনের পর দিন খেটে ঐ 'মাইন'গুলো বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ প্রকাশ্য স্থানে মাটির তলায় পুঁতে রাখার ব্যবস্থা করেছিল।

ঐ 'মাইনগুলো' প্রস্তুত করতে প্রায় ০ মণ বারুদের প্রয়োজন হয়েছিল। অনন্যসাধারণ বিপ্লবী কর্মী কালীকিঙ্কর দে, রাখালসখা বসাক, অনিল দে, অপূর্ব সেন (ভোলা), ফকির রায় চৌধুরী, সুশীল সেন, প্রফুল্ল মল্লিক, অনিল রক্ষিত, মধুসূদন গুহ, বেণু ঘোষাল, রবি সেন, চিত্ত সেন, বঙ্কিম মজুমদার এবং আরও কয়েকজনের অতি সতর্ক এবং একনিষ্ঠ চেষ্টার ফলেই খুব অল্প সময়ের মধ্যে এই বিপুল পরিমাণ বারুদ প্রস্তুত করা সম্ভব হয়েছিল।

কুমারী কল্পনা দত্ত, কুমারী সরোজিনী পাল, কুমারী নলিনী পাল, নিবারণ ঘোষ, ননী দাশ এবং আরও কয়েকজন খুবই বুদ্ধিমত্তা ও সাহসের সাথে বিস্ফোরক প্রস্তুতের জন্য কলিকাতা থেকে বিভিন্ন 'এসিড' ও অন্যান্য প্রয়োজনীয় দ্রব্য পুলিশের সর্তক দৃষ্টি এড়িয়ে কয়েকবার চট্টগ্রামে নিয়ে

এসেছিলেন।

নিশিকুমার দে চট্টগ্রাম শহরের দক্ষিণ প্রান্ত গোসাইর ডাঙ্গায় অবস্থিত তাঁর নিজের সমগ্র বাড়িটি বিস্ফোরক প্রস্তুত ও ল্যাণ্ড মাইন তৈরীর জন্য ব্যবহার করতে দিয়েছিলেন। তাছাড়া শ্রী রাখালসখা বসাক কর্ণফুলী নদীর অপর পারে তার বাড়িটিও এ কাজের জন্য দিয়েছিলেন।

ঐ দুটি পরিকল্পনার প্রস্তুতির প্রতিটি স্তরে সর্ববিধ সাহায্য এবং সহযোগিতা করেছে বিপ্লবী তরুণ শ্রীমান অর্ধেন্দু গুহ। জামিনে মুক্ত ছিল বলে সে প্রায়ই যথেষ্ট সতর্কতার সাথে এবং সুকৌশলে জেল থেকে সংবাদ নিয়ে পুলিশের সতর্ক দৃষ্টি এড়িয়ে গ্রামে মাস্টার দা'র কাছে পৌঁছে দিতে পারত এবং মাস্টার দা'র উপদেশ ও নির্দেশ অনুরূপভাবেই জেলের ভেতরে পৌঁছে দিত।

কিন্তু দুর্ভাগ্যক্রমে দুটি দুর্ঘটনার ফলে উভয় পরিকল্পনাই ব্যর্থ হয়ে যায়। একটি মে মাসের শেষে (১৯৩১) এবং অপরটি জুন মাসের প্রথমে। বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ স্থানে মাটির তলায় 'ল্যাণ্ড মাইন' দেখে এবং অতিমাত্রায় সংরক্ষিত জেলখানার ভেতরেও বিপুল পরিমাণ নিষিদ্ধ দ্রব্য দেখে সাম্রাজ্যবাদ এবং প্রশাসনিক আমলারা ভীষণ আতঙ্কিত হয়ে পড়েছিল।

বিপ্লব ভাবনায় দ্বন্দ্ব

আলিপুর সেন্ট্রাল জেলে আমাদের দিনগুলো একরকম কেটে যাচ্ছিল। এক বিকেল বেলা। অনন্ত দা'র সেলে আমি ও রণধীর দাশগুপ্ত আলাপ করছিলাম। সাধারণ কথাবার্তা এক সময় রাজনৈতিক আলাপে পরিণত হল। কিছুদিন ধরে আমার মনে নানা চিন্তা ঘুরপাক খাচ্ছিল। সেগুলো অনন্ত দা'র কাছে তুলে ধরতে চেষ্টা করলাম। কথাগুলো যেন ভেতর থেকে আপনা আপনিই বেরিয়ে আসছিল। অনন্ত দা'ও উৎকর্ণ হয়ে শুনে যাচ্ছেন দেখে উৎসাহিত হলাম।

স্বাধীনতার ব্যাপারটার সঙ্গে আরো গভীর ও ব্যাপক কিছু সমস্যা জড়িত বলে আমার ধারণা হয়েছিল। প্রথমে সেটাই বলতে চেষ্টা করলাম। বললাম আমার মনে হয় স্বাধীনতা লাভ করতে হলে কেবল হামলা, সন্ত্রাস, ইংরেজনিধন ইত্যাদির উপর নির্ভর করলে বোধ হয় আমরা সফল হব না। দুর্দান্ত ব্রিটিশ ঔপনিবেশিক সরকার উৎখাত করতে হলে দুর্বার গণ আন্দোলন ও গণ-সংগ্রাম দরকার। বললাম ব্রিটিশের হাত থেকে স্বাধীনতা ছিনিয়ে নিতে হলে হাজার হাজার শ্রমজীবী সাধারণ মানুষকে সংগঠিত করতে হবে। তাদের সংগ্রামী শক্তির স্রোতেই ব্রিটিশ সরকারকে তৃণের

মত ভাসিয়ে নেয়া যেতে পারে। অনন্ত দা' মনোযোগের সাথে আমার কথা শুনছিলেন দেখে তখন উৎসাহই পেলাম।

আন্দোলনের সাম্প্রতিক ঘটনাগুলো আমার চোখের সামনে ভাসছিল। তার দৃষ্টান্ত উল্লেখ করে বললাম যে কংগ্রেসী দেউলিয়াপনা এবং উচ্চস্তরের রক্ষণশীল নেতৃবর্গের ভূমিকা আন্দোলনকে অহিংস নীতির লৌহ কাঠামোতে সীমাবদ্ধ করে রাখতে চাইছে। এই কারণে আন্দোলন ব্যর্থ হতে চলেছে। তবে এটা পরিষ্কার বোঝা গেছে যে, আন্দোলনের পেছনের গণ-সমর্থন এবং গণশক্তির সম্ভাব্য বিস্ফোরণের আতঙ্কে ব্রিটিশ রাজ শঙ্কাগ্রস্ত। এরই ফলে হল গান্ধী-আরউইন চুক্তি ও গোল টেবিল বৈঠক। জেলের ভেতর কলকাতার গাড়োয়ান ধর্মঘটের গ্রেফতারকৃত নেতাদের সাথে আলাপ করে তাদের মুখে ঐ ধর্মঘটের ব্যাপকতা ও গভীরতা সম্পর্কে শুনেছিলাম। তার নজির টেনে বললাম, কলকাতার রাস্তায় রাস্তায় যে ব্যারিকেড গড়ে উঠেছিল তাতেই ব্রিটিশ সরকার অত্যন্ত আতঙ্কগ্রস্ত হয়ে উঠেছিল।

ইতিমধ্যেই রুশ বিপ্লবের ইতিহাস পড়ে যেসব তথ্য জেনেছিলাম তা থেকেও আমি কিছু দৃষ্টান্ত তুলে ধরতে চেষ্টা করলাম। বললাম, রুশ দেশের শ্রমিক ও কৃষকরা তাদের সংগঠিত শক্তির আঘাতে বিপ্লবের মাধ্যমে প্রথমে জারকে উচ্ছেদ করে পরে বুর্জোয়া শ্রেণীকে উৎখাত করে ক্ষমতা দখল করে আজ সুখী-স্বাচ্ছন্দ্যপূর্ণ জীবন গড়ে তুলতে চেষ্টা করছে। ঐ ভাবে অগ্রসর না হলে আমাদের দেশের জনগণের জন্যেও সুখী জীবন গড়ে তোলা সম্ভব হবে না। আসলে স্বাধীনতা সব নয়, স্বাধীনতার সাথে সাথে অন্য সব সমস্যা সমাধানের লক্ষ্য নিয়েও আমাদের এগুতে হবে। সেজন্য রুশ দেশের মত আমাদের দেশেও বিপ্লব অনিবার্য। তাই আজ থেকেই শ্রমিক কৃষকদের সংগঠন গড়ে তোলা আমাদের অবশ্যকর্তব্য বলে আমি মনে করি।

আমার কথা শোনার পর অনন্ত দা' একটু মুচকি হাসলেন। খানিকক্ষণ চুপ থেকে মন্তব্য করলেন, 'অস্ত্রাগার দখল ও জালালাবাদ যুদ্ধের রক্তরাঙা স্মৃতি, চাঁদ গুহ'র মৃত্যুর ভ্রূকুটি—ঐ সবই তোমার মধ্যে ঐ ধরনের চিন্তা-ধারার জন্ম দিয়েছে। মনে হচ্ছে, লেবার মুভমেন্টের দিকে তোমার গতি—এ হবেই, হওয়াটাই স্বাভাবিক।' বুঝলাম, আমি যেটা বাস্তব মনে করছি, উনি তাকে দুর্বলতার ফল বলে মনে করছেন। মনে মনে ধাক্কা খেলাম—বিস্মিত হলাম। ভেবেছিলাম, আমার সাথী-বন্ধুরা আমার ভাবনাকে, নতুন ভাবধারাকে গুরুত্ব দেবেন, ভাববেন। মনে মনে আশা করেছিলাম, তাঁরা হয়তো বা এ ভাবাদর্শকে গ্রহণ করবেন। কিন্তু তাঁরা আমার কথাকে শুধু প্রত্যাখ্যানই করলেন না, তাকে মানসিক দুর্বলতা বলে মিথ্যা তিরস্কার

করলেন। মনটা বিষণ্ণ হয়ে পড়লো। পরে ভেবেছি, সংস্কারপন্থী ভি. ভি. গিরিদের শ্রমিক আন্দোলন ও কমিউনিস্ট পরিচালিত শ্রমিক আন্দোলনের মধ্যকার পার্থক্য তখনকার দিনে তাঁর কাছে সুস্পষ্টভাবে ফুটে না ওঠায় তিনি ব্যাপারটাকে ঐভাবে নিয়েছিলেন।

মানসিক দ্বন্দ্ব আমাকে আঁকড়ে ধরলো। মনটা যেন ছিন্ন-বিচ্ছিন্ন হয়ে যেতে লাগলো। ডিনামাইট ষড়যন্ত্রের মামলার রবি সেনকে সব কথা খুলে বললাম। কিন্তু দ্বন্দ্বের নিরসন হল না। জানি না, হয়তো নিজেদের মধ্যে একটা আপোষ ফর্মুলা বের করবার জন্য উদগ্রীব হয়ে উঠেছিলাম। তাই যেন কিছু একটা গোঁজামিল দিতে গিয়ে নিজের অগোচরেই খানিকটা সত্যে উপনীত হয়েছিলাম। রুশ দেশের অভিজ্ঞতাগুলো মিলিয়ে দেখে মনে হল, আমাদের দেশেও বিপ্লবের রয়েছে দুটো স্তর। প্রথম স্তরে যুগপৎ জাতীয় বিপ্লব ও গণতান্ত্রিক বিপ্লব সম্পন্ন করতে হবে। পরের স্তরে হবে সর্বহারা বিপ্লব। জাতীয় বিপ্লব হবে ব্যাপক জনগণের সক্রিয় সমর্থন ও অংশগ্রহণের মাধ্যমে। জাতীয় বিপ্লবের পর যে যে-পথে চলা যুক্তিসঙ্গত মনে করবে সে সে-পথেই যাত্রা শুরু করবে। আজকে ও-নিয়ে মাথা না ঘামালেও চলবে। বস্তুত সেদিন নিজের দেশের পরিস্থিতি অনুযায়ী বিপ্লবের স্তরগুলোর পার্থক্য নিরূপণ করে দেখা বা স্তরগুলোর আলাদা বৈশিষ্ট্য সম্পর্কে যা উপলব্ধি করেছিলাম, তা অনেকটা সত্য ছিল। আবার তাতে গোঁজামিলও ছিল। গোঁজামিল ছিল এই রকম– জাতীয় বিপ্লবের পর যারা যে পথে চলা যুক্তিসঙ্গত মনে করবেন, তাঁরা সে পথে চলার সিদ্ধান্ত তখন নেবেন। অর্থাৎ প্রথম থেকে যা করণীয় তা না করে, পরের স্তরের জন্য পূর্ব থেকে তৈরি না থেকে স্বতঃস্ফূর্ততা ও সুবিধাবাদের আশ্রয়ে গা ভাসিয়ে দেবেন। জাতীয় বিপ্লব থেকে সর্বহারা বিপ্লব পর্যন্ত প্রত্যেকটার আলাদা আলাদা স্বকীয় বৈশিষ্ট্য থাকলেও জাতীয় বিপ্লবের সাথে তা ঘনিষ্ঠ সম্পর্কিত বলে ধরে নিয়েছিলাম। যা হোক এ ধরনের চিন্তাধারা ও যুক্তিতে যেন খানিকটা স্বস্তিও পাচ্ছিলাম। জাতীয় বিপ্লব প্রথম সংঘটিত হবে—এটা ভেবে বন্ধুদের সাথে মিলে মিশে চলতে চেষ্টা করছিলাম। কিন্তু ঐ অবস্থাটা ছিল সাময়িক।

পড়াশোনা প্রায় বন্ধ হয়ে গিয়েছিল। যুযুৎসু, প্যারালাল বারে কসরৎ ও ডন ইত্যাদি ব্যায়াম চর্চায় দিনগুলো কাটিয়ে দিচ্ছিলাম। কিন্তু মনের মাটিতে যে বীজ উপ্ত হয়েছিল, দিনের আলোতে সুপ্ত থাকলেও রাতের নির্জন অন্ধকারে তা শতগুণ পল্লবিত হয়ে জেগে উঠতে লাগলো। এভাবেই বিনিদ্র অবস্থায় রাতগুলো কেটে যাচ্ছিল।

ধলঘাট সংঘর্ষ - বীরাঙ্গনা সাবিত্রী দেবী

১৯৩২ সালের ১৩ই জুন ধলঘাট গ্রামে সাবিত্রী দেবীর বাড়িতে পলাতক বিপ্লবীদের সাথে সামরিক বাহিনীর এক প্রবল সংঘর্ষ হয়েছিল। এখানে প্রসঙ্গক্রমে সে ঘটনার কথা নিবেদন করছি।

ধলঘাটের ঐ বাড়িতে মাঝে মাঝে বিপ্লবীরা এসে থাকতেন। এক জরুরি সমস্যা নিয়ে মাস্টার দা ও নির্মল দা ঐ বাড়িতে এসেছিলেন। মাস্টার দা'র নির্দেশে নন্দনকানন বালিকা বিদ্যালয়ের শিক্ষিকা প্রীতিলতা ওয়াদ্দেদার ১২ই জুন সেই বাড়িতে যান। এঁদের সঙ্গে অসম সাহসী অপূর্ব সেনও (ভোলা) ছিলেন। এক নরপশুর মারফত খবর পেয়ে মিলিটারি বাহিনী গুর্খা সৈন্যদল রাত দশটায় সাবিত্রী দেবীর মেটো বাড়িটা ঘেরাও করে। বাড়িটা ছিল মাটির দোতলা। দোতলায় উঠবার দুটো সিঁড়ি ছিল। একটা বাইরের দিকে মাটির সিঁড়ি, অপরটা ভেতরের দিকে কাঠের সিঁড়ি। সাবিত্রী দেবী এমন ধরনের বীরাঙ্গনা মহিলা ছিলেন যে, যেদিন তাঁর বাড়িতে পলাতকেরা আসত, সেদিন দা হাতে পাহারায় মোতায়েন থাকতেন। স্বেচ্ছায় ঐ কাজটুকু তিনি নিজের কাঁধে তুলে নিয়েছিলেন। ঘটনার দিনও তিনি তাঁর কর্তব্যটুকু করে যাচ্ছিলেন। নিচ তলায় খাওয়ার ডাক পড়েছে, খাওয়ার জন্য তাঁরা তৈরি হচ্ছিলেন, এমন সময় ভারী বুটের আওয়াজে মাস্টার দা' সচকিত হয়ে উঠলেন। তিনি ছিলেন নিচে, তাড়াতাড়ি ওপরে গিয়ে ঘটনাটা ব্যক্ত করলেন। পালানোটা ছিল অতি দুরূহ এবং প্রায় অসম্ভব ব্যাপার। তবুও তাঁরা হাল ছাড়লেন না। প্রীতিকে বলা হল, নিচে মেয়েদের সাথে মিশে থাকার জন্য, কিন্তু সে অস্বীকার করে বসলো।

নির্মল দা তৈরি হয়ে গেলেন, রিভলবার হাতে সিঁড়ির মুখে এগিয়ে গেলেন। দেখলেন, সেনাবাহিনীর একজন ওপরে উঠছে। সঙ্গে সঙ্গে নির্মল সেনের রিভলভার গর্জন করে উঠলো। নিহত ক্যাপ্টেন ক্যাসারন নিচে গড়িয়ে পড়লো। এই গুলির শব্দ শোনামাত্রই চারদিক থেকে সেনাবাহিনী ঐ ছাদ লক্ষ্য করে গুলি ছুঁড়তে শুরু করলো। পরিস্থিতি অত্যন্ত গুরুতর। প্রতি মুহূর্তেই মৃত্যু অথবা গ্রেপ্তারের আশঙ্কা।

নির্মল সেন তখন মাস্টার দা'কে বললেন, তিনি নিজে ঘনঘন গুলি ছুঁড়ে পুলিশ ও ফৌজকে বাড়ির সামনের দিকে নিযুক্ত করে রাখবেন। মাস্টার দা যেন এই ফাঁকে অবিলম্বে প্রীতিলতাকে নিয়ে অপূর্বর সঙ্গে বাড়ির পেছন দিক দিয়ে বাইরে চলে যাওয়ার চেষ্টা করেন। কথামত নির্মল দার রিভলবার থেকে গুলিবর্ষণ চলতে থাকলো।

মাস্টার দা' ও অপূর্ব বাড়ির ভেতর দিকের সিঁড়ি বেয়ে নেমে পড়লেন। তারপর প্রীতিলতাকে নিয়ে ঘরের পেছন দিকের দরজা দিয়ে বেরিয়ে পড়লেন। খুব সন্তর্পণে, গুড়ি মেরে তাঁরা তিন জন এগুতে লাগলেন। এগিয়ে আসতে শুকনো পাতার মড়মড় শব্দ হতেই এক ঝাঁক গুলি এসে পড়লো। গুলি অপূর্বের বুক ভেদ করে চলে গেল। অপূর্ব মাটিতে লুটিয়ে পড়লো। মাস্টার দা' ও প্রীতিলতা উত্তর-পূর্ব দিকের পানা ভর্তি গড়ের মধ্যে নাক পর্যন্ত ডুবিয়ে লুকিয়ে রইলেন।

লড়াই চললো নির্মল দা'র সঙ্গে গুর্খা সৈন্যদের। অসমান লড়াই। একটা গুলি এসে নির্মল দা'কে গুরুতরভাবে আহত করলো। মারাত্মক আঘাত। ট্রিগারে আঙুল রেখেই নির্মল দা' শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করলেন।

বাড়ির উত্তর-পূর্ব দিক থেকে গুর্খারা তখন সামনের দিকে সরে গেছে। ঐ অবসরে মাস্টার দা'সহ প্রীতিলতা গড় থেকে উঠে হামাগুড়ি দিয়ে বাঁশঝাড়ের ভেতর দিয়ে মিলিটারি বেষ্টনীর বাইরে গ্রাম্য সঙ্কীর্ণ রাস্তার অপর মাথায় গিয়ে উঠলেন। বৃষ্টির দিন, পথঘাট কর্দমাক্ত, জায়গায় জায়গায় পানি জমে আছে। ঐ কাদাজল ভেঙ্গে তাঁরা উঠলেন গিয়ে পাহাড়ের পাদদেশে করলডেঙ্গা গ্রামে। পরে ওখান থেকে গভীর রাত্রে মণি দত্তের সাহায্যে তাঁরা কয়েক মাইল জলভরা মাঠ, ডোবা, ঝোপঝাড় অতিক্রম করে উপস্থিত হন জৈষ্ঠ্যপুরা গ্রামের গোপন আশ্রয়স্থল কবিরাজ অশ্বিনী দে'র বাড়িতে। বাড়িটার সাংকেতিক নাম ছিল 'কুটির'। এদিকে মিলিটারিরা সকলকে হাত তুলে বেরিয়ে আসতে হুকুম দিল। সাবিত্রী দেবীকে জিজ্ঞেস করা হল, আর কে কে আছে ওখানে—ঘরের ভেতরে? জানেন না বলে তিনি জবাব দিলেন। মিলিটারি সদলবলে এবার ঘরে ঢুকে পড়লো, সিঁড়ি বেয়ে উঠলো দোতলায়। তারা দেখলো, মুষ্টিবদ্ধ রিভলবার হাতে মৃত 'নির্মল দা' উন্মীলিত নয়নে তাকিয়ে আছেন। পরদিন সকাল বেলা নির্মল দা' ও অপূর্ব সেনের পায়ে দড়ি বেঁধে কর্দমাক্ত গ্রাম্য রাস্তা দিয়ে টেনে-হিঁচড়ে তারা ধলঘাট স্টেশনে নিয়ে গেল। ব্রিটিশ সভ্যতার এ ছিল এক অপূর্ব নিদর্শন।

সাবিত্রী দেবী, পুত্র রামকৃষ্ণ চক্রবর্তী ও কন্যাটিকে গ্রেপ্তার করা হল। গোয়েন্দারা ব্যর্থ চেষ্টা করলো কথা বের করতে। শুধু একটা কথাই সাবিত্রী দেবীর মুখ থেকে বের হল, 'জানি না'। বিধবা সাবিত্রী দেবী জেলে অন্যের হাতে খাবার খেতে অস্বীকার করে বসলেন। অবশেষে কর্তৃপক্ষ রাজি হতে বাধ্য হল। তিনি স্বহস্তে রান্না করার অধিকার অর্জন করলেন। বীরাঙ্গনা সাবিত্রী দেবী বীরের মতই ছিলেন জেলে। কয়েক বৎসরের হলো তাঁর সাজা। তাঁর পুত্র রামকৃষ্ণ চক্রবর্তীরও হলো কয়েক বৎসরের জেল।

কন্যাটিকে ছেড়ে দেয়া হলো। তেলের ঘানি ঘোরাতে ঘোরাতে সুদূর মেদিনীপুর জেলে ছেলেটা মারা গেল। অনেক অনেক কাল পর পুত্রহীনা মাতা ফিরে এসেছিলেন গৃহহীন শূন্য ভিটেয়। গ্রামবাসীরা সবাই মিলে স্বেচ্ছায় ঘর তুলে দিয়েছিল। কয়েক বৎসর মাত্র তিনি বেঁচে ছিলেন। শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেছিলেন ঐ পবিত্র ভিটেয়—ঐ শহিদী স্থানে। এমন ত্যাগী দেশপ্রেমিক বীরাঙ্গনা মহিলার সঙ্গে আমারও পরিচয় ছিল মনে করে আজও গর্ব অনুভব করি। তাঁর স্মৃতির প্রতি জানাই অকুণ্ঠ শ্রদ্ধা ও অভিবাদন।

আন্দামানের পথে

একদিন বিকেলে কর্তৃপক্ষ আমাদের কয়েকজনকে জানালেন, পরদিন সকাল বেলায় আমাদেরকে আন্দামানে (কালাপানি) পাড়ি জমাতে হবে, আমরা যেন তৈরি থাকি। নতুনত্ব ও বৈচিত্র্যের আশায় কিছুটা উত্তেজনা ও উৎসাহ বোধ করলাম। রাতটা যেন তাড়াতাড়ি কেটে গেল। পরদিন, ১৯৩২ সালের আগস্ট মাসের এক সকালবেলা দু'জন কয়েদি-বাবুর্চিসহ আমাদের ২৩ জনকে বিছানাপত্রসহ জেল গেটে হাজির করা হল। দূরের যাত্রী আমরা। সরকারি আনুষ্ঠানিকতার বিস্তৃত পর্ব শেষ হলে আবার আমাদের শৃঙ্খলিত করা হল—লম্বা শিকলে লাগানো হাতকড়ায় আমরা সবাই হলাম আবদ্ধ। পায়ে পড়লো লোহার বেড়ি। তারপর প্রিজন ভ্যানে করে নিয়ে হাজির করা হল খিদিরপুর ঘাটে। মাসান্তরে আন্দামানগামী 'মহারাজ' জাহাজে আমাদের শৃঙ্খলিত অবস্থাতেই ওঠানো হল। তারপর আমাদের ঢোকানো হল ডেকের নিচে লোহার মোটা শিক-ঘেরা একটা খাঁচার মত কামরায়। আমরা যেন খাঁচায় বন্দী জানোয়ার! তারপর দরজা বন্ধ করে দেয়া হল। জাহাজের গায়ে লাগানো দু-তিনটা পোর্ট-হোলের ভেতর দিয়ে তরঙ্গায়িত সমুদ্র ছাড়া আর কিছুই দেখবার বা জানবার বা শুনবার জো ছিল না। ঔপনিবেশিক শাসকবৃন্দ এখানেও নিজের সৃষ্ট আইন লঙ্ঘন করলো। আইন ছিল, জাহাজে ওঠানোর আগে বন্দীদের বন্ধনমুক্ত করার। কিন্তু পদদলিত হল সে আইন।

উত্তাল তরঙ্গায়িত সমুদ্রের মাঝখানের পর্বত-প্রমাণ ঢেউয়ের আঘাতে যদি জাহাজটা টুকরো টুকরো হয়ে ডুবে যায়, তবে বন্দীদের সলিল সমাধি হবে অনিবার্য। ঐ ঘৃণিত অপরাধের তুলনা নেই। এর তুলনা চলে একমাত্র ফ্যাসিস্ট শাসনের সাথে। ঔপনিবেশিক শাসন আসলে ফ্যাসিস্ট শাসনের মত বর্বর শাসনেরই রকমফের।

দ্বিতীয় দিন বিকেল বেলা। প্রাকৃতিক দৃশ্য দেখানোর উদ্দেশ্যে আমাদের জাহাজের ওপরতলার ডেকে শৃঙ্খলিত অবস্থাতেই ওঠানো হল। সূর্য অস্ত যাচ্ছে। মনে হল, সূর্য যেন সমুদ্রের অতলে মুখ লুকোতে চাইছে আমাদের দেখে। ডুবন্ত সূর্যের অসংখ্য রশ্মিচ্ছটা আকাশের গায়ে ছড়ানো।

সূর্য ডুবলো। পশ্চিম দিগন্ত লালে লাল হয়ে উঠলো। সমুদ্র তার রুদ্র নৃত্যে ভৈরব গর্জনে জানালো বিদায় আর রাতের অন্ধকারকে জানালো স্বাগত। ঐ আবছা অন্ধকারে তরঙ্গযুদ্ধে সৃষ্ট ফেনারাশি কী অদ্ভুতই না ঠেকছিল।

চারপাশে অথৈ কালচে নীল জলরাশি বিরামহীন ছুটছে দূরে ঐ দক্ষিণ মহাসাগরের দিকে। ফেনার মালা পরিয়ে দিয়ে যেন ওরা হারিয়ে যাবে। ওপরে আকাশ থেকে নিচে সাগরের বুক জোড়া অন্ধকার নামছে। শুধু চোখে পড়ে স্বচ্ছ শুভ্র ফেনার লহরী, সেগুলো আঁকাবাঁকা হয়ে ছুটছে। আর ওপরে আকাশে তারাগুলো জ্বলছে মিটমিট করে। বিরাট মহান এই প্রাকৃতিক শক্তি, তারই একটা ক্ষুদ্র অংশ এই সাগর, আবার সেই সাগরের বুকে ছোট একটা বিন্দুর মত জাহাজটা এগিয়ে চলেছে। লক্ষ্য তার আন্দামান।

এগার

পোর্ট ব্লেয়ার সেলুলার জেল

আন্দামানের পথে বিশাল সাগরের বুকে ছোট জাহাজটিতে চড়ে সংগ্রামশীল মানুষের কথা ভাবছিলাম। ভাবছিলাম, এই বিশাল প্রকৃতিতে মানুষ কতো ক্ষুদ্র! তবু সেই প্রকৃতিকেই মানুষ জয় করেছে শ্রমে ও বুদ্ধিতে।

সন্ধ্যা হয়ে এল। রিভলভারধারী হাবিলদার বলে উঠলো, 'বাবুজী! নিচুমে চালিয়ে। শাম উতর গ্যায়া; আঁধেরা হোগেয়া হ্যায়।'

আস্তে আস্তে নেমে পড়লাম। আবার সকলকে লোহার খাঁচায় আবদ্ধ করা হল।

অন্যান্য দিনের মতই টিফিন এল—রুটি, মাখন, চা। দুপুরের খাবার ছিল—ভাত, ডাল, তরকারি ও টক। হিন্দুস্থানী বাবুর্চি পরিবেশন করছিল। তার পরনে নেংটি। সর্বাঙ্গ দিয়ে ঝর ঝর ঘাম ঝরছে। হাত দুটো কালিময়, নোংরা—পরিষ্কার করার সময় যেন তার নেই। পেতলের একটা গামলা থেকে ঘর্মাক্ত বাম হাত দিয়ে সে ভাত-তরকারি বেঁটে দিচ্ছিলো। 'খাট্টা লিজিয়ে বাবুজী। বহুত আচ্ছা হুয়া (বাবু, টক নিন। খুব ভাল হয়েছে)।'

সৌজন্যের সাথেই বললো সে। চোখ-নাক বুঁজে সবই খেলাম। জেলখানায় খেতে খেতে অভ্যস্ত হয়ে গেছি বলে পেট থেকে সব আর বেরিয়ে পড়লো না।

সারাদিন খাঁচায় আবদ্ধ রইলাম। কেবল প্রকৃতির ডাকের তাগিদে দু'একবার খাঁচার বাইরে যাওয়ার সুযোগ পেয়েছি। হয় বসে থাকা বা গল্প-গুজব করা, না হয় আড়ষ্ট হয়ে এক অস্বস্তিকর অবস্থায় শুয়ে থাকা ছাড়া আর কিছুই করার ছিল না। মাথার ওপরে গোল গোল চাকার মত রবারের ফাঁপা বিশ-পঁচিশটা লাইফ বয় টাঙানো। হাসি পেল—যাদের হাত শিকলে বাঁধা তাদের আবার লাইফ বয় দিয়ে বাঁচানোর চেষ্টা! জাহাজ ডোবার আগে হাতকড়া খোলা ও পায়ের বেড়ী কাটার সময় পেলে তো লাইফ বয় ব্যবহার করবো! আর তাও যদি কোন রকমে হয়, তবে সাগর ভর্তি হিংস্র হাঙরদের ধারালো দাঁতের হামলা থেকে বাঁচা যাবে তো!

এই সব কথা ভাবতে ভাবতে জাহাজে তৃতীয় দিন কেটে গেল।

চতুর্থ দিনের শুরুতে আমরা আন্দামানের কাছাকাছি এসে পৌছু-লাম। আশেপাশে ছোট ছোট পাহাড়ী দ্বীপ ছড়িয়েছিটিয়ে রয়েছে। কখনো দ্বীপের পাশ দিয়ে জাহাজ এগুচ্ছে; আবার কখনো আমরা অথৈ সমুদ্রের ভেতর দিয়ে চলেছি। কোন দ্বীপ ঝোপঝাড়ে ঢাকা; কোনটাতে আবার সবুজ ঘাসের গালিচা বিছানো। এভাবে বেশ কয়েকটা দ্বীপ পেরিয়ে জাহাজ এগিয়ে চললো।

সেলুলার বন্দী শিবির

১৯৩২ সালের সালের ১৮ আগস্ট! বেলা ১২টা কি ১টা হবে। আন্দা-মান নিকোবর দ্বীপপুঞ্জের রাজধানী পোর্ট ব্লেয়ারে জাহাজ এসে ভিড়লো। পোর্ট ব্লেয়ার হল একটা পাহাড়ী দ্বীপ—সমুদ্র গর্ভ থেকে হেলানো বা ঢালু হয়ে ৫০০/৭০০ ফুট ওপরের দিকে উঠে গেছে। ঘাট এবং তার আশে-পাশে অনেক দূর পর্যন্ত বড় বড় পাথর খণ্ড দিয়ে পাহাড়ের গোড়াটা রক্ষা করা হচ্ছে বলে মনে হয়। বিছানাপত্রসহ আমরা সবাই ঘাটে নেমে পড়লাম। ঘাটে অপেক্ষমান বাসে করে ওপরের দিকে আঁকা-বাঁকা পথে আমাদেরকে সেলুলার জেল গেটে নেয়া হল। সেখানে বাস থেকে আমাদের নামতে হলো।

রাজবন্দীদের দলে আমরা ছিলাম তেইশ জন। এদের মধ্যে ছিলেন চট্টগ্রাম অস্ত্রাগার লুণ্ঠন মামলার আসামী গণেশ ঘোষ, অনন্ত সিংহ, লোকনাথ বল এবং আরও নয় জন; মেছুয়াবাজার বোমা মামলার আসামী মুকুল সেন ও নিশাকান্ত রায় চৌধুরী, আসানুল্লা হত্যা মামলার আসামী হরিপদ ভট্টা-চার্য, বরিশাল পুলিশ হত্যা মামলার আসামী রমেশ চ্যাটার্জি, ময়মনসিংহ অস্ত্র মামলার বন্দী প্রবীর গোস্বামী, কলকাতা অস্ত্র মামলায় অভিযুক্ত বন্দী মনোরঞ্জন গুহ ঠাকুরতা ও অন্য কয়েকজন বন্দী এবং চাঁদপুর পুলিশ হত্যা মামলার আসামী আমি নিজে।

গেটের সামনে শৃঙ্খলিত অবস্থায় সকলকে দু'সারিতে দাঁড় করানো হল। এ্যাসিস্টেন্ট চীফ কমিশনার সশরীরে হাজির হলেন। তিনি কড়া-সুরে দু'একটা উপদেশ বাণী বর্ষণ করলেন, হুমকিও দিলেন—'জেলে যদি কোন গোলমাল সৃষ্টি করা হয়, তবে সকলের সমস্ত সুবিধা কেড়ে নেয়া হবে' ইত্যাদি।

জেল গেটের ভেতরেই অফিস রুম। তারপর জেলখানায় ঢুকবার মূল গেট। জেলে ঢোকানোর আগে সরকারি আনুষঙ্গিক পর্ব শেষ হল। খুলে

দেয়া হল শৃঙ্খল ও হাতকড়ি। তারপর ভেতরের গেট খুলে গেল। আমাদের ২৩ জনকে নেওয়া হল ৫ নম্বর সেল ওয়ার্ডে। পায়ের বেড়ী কাটা হল ৫ নম্বর ওয়ার্ডের ওয়ার্ক শেডে। ওয়ার্ক শেড হল দিনের বেলায় যেখানে কয়েদীরা বসে কাজ করে। ওয়ার্ক শেডটা টিনের ছাউনীযুক্ত। বাঁধানো মেঝে ও চারদিক এর খোলা— মাঝারি ধরনের একটা ঘর। আবার অন্যান্য ওয়ার্ডের ওয়ার্ক শেডগুলোর দু'একটাতে কাঠের উঁচু রেলিং দেয়া আছে। এ্যাংলো ইণ্ডিয়ান জেলরটা এবার ইঙ্গিত করলো প্রত্যেককে এক একটা সেলে ঢুকে পড়তে। আমি প্রথম সেলটাতে ঢুকে পড়লাম।

সেল মানে ছোট একটা আস্তানা—দৈর্ঘ্যে ৯ ফুট, প্রস্থে ৫ ফুট হবে এমন একটি কামরা। ওপরে নিচে আছে ভেন্টিলেটার। মোটা লোহার শিকের দরজা। সেলের এক কোণে দড়ি দিয়ে তৈরি পুরনো একটা খাটিয়া পাতা। আর অন্য কোণে পায়খানা প্রস্রাবের জন্য আলকাতরা মাখানো আধসের বা তিনপোয়া জলীয় পদার্থ ধরতে পারে এমন একটা ছোট ডাবর বসানো রয়েছে। নারকেলের ছোবড়ার দড়ি দিয়ে বোনা খাটিয়ায় বসতেই মনে হল, যেন বেশ কিছু কাঁটা ফুটলো। দেখলাম, ছোবড়ার ভেতর ছারপোকার দল কিলবিল করে ছুটোছুটি করছে। একটু পরেই হঠাৎ চোখ পড়লো, প্রায় এক ফুট লম্বা একটা বৃশ্চিক কিলবিল করে সাপের মত ছুটে চলেছে। ভয়ে শিউরে উঠলাম। ভয় পাবারই কথা। কারণ, বৃশ্চিকটা আমাদের দেশীগুলোর চাইতে প্রায় বিশ-চব্বিশ গুণ বড়ো হবে বলে মনে হল।

পোর্ট ব্লেয়ারের কাছে সমুদ্র তীরে এবার্ডিন দ্বীপে এই আন্দামান জেল। এর মাঝখানে রয়েছে সেন্ট্রাল টাওয়ার। তা থেকে সাতটি তিন তলা বাহু বের হয়ে গিয়েছে। প্রত্যেকটি বাহু এক একটি আলাদা তেতলা ব্লক। এক ব্লক থেকে অন্য ব্লকে যাওয়ার পথে রয়েছে লোহার গ্রীল দেয়া দরজা। প্রতিটি প্রবেশপথে রয়েছে সান্ত্রী।

দালানটির যে তেতলা ব্লকে আমাদের সেল, তার প্রত্যেক তলায় ছাব্বিশটি করে মোট সেল ছিল আটাত্তরটি। বাবুর্চিসহ আমাদের ২৫ জনকে রাখা হয়েছিল নিচের তলায়। দোতলা ও তেতলায় সিঁড়ি বেয়ে উঠবার মুখেই রয়েছে আটকানো লোহার দরজা। তার পাশেই জেলের মূল গেট। নিচের তলায় সেলগুলোর মুখোমুখি ছিল বিরাট এক ওয়ার্ক শেড। তাতে এক শয়েরও বেশি লোক একসঙ্গে কাজ করতে পারে।

প্রায় চারটার সময় খাবার এল। মোটা মোটা একটু কালচে রং-এর ভাত থালায় ছড়ানো, সঙ্গে হিংযুক্ত একই রং-এর অড়রের ডাল ও পুঁই-শাক। ক্ষিধে ছিল বলেই খাদ্য নামীয় বস্তুগুলো উদরস্থ করলাম। প্রায় পাঁচটার সময় সেল বন্ধ হয়ে গেল। পুরাতন মরচে ধরা হ্যারিকেনের

কাঠামোতে ধোঁয়ায় ধোঁয়ায় কালচে হয়ে যাওয়া চিমনিটা ভেদ করে আলো বেরিয়ে পড়া মুশকিল দেখে সন্ধ্যার পরপরই আলোটা নিভিয়ে শুয়ে পড়লাম।

পরদিন খুব ভোরে উঠতে হল। নাস্তা হিশেবে যা পেলাম তা হল চালের গুঁড়ো পাতলা করে সেদ্ধ করা একটা বস্তু। বস্তুটি নতুন বলে চোখ-বুঁজে প্রায় পোয়া দেড়েক খেয়ে নিলাম অর্থাৎ পান করলাম। কেউ কেউ আমার চাইতেও একটু বেশি করে পান করলেন। দু' একজন আবার সামান্য একটু মুখে দিলেন মাত্র। গত দিনের মত সেদিনটাও বিনা কাজে কেটে গেল। অর্থাৎ পথশ্রান্তি দূর করার জন্য ঐ দিনটা আমাদের বিশ্রা-মের সুযোগ দেয়া হল।

তৃতীয় দিনে জেলর জমাদারকে সঙ্গে নিয়ে এসে আমাদের কাজ দিয়ে গেল। কাজটা সবার জন্য এক রকম—প্রত্যেককে রোজ দু' পাউণ্ড করে নারকেলের ছোবড়ার দড়ি বুনে কর্তৃপক্ষকে বুঝিয়ে দিতে হবে। সেই থেকে রোজ আমাদের ঐ কাজ করতে হত। জেলর এসে ঠিক দু' পাউণ্ড দড়ি বোনা হয়েছে কি না মেপে দেখে নিত। প্রথম প্রথম ছোবড়ার ঘষা লেগে হাত দুটো রক্তাক্ত ও জখম হয়েছিল। পরে আস্তে আস্তে হাতের তালু শক্ত হয়ে গেল। তা'ছাড়া প্রথম দিকে কাজ শেষ করতে করতে বিকেল প্রায় চারটা হয়ে যেত। কিন্তু পরে অভ্যস্ত হয়ে ওঠায় বেলা বারোটার মধ্যেই কাজ শেষ করার ব্যাপারে দক্ষ হয়ে উঠলাম। কয়েকদিন পর রান্না-বান্নার দায়িত্ব আমাদের নিজেদের হাতে এসে গেল। আমাদের পরিচাল-নায় রান্না-বান্না চলতে থাকায় খাওয়ার মানটা কিছুটা জাতে উঠলো। তা' ছাড়া যাঁরা পরিচালনায় দায়িত্বে থাকতেন, তাঁরা অর্থাৎ ম্যানেজাররা কিছুটা বাড়তি সুযোগ-সুবিধা পেলেন। তাঁরা সেলে আবদ্ধ না থেকে লোহার শিক ঘেরা বারান্দার চৌহদ্দির মধ্যে চলাফেরা করার বিশেষ সুবিধা পেলেন।

সকাল বেলা প্যারেড করতে হত। কোন কোন দিন ঘণ্টার পর ঘণ্টা রুটমার্চ করতে হত যাতে দৈহিক সহনশীলতা বাড়ে। সপ্তাহে একদিন ছুটি ছিল—রোববার। এভাবেই দিন কাটছিল। পড়া-শোনাটা এখানে এসে প্রায় শিকেয় তুলে রেখেছিলাম।

কলকাতা থেকে আগত আমার এক সহযাত্রী ঘনিষ্ঠ বন্ধু থাকতেন আমার সেলের কয়েকটা সেল পরে। অনন্ত দা' ও অন্যরা পাছে কি ভাবেন তাই তাঁর সাথে কথা বলতাম না। হয়ত তাঁরা আঁচ করতে পারেন যে, নেশার ঘোরটা এখনও আমার কাটেনি, যদ্দূর সম্ভব তাঁদেরকেও আমি এড়িয়ে চলতাম। হয়তো আমার এই ধরনের মনোভাব বা আচরণ

তখনকার দিনের এক অদ্ভুত পরিস্থিতির পরিণাম। কিন্তু তা'হলে কি হবে? ভেতরে ভেতরে যে তুষের আগুন অজ্ঞাতে জ্বলে চলছিল, তার খবরই বা কে রাখে? ঐ আগুন যে একদিন হঠাৎ জ্বলে উঠতে পারে- ঐ খবরই কি আমার জানা ছিল? অসন্তোষ, অতৃপ্তি, অস্বস্তি যেন আমার সমগ্র সত্তাকে আচ্ছন্ন করে রেখেছিল। ঝড়ের আগের প্রচণ্ড গুমোটভাব— ঐ রকম ছিল আমার অবস্থা।

বেনিতো মুসোলিনির জীবনী

১৯৩১ সালে আমার এক বন্ধু হিজলী ক্যাম্প থেকে আমাকে কয়েকখানা বই পাঠিয়েছিলেন। তার মধ্যে একখানা ছিল 'বেনিতো মুসোলিনির জীবনী'। বইখানা পড়বার ইচ্ছা যেমন ছিল না, ধৈর্যও তেমন ছিল না আমার। ১৯৩২-এর এক অক্টোবর মধ্যাহ্নে অনন্ত দা'র সেলে কয়েকজন মিলে বইখানা পড়াশোনা করছিল। সে খবর আমি জানতাম না। কি-একটা কাজে অনন্ত দা'র সেলে ঢুকেই বুঝলাম, ওরা মুসোলিনির জীবনী পড়ছেন। আমি তা দেখে তখনি আবার বেরিয়ে এলাম।

এর দিন দুয়েক পর অনন্ত দা' আমাকে একান্তে ডেকে জিজ্ঞেস করলেন, 'কালী, তুমি সেদিন সেলে ঢুকে হঠাৎ ফিরে এলে কেন?' কয়েক মুহূর্ত চুপ থেকে বললাম, 'মুসোলিনি হল একজন ফ্যাসিস্ট। শত শত গণতন্ত্রী ও সোশ্যালিস্টকে হত্যা করে ইতালির মাটি লাল করে সে ধনিকদের বর্বর শাসন নিরাপদ করেছে। আমি তাকে অন্তরের সাথে ঘৃণা করি, তাই, তার জীবন বৃত্তান্ত শুনতেও আমার ঘৃণা হয়।' অনন্ত দা' খানিকক্ষণ চুপ থেকে বললেন, 'তাহলে তুমি আমাদের সাথে কেমন করে কাজ করবে?' জবাবটা দিতে একটু ইতস্ততঃ বোধ করলাম, বললাম, 'চিন্তার কিছুই নেই, একসঙ্গে কাজ করতে পারব।' — এই বলে তাঁকে আশ্বস্তও যেমন করলাম, তেমনি চূড়ান্ত বোঝাপড়ার ব্যাপারটাও সাময়িকভাবে চাপা দেয়া হল।

ফ্যাসিবাদ কি?—এ সম্পর্কে অনন্ত দা' ছিলেন অন্ধকারে। আবার এ প্রশ্নের জবাব দেয়া আমার পক্ষেও তখন ছিল অত্যন্ত কঠিন। এখন মনে হয়, এ ব্যাপারে যুক্তির চাইতে আমার ভাবপ্রবণতাই ছিল বেশি। তবু এ সম্পর্কে তখন আমার একটা ভাসা ভাসা ধারণা যে গড়ে উঠেছিল, তাতে সন্দেহ নেই। যুদ্ধের মাধ্যমে পরদেশ পদানত ও লুণ্ঠন করার জন্য, মেহনতি মানুষকে অমানুষিক ও নিরঙ্কুশভাবে শোষণ করার জন্য বুর্জোয়া-শ্রেণী তাদের প্রথম দিককার প্রগতিশীল ও গণতান্ত্রিক আইন-কানুন ও প্রতিষ্ঠানকে ভেঙেচুরে দিয়ে যে হিংস্র, বর্বর, সন্ত্রাসমূলক একনায়কত্ব কায়েম

করে, তাই হল ফ্যাসিবাদ। এবং এর ধারক-বাহক হল হিটলার, মুসোলিনি প্রমুখ—যতদূর মনে পড়ে, এই রকম একটা মোটামুটি ধারণা আমার মনে তখন ছিল।

এক যাত্রায় পৃথক ফল

ঐ সময়ে আন্দামানে রাজনৈতিক বন্দীদের অবস্থা দেখবার উদ্দেশ্যে কেন্দ্রীয় পরিষদের কংগ্রেস দলীয় সদস্য বাবু রাজহংস ও মুসলিম লীগ দলীয় সদস্য জনাব মুহম্মদ আমিন আন্দামান সফরে এসেছিলেন। রাজনৈতিক বন্দীদের অবস্থান এবং সুবিধা-অসুবিধা ইত্যাদি সরেজমিনে দেখে তাঁরা ফিরে গেলেন ভারতবর্ষে।

পরে জেনেছিলাম, ঐ দু'জনের এক যাত্রায় পৃথক ফল হয়েছিল। আমাদের অবস্থা সম্পর্কে দু'জনের অভিমত ছিল দু'রকম। কংগ্রেস সদস্য রাজহংস বাবু রাজনৈতিক বন্দীদের অসুবিধাগুলো পরিষদে তুলে ধরেছিলেন। অন্যদিকে, মুসলিম লীগ দলীয় সদস্য মুহম্মদ আমিন সাহেব এই বলে বিবৃতি দেন যে, আন্দামানে রাজনৈতিক বন্দীরা বেশ ভালভাবেই দিন কাটাচ্ছে। বুঝলাম, দু'জনের মধ্যে রয়েছে দৃষ্টিভঙ্গিগত পার্থক্য। কংগ্রেস সদস্য রাজহংসের দৃষ্টিভঙ্গি হল বৃটিশ সরকার-বিরোধী। কারণ, ভারতের শিল্পপতি বুর্জোয়াদের দল জাতীয় কংগ্রেস স্বাধীনতার জন্যে সাম্রাজ্যবাদী ব্রিটিশ-বিরোধী অবস্থান নিয়েছে। পক্ষান্তরে মুসলিম লীগ সদস্য মুহম্মদ আমিনের দৃষ্টিভঙ্গি ব্রিটিশ সরকার ঘেঁষা। কারণ, বড় বড় মুসলিম ভূস্বামী ও উঠতি ব্যবসায়ীদের দল মুসলিম লীগ ব্রিটিশ সরকারের ছত্রচ্ছায়ায় হিন্দু একচেটিয়া শিল্পপতিদের কোণঠাসা করে ভারতীয় বাজারে কিছুটা প্রভুত্ব বিস্তার করতে চায়।

দোলাচল ভাবনা

একটা তীব্র উদ্বেগ নিয়ে আমার দিনগুলো কাটছিল। প্রতি রাত্রেই ভাবতাম, পরের দিনই পরিষ্কারভাবে অনন্ত দা'দের জানিয়ে দেব, আমি কোন্ পথে চলবো। কিন্তু, দিনের আলো ফুটতেই ঐ দৃঢ় সঙ্কল্প যেন কোথায় উবে যায়। পর্বতপ্রমাণ জড়তা এসে যেন আমাকে ঘিরে ধরে। পরের দিন আর আমার সিদ্ধান্তের কথা বলা হয়ে ওঠে না।

ইতিমধ্যে, ভবিষ্যতে আরও বড়ো ধরনের পরিকল্পনা নিয়ে কীভাবে কাজ করা যায়, তা' নিয়ে অনন্ত দা' অতি বিশ্বস্তদের সাথে আলাপ আলোচনা শুরু করে দিলেন। ঐ বিশ্বস্তদের মধ্যে আমিও ছিলাম একজন।

তাই মনটা আমার কেমন করে উঠলো। মনে আমার প্রশ্ন জাগলো, আমি এঁদের সঙ্গে থাকবো না, অথচ, তাঁদের গোপন কথাবার্তা ও পরিকল্পনা জানবো—তা হবে যেমন অন্যায়, তেমনি গুরুতর অপরাধ। সেটা কখনোই হতে পারে না।

ঐ রকম যখন আমার মনের অবস্থা তখন একদিন হঠাৎ আমার মনের দ্বিধা ঘোচানোর একটা সুযোগ এসে গেল। একদিন রাতে রান্নার ম্যানেজারের পরিবর্তে অনন্ত দা' রান্নাবান্নার দায়িত্বে ছিলেন। তাই তিনি সেদিন সেলের বাইরে ছিলেন। রাত প্রায় আটটা নাগাদ হঠাৎ দেখি, অনন্ত দা' একটা চেয়ার টেনে এনে আমার সেলের দরজার বাইরে এসে বসলেন এবং আমার সঙ্গে আলাপ জুড়ে দিলেন। মনে মনে ভাবলাম, এইতো সুযোগ! আজই সব কথা তাঁকে খুলে বলতে হবে। এবং এক সময় কথা প্রসঙ্গে আমি তাঁকে বলেই ফেললাম, 'অনন্ত দা', আপনাকে আমার একটা কথা জানানো দরকার। আমি বৈজ্ঞানিক সমাজতন্ত্রে বিশ্বাস করি। আর ঐ পথেই নিজেকে আমি তৈরি করার চেষ্টা করতে চাই।' আমার কথা শুনে অনন্ত দা' নির্বাক। অনেকক্ষণ দু'জনের কারোর মুখে কথা আর সরলো না। অনন্ত দা'কে চুপ দেখে আমিও আর কোন কথা জোগাবার সাহস পেলাম না।

কিছুক্ষণ চুপ করে থেকে অনন্ত দা' হঠাৎ আমাকে জিজ্ঞেস করলেন, 'কালী, তুমি মাস্টার দা'কে ছাড়তে পারবে?' আমি একটু হতচকিত হয়ে গেলাম। কয়েক মুহূর্ত আমার মুখে কোন কথা জোগালো না। কিন্তু তারপর সাহস সঞ্চয় করে বললাম, 'অনন্ত দা', প্রয়োজন হলে মাস্টার দা'কে ছাড়তেও আমার দ্বিধা নেই। আমি তো মাস্টার দা'র জন্যে দলে আসি নি। আদর্শে বিশ্বাসী হয়েই এসেছি।' একবার মুখ খুলতে পেরে আমার মুখে যেন কথার খই ফুটতে লাগলো। আমি বলতে লাগলাম, 'অনন্ত দা', আমি কোন ব্যক্তির ব্যক্তিত্বের মোহে পড়ে বিপ্লবী দলে আসি নি। অবশ্য এতে কোন সন্দেহ নেই যে, আমি মাস্টার দা'কে মনেপ্রাণে সম্মান করি, শ্রদ্ধা করি। হয় তো চিরকাল তা-ই করে যাবো। কারণ তাঁর অসাধারণ ব্যক্তিত্ব, তুলনাহীন সাহসিকতা ও অবদানে আমি মুগ্ধ। কিন্তু আমার কাছে সেটাই সব নয়।' একটু থামলাম। কিন্তু অনন্ত দা' কোন কথা বললেন না। তখন আবার আমি বলতে শুরু করলাম, 'আচ্ছা অনন্ত দা', আপনার ব্যক্তিত্বও কি কম? চট্টগ্রাম দখল কিংবা তারও আগের কর্মকাণ্ডে আপনার কাজ ও অবদানের ভেতর দিয়ে যে ব্যক্তিত্ব গড়ে উঠেছে, তাও তো কম বিরাট নয়।' এই বলে আমি চুপ করে গেলাম।

অনন্ত দা' হয়তো ভাবছিলেন, ছিঁড়ে যাওয়া ঐক্যের তারটুকু অনুভূতি,

দরদ ও ব্যক্তিত্বের প্রভাব দিয়ে কীভাবে জোড়া লাগানো যায়। কিন্তু এবার বুঝলেন, তা হয়তো আর সম্ভব নয়। 'ঠিক আছে। তা'হলে তোমার সিদ্ধান্ত সকলকে জানিয়ে দেই?'— অনন্ত দা' জিজ্ঞেস করলেন।

আবার পর্বতপ্রমাণ দুর্বলতা আমাকে আচ্ছন্ন করলো। দ্বিধায় মনটা তোলপাড় করে উঠলো। কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে এতদিন যাঁদের সঙ্গে কাজ করেছি, প্রাণ দিতে গিয়েছি, এতদিনের শতবন্ধনে যাঁদের সঙ্গে কাজ করেছি, তাদের সঙ্গে সম্পর্কোচ্ছেদ করে চলে যাব? এ-সব চিন্তা মুহূর্তে মনকে আচ্ছন্ন করে ফেললো, মনটাকে তা যেন পিষে মারতে লাগলো।

সুতরাং পিছিয়ে গেলাম। বললাম, 'না, অনন্ত দা', আপাততঃ আর কাউকে বলবেন না।'

অনন্ত দা' সে কথা রেখেছিলেন।

ঝোঁকের মাথায়

গভীর এক আত্ম-দ্বন্দ্বের মাঝে হাবুডুবু খাচ্ছিলাম। পড়াশোনা চলছিল না বললেই হয়। ভাবাদর্শগত ধারণাও পরিষ্কার হচ্ছিল না। যেখানে ছিলাম, সেখানেই যেন দাঁড়িয়ে আছি, এক পাও যেন এগুতে পারছিলাম না। মাঝে মাঝে লেনিন ও ট্রটস্কির প্রশংসা শুনতাম। ধারণা অপরিষ্কার থাকার দরুন ঐ দু'জনের মধ্যে পার্থক্য টানাও কঠিন হত। ট্রটস্কিবাদ সম্পর্কে বিশ্লেষিত উপলব্ধি ছিল না। কিছুকাল যাবৎ লেনিন ও ট্রটস্কিকে প্রায় সমপর্যায়-ভুক্ত করে ফেলেছিলাম। যদিও তা ছিল সাময়িক।

গভীর এক আত্ম-দ্বন্দ্ব ও আত্ম-জিজ্ঞাসার বেড়াজালে যখন আমি দিশে-হারা, তখন পুরনো দৃষ্টিভঙ্গি ছেড়ে নতুন দৃষ্টিভঙ্গিতে পৌঁছানোর সেই উত্তরণপর্বে একদিন দুর্নিবার আবেগের বশবর্তী হয়ে এক বন্ধুকে হঠাৎ বলে ফেললাম, 'ট্রটস্কিবাদ হোক কিংবা লেনিনবাদ হোক, যাই হোক না কেন, কমিউনিস্ট-তত্ত্ব হলেই হল। আমি তাতেই আছি।'

কিন্তু পরে বুঝেছিলাম কী একটা মারাত্মক ভুল মন্তব্যই না সেদিন করেছিলাম ঝোঁকের মাথায়। সেদিন বুঝতে পারি নি যে, ট্রটস্কিবাদ হল, একটা অবৈজ্ঞানিক, অমার্কসীয়, লেনিনবাদ বিরোধী, অতি বামপন্থী মুখোশ-পরা এক প্রতিক্রিয়াশীল প্রতি-বিপ্লববাদ। তার লক্ষ্য, সর্বহারার গণতান্ত্রিক বিপ্লবকে ধ্বংস করা, জাতীয় বিপ্লবকে বিপর্যস্ত করা।

কারাবন্দী নতুন দল

১৯৩২ সালের ডিসেম্বরের প্রথম দিকে বাংলার বিভিন্ন জেলখানা থেকে চল্লিশজন বন্দীর একটা দলকে নিয়ে আসা হল। সংখ্যায় এখন আমরা

হলাম তেষট্টি জন। এদের ভেতর সংখ্যায় তৃতীয় শ্রেণীর বন্দীরাই ছিলেন বেশি।

এখানে আমরা যে নগণ্য সংখ্যক রাজবন্দী দ্বিতীয় শ্রেণী বা Division II র মর্যাদা পেয়েছি, তাঁদের অবস্থা তুলনামূলকভাবে ভালো। তাঁদের সেলে লোহার খাট, তোশক, বালিশ ও জলের কুজোর ব্যবস্থা তো ছিলই, তা ছাড়াও ছিল হ্যারিকেনের আলোর ব্যবস্থা। তাদের খাবারের মানও তুলনামূলকভাবে ভালো ছিল। কিন্তু তৃতীয় শ্রেণীর বন্দীদের সেলে না ছিল আলো, না বিছানা। তাদের জন্য বরাদ্দ ছিল কঠিন পরিশ্রমের কাজ।

নতুন দলটি আসার পরদিনই দুপুর বেলা অনন্ত দা'র সঙ্গে দেখা করতে গেলাম। দেখলাম তিনি একাই রয়েছেন। আমাকে দেখে তিনি বসতে বললেন। এ-কথা সে-কথার পর আমি আসল কথায় এলাম। বললাম, 'অনন্ত দা', আমি পুরোপুরি মনস্থির করে ফেলেছি। এখন থেকে আমি বৈজ্ঞানিক সমাজতন্ত্রী হিশেবে নিজেকে গড়ে তুলবো। এর জন্যে যা যা করতে হয় করবো ; যেন জেল থেকে বাইরে গেলে সমাজতন্ত্রী হিশেবে কাজ করতে পারি।'

এর উত্তরে অনন্ত দা' বললেন, 'তুমি, আনন্দ, রণধীর, সুবোধ চৌধুরী যে পথে চলবে, আমিও সে-পথেই চলবো।' তার কথা শুনে আমি অবাক ও অভিভূত হয়ে গেলাম। তখন তিনি কতটা গুরুত্ব দিয়ে কথাগুলো বলেছিলেন জানিনা, তবে, ১৯৩৮ সালের জানুয়ারি মাসে আন্দামান থেকে মুক্তি পেয়ে নিজেকে তিনি বৈজ্ঞানিক সমাজতন্ত্রী বলে ঘোষণা করেছিলেন। যা হোক, দ্বিধাদ্বন্দ্ব থেকে একটা অভাবনীয় মুক্তির আনন্দ নিয়ে অনন্ত দা'র কাছ থেকে ফিরে এলাম।

দ্বিতীয় দলটা আসার পরদিন থেকেই আমরা পুরাতনরা সকলেই কাজকর্ম ছেড়ে দিলাম। বরাদ্দ করা কাজ পড়ে থাকতো। নতুন যাঁরা এসেছেন তাঁদেরকে সুতার থলে তৈরির কাজ দেয়া হয়েছিল, তা'ও প্রায় পড়ে থাকতো। একদিকে যেমন আমাদের সংখ্যাধিক্যের জোর, তেমনই অন্যদিকে কর্তৃপক্ষ বন্দীদের শান্ত রাখার কৌশল হিসাবে কাজকর্মে তাগিদ দেয়া ছেড়ে দেয়। অন্যথা কাজ না করাটা হল জেল আইনে গুরুতর অপরাধ, বে-আইনী এবং বিদ্রোহের সমতুল্য।

জেল আইনে কাজ থেকে রেহাই পাওয়ার সুযোগ রয়েছে কেবল ছুটির দিনে এবং কেউ অসুস্থ হবার পর ডাক্তার কাজ থেকে বিরত থাকার জন্যে সুপারিশ করলে। যাই হোক, নতুন দল আসায় আমরা কাজ না করার বাড়তি সুবিধা পেলাম। এবং এই সুযোগে আমি পড়াশোনায় ডুবে গেলাম।

আমাদের জেলখানা থেকে পাশেই একটা দ্বীপ দেখা যেত, দালান-কোঠায় ভর্তি। একদিন লোহার শিক দিয়ে ঘেরা বারান্দার লোহার শিক ধরে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে ঐ দ্বীপটা দেখছিলাম। হঠাৎ মনে হলো, প্রহরারত সেপাইকে জিজ্ঞেস করলে হয়তো তার কাছ থেকে কিছু জানা যেতে পারে, অবশ্য যদি সে তার উত্তর দেয়। দেখি না উত্তর দেয় কি না—এই ভেবে সিপাইকে খুব সম্ভ্রম দেখিয়ে জিজ্ঞেস করলাম, 'সিপাইজি, উয়ো টাবুকা ক্যা নাম হ্যায়, আউর কোন উধার এতনে বিল্ডিং বনায়ে গয়ে (সিপাই সাহেব, ঐ দ্বীপটির কি নাম? আর তাতে এত দালানকোঠা কে বানিয়েছে?)?' সিপাইজী সম্ভবতঃ খোশ মেজাজে ছিলেন। বললেন, 'ওয়ো তো এক খুব-সুরত আউর তরক্কীওয়ালা টাবু হ্যায়। উধর হ্যায় হসপিটাল, স্কুল, পুলিশ ব্যারেক, মিলিটারি ব্যারেক, এ্যারোড্রাম, রেডিও স্টেশন আউর দেখনেকো বহুত চীজ হ্যায়। আউর উয়ো পাহাড়কা নিচুমে জেটি ভী বনায়ে গয়া হ্যায়।' অর্থাৎ সিপাহী সাহেব জানালেন, দ্বীপটি খুবই সুন্দর। ওখানে হাসপাতাল, স্কুল, পুলিশ ব্যারাক, মিলিটারি ব্যারাক, রেডিও স্টেশন এবং অনেক কিছু দেখবার জিনিস আছে। ঐ পাহাড়ের নিচে জেটিও আছে।

সিপাইজীর সঙ্গে কথা বলে জানলাম, আমাদের এবার্ডিন দ্বীপের এই পাঁচ নম্বর ওয়ার্ড থেকে সামনাসামনি যে দ্বীপটি দেখা যাচ্ছে, তার নাম রস দ্বীপ। মনে হল, মাইল খানেক দূরে হবে দ্বীপটি। মাঝখানে সমুদ্র যেন তার একখানা হাত বাড়িয়ে দ্বীপ দুটোকে দু'ভাগে ভাগ করে রেখেছে। শান্ত নিথর জলরাশি। তার ওপর দিয়ে মাঝে মাঝে দু'-একটা লঞ্চ এপার ওপার করে। সিপাইজী আরও জানালেন, সিভিল সার্জেন সাহেব ওখা-নেই থাকেন। রোজ তিনি এই দ্বীপে আসা-যাওয়া করেন। দরিয়াতে অনেক হাঙর আছে। তাই জল শান্ত মনে হলেও জলের ভেতরে বিপদ লুকিয়ে থাকে। তবে জলে অনেক মাছও আছে।

সত্যিই রস দ্বীপটি দেখতে ছবির মত মনে হয়। সিপাইজী চলে গেলেন। কিন্তু আমি তখনও সেদিকে তাকিয়ে ছিলাম। ভাবছিলাম একবার যদি ওখানে ঘুরে আসতে পারতাম। কিন্তু পরক্ষণেই নির্মম বাস্তবে ফিরে এলাম। হায় পাঁচ নম্বর ওয়ার্ডের দ্বীপান্তরের বন্দী আমি! খামোখা স্বপ্ন দেখছি।

হঠাৎ মনে হল, সমুদ্রে কি যেন একটা ডুবে গেল। আপন মনে ভাবছিলাম বলে ভালো করে লক্ষ করি নি। কিন্তু সেই মুহূর্তেই মনের আয়নায় উঁকি দিল মহাবিদ্রোহের বন্দী শহীদ নারায়ণের কথা। শ্বাসরুদ্ধকর

বন্দীত্বের হাত থেকে মুক্তি পাওয়ার আশায় সে লঞ্চ থেকে ঝাঁপ দিয়েছিল অতল সমুদ্রে। কিন্তু ব্রিটিশ ক্যাপটেনের শ্যেন দৃষ্টি এড়ানো সম্ভব হয়নি। গুলিতে তার বুক ঝাঁঝরা হয়ে গিয়েছিল এবং সমুদ্রের অতল জলে তার সমাধি ঘটে। হয়তো-বা তার দেহ চলে গিয়েছিল হাঙ্গরের পেটে। কে জানে। বেদনায় মনটা টনটন করে উঠলো।

এর কয়েকদিন পর আমাদের দ্বিতীয় শ্রেণীর সব বন্দীকে ৩ নম্বর ওয়ার্ডে সরিয়ে নেওয়া হল। আর ৫ নম্বর ওয়ার্ডে রাখা হল তৃতীয় শ্রেণীর বন্দীদের।

অসমাপ্ত আলোচনা

প্রায় একলাই পড়াশোনা চালিয়ে যাচ্ছিলাম। মাঝে মাঝে বরিশাল দারোগা হত্যা মামলায় যাবজ্জীবন দ্বীপান্তর দণ্ডে দণ্ডিত রমেশ চাটুজ্জ্যের সাথে মেলামেশা ও কথাবার্তা হত।

একদিন লোহার শিক ঘেরা করিডোরের ভেতর রমেশ আর আমি কথা বলছিলাম। নানা কথার পর হঠাৎ রমেশ আমাকে প্রশ্ন করলো, 'স্বাধীনতার জন্য আমরা যে সন্ত্রাসের পথ বেছে নিয়েছি তাতে তো সাফল্য আসছে না। এত যে রক্ত দিলেন শহীদেরা সবই তো বৃথা যাচ্ছে বলে মনে হচ্ছে। তবে কি আমাদের এই পথ ভুল পথ?'

প্রশ্নটা পুরোনো হলেও হঠাৎ করে রমেশের মুখে শুনে আবার নতুন মনে হল। বললাম, 'আমার মনে হয় আমরা ভুল পথেই চলেছি। পুরোপুরি ভুল যদি নাও হয় তবু অন্ততঃ এ পথের যথেষ্ট সীমাবদ্ধতা যে আছে তা এখন স্পষ্ট হচ্ছে। স্বাধীনতা সংগ্রামের যে আদর্শ আমাদের সামনে রয়েছে তা অত্যন্ত মহৎ। এতে কোন সন্দেহ নেই। মনে হয় আমাদের পথ সুস্পষ্ট নয়। হাতে গোণা কিছু তরুণের অতুলনীয় আত্মত্যাগ হয়তো একেবারে নিস্ফল নয়। কিন্তু এর মাধ্যমে দুর্দান্ত শক্তিশালী ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদকে উৎখাত করার স্বপ্ন বোধ হয় অযৌক্তিক ও অবিবেচনা প্রসূত। সাম্রাজ্যবাদের বিশাল শক্তিধর ভাড়াটে সৈন্যদল, পুলিশ বাহিনী, আমলার দল এবং তাদের অনুসারী শক্তিশালী দেশীয় প্রতিক্রিয়াশীলদের সামনে আমাদের মুষ্টিমেয় 'যুবক সৈন্য' সাগরের বুদবুদের চেয়ে খুব বেশি কিছু নয়। আমরা হলাম বিশাল জনতার এক সামান্যতম অংশ। জনতার একটা ব্যাপক অংশ যদি ব্রিটিশ বিরোধী সংগ্রামে হাত না মেলায় তবে ব্রিটিশরাজকে পরাভূত ও পর্যুদস্ত করা অসম্ভব ও অবাস্তব বলে এখন আমার ধারণা হচ্ছে। সেদিক থেকে আমাদের পথটা যে ভুল পথ তা এখন অনেকটা স্পষ্ট হচ্ছে। তাই না?'

রমেশ আমার কথা মনোযোগ দিয়ে শুনলো। তারপর প্রশ্ন করলো, 'কিন্তু আমরা যা করছি তার অনুপ্রেরণাতেই তো জনতা আমাদের সঙ্গে সামিল হবে। আমরা যা করছি তা কি জনতাকে আমাদের সঙ্গে টানার জন্যে করছি না?'

বললাম, 'আমরা হয়তো সে কথা ভেবেই সন্ত্রাসবাদী তৎপরতা চালিয়েছি। অস্ত্রাগার দখল, ব্রিটিশ অফিসার হত্যা ইত্যাদিতে জনতা খুশিও হয়তো হয়েছে সত্য। কিন্তু তাতে তাদেরকে আন্দোলনে সামিল করা যাচ্ছে না। আমার মনে হয়, আমরা যদি ব্রিটিশরাজ উৎখাতের আন্দোলনের সঙ্গে কৃষক জনতাকে জমির ক্ষুধা মেটানোর ও সুন্দর জীবন গড়ে তোলার সংগ্রামে উদ্বুদ্ধ করতে পারি, যদি শ্রমিক জনতাকে ন্যায্য মজুরি আদায়ের সংগ্রামে ও শোষণ মুক্তির সংগ্রামে টেনে আনতে পারি, যদি তার সঙ্গে গণতন্ত্র ও সমাজতন্ত্র কায়েমের সংগ্রামকে জনগণের সামনে তুলে ধরতে পারি তা হলে হয়তো আমাদের সংগ্রামে সাফল্য আসবে। জনতার সামনে যদি তার দাবি স্পষ্ট না হয়, আন্দোলনের একটা গোটা ছবি যদি তার চোখের সামনে ফুটে না ওঠে তবে কি জনতাকে টেনে আনা যাবে? মনে হয় না। কিন্তু আমরা কি সে কাজ করছি? না সে কথা কখনো ভেবেছি?'

আমার কথা শেষ হতেই রমেশ কি-যেন বলতে যাচ্ছিল। কিন্তু আরও দু-তিন জন বন্দী বন্ধু এসে পড়ায় আমাদের আলোচনায় তখনকার মতো ছেদ পড়লো।

বারো

ঐতিহাসিক আন্দামান অনশন

১৯৩৩ সালের মার্চ মাসের দিকে ডাঃ নারায়ণ রায়, নিরঞ্জন সেন, সতীশ পাকড়াশী ও ডাঃ ভূপাল বোস প্রমুখ বন্দীকে আন্দামানে নিয়ে আসা হয়। ডাঃ রায় ও নিরঞ্জন সেন বৈজ্ঞানিক সমাজতন্ত্রবাদে ছিলেন বিশ্বাসী। তাঁরা আসামাত্রই আমি তাঁদের সাথে সামিল হয়ে গেলাম। ডাঃ রায়ের সাথে সমাজতন্ত্রবাদের অনেকগুলো বইও ছিল, এতে আমাদের অনেকেরই হল মস্ত বড় সুবিধা। আবার বৈজ্ঞানিক সমাজতন্ত্র বোঝাবার তিনি শিক্ষকও বটে। তাঁর পড়ানোর ধরনটা ছিল একটু আলাদা প্রকৃতির। তিনি শুধু তত্ত্বগুলো পড়িয়ে যেতেন না, তত্ত্বগুলো যেন খাইয়ে দিতেন। একদিন যে তাঁর কাছে পড়েছে বা ক্লাশ করেছে, সে বরাবরই তাঁর কাছে পড়াশোনা করতে চাইতো, ফলে উপলব্ধিটা হত গভীর।

এরই কিছুদিন পর চতুর্থ দল আন্দামানে এসে পৌঁছালো। ঐ দলে ময়মনসিংহ যুগান্তর পার্টির অন্যতম নেতা খোকা রায় প্রমুখ কয়েকজন ছিলেন। ঐ সময়ে আমাদের সংখ্যা দাঁড়ালো প্রায় ৮০ জনের মত। তৃতীয় শ্রেণীর বন্দীরাই ছিলেন সংখ্যায় বেশী। শেষোক্তদের রাখা হয়েছিল ৫ নম্বর ওয়ার্ডে। কারো সাথে কারুর মেলামেশা করার জো ছিল না—যার যার ওয়ার্ডে সম্পূর্ণ আলাদা হয়ে থাকাটা ছিল রেওয়াজ।

সকল শ্রেণীর বন্দীদের অবস্থা অসহনীয় হলেও তখন তৃতীয় শ্রেণীর বন্দীদের অবস্থা ছিল কল্পনার বাইরে। কালচে রং মোটা মোটা ভাত, ডাল ও পুঁইশাক দু'বেলার প্রধান খাদ্য। রান্না-বান্না নিজেদের পরিচালনায় চললেও উন্নতি হয়েছিল সামান্য। সকালের টিফিন সেই কাঁজি, অর্থাৎ পাতলা করে সিদ্ধ করা চালের গুড়া। রাত্রে আলোবিহীন অন্ধকার সেলে রাত কাটানো, বাহ্যি-প্রস্রাবের জন্য আলকাতরা মাখানো আধ সের বা তিন পোয়া ওজনের জল ধরতে পারে এমন একটি হাড়ি। বাহ্যি যেতে হলে অর্ধেক পড়বে বাইরে, অর্ধেক থাকবে ভেতরে এমন ধরনের এক অদ্ভুত ব্যবস্থা। তার ওপর নিত্যি লোনা জলে স্নান, স্নানের পর সমস্ত শরীরটা

মনে হত আঠা আঠা। তৃতীয় শ্রেণীর কয়েদীদের ভাগ্যে খবরের কাগজ জুটতো না, জুটতো না আলো। সন্ধ্যা থেকে সকাল অবধি ঐ অন্ধকার সেলে কাটানো হল একটা রেওয়াজ। চিকিৎসার ছিল দুর্ব্যবস্থা। বিকেল চারটার সময় সেলে বন্ধ হয়ে যাওয়া ছিল একেবারে অসহনীয়। বিছানা বলতে দু'খানা কম্বল এবং প্রস্থে দেড় হাত ও দৈর্ঘ্যে চার হাত, ছয় ইঞ্চি উঁচু একখানা তক্তপোষ। ডোরা দেওয়া দুটো করে কয়েদী জাঙ্গিয়া ও দুটো করে ফতুয়া হল পরনের কাপড়। সঙ্গে ছিল স্নানের জন্য একখানা করে গামছা। আর ছিল লাল মাটি দিয়ে কাপড় পরিষ্কার করার ব্যবস্থা।

ধূমপান বা পান চিবান ছিল কল্পনার বাইরে—জেল আইনে ঘোরতর বে-আইনী কাজ, ধরা পড়লে সাজা হওয়া হল কপালের লিখন। অবশ্য এটা সকল স্তরের কয়েদীদের পক্ষে ছিল একই। মাছ, মাংস, ডিম, আলু তৃতীয় শ্রেণীর বন্দীদের ভাগ্যে জুটতো না, সেই পুঁইশাক, পেঁপে, হিং মিশ্রিত অড়হড় ডাল ভাতের সাথে নিত্যকার তরিতরকারী ঐ ধরনের একটি ব্যবস্থা। এ সব মিলে তৃতীয় শ্রেণীর বন্দীদের পক্ষে দিন কাটানো হয়ে পড়লো অসহনীয়। প্রথমেই তৃতীয় শ্রেণীর বন্দীদের ভেতর বিক্ষোভ দানা বাঁধতে শুরু করলো, পরে দ্বিতীয় শ্রেণীর বন্ধুরাও অত্যন্ত বিক্ষুব্ধ হয়ে উঠলো। কি করা যায় এ নিয়ে সম্পূর্ণ বিচ্ছিন্নতার মধ্যেও পরস্পর খবর আদান-প্রদান চলতে থাকলো। আলাপ আলোচনায় এ ব্যাপারে মোটামুটি একমত হলেন যে, যদি এ অবস্থার কোন উন্নতি করা না যায় তবে কেউ আর জীবন নিয়ে দেশে ফিরতে পারবে না। কিন্তু জেলখানায় বন্দী অবস্থায় এর প্রতিকারের উপায় কি? ভেবে চিন্তে দেখা গেল, আমাদের হাতে একটি মাত্র উপায় আছে। আর তা হল অনশন ধর্মঘটে যাওয়া।

আমাদের ২৩ জনের দলটি যখন এই সেলুলার জেলে আসি তখন থেকেই আমরা এ ধরনের পদক্ষেপের কথা ভেবেছিলাম। কিন্তু তখন আমরা ছিলাম সংখ্যায় অনেক কম। আমরা ধরে নিয়েছিলাম, এত কম সংখ্যক বন্দী অনশনে গেলে সরকারের উপর তেমন চাপ পড়বে না এবং সরকারও হয়তো ব্যাপারটিকে তেমন গুরুত্ব দেবেন না। তাই বন্দীর সংখ্যা বাড়ার আশায় আমরা অপেক্ষা করেছিলাম।

এখন যখন আমাদের সংখ্যা বেড়েছে, তখন ঠিক হল আমাদের দুরবস্থাগুলো যতদিন না প্রতিকার করা হয় ততদিন আমরা অনশন চালিয়ে যাব। এইভাবে আমরা আমাদের দাবির সমর্থনে আমরণ অনশন ধর্মঘটের পথ বেছে নিলাম।

আমরণ অনশন ধর্মঘট

১৯৩৩ সালের মে মাস। নেতৃস্থানীয় বন্ধুরা পরামর্শ করে জেল কর্তৃপক্ষের মাধ্যমে আন্দামান নিকোবরের চিফ কমিশনারের কাছে অনশনের আগে চরমপত্র হিসেবে একটি দরখাস্ত পাঠাবার ব্যবস্থা করলেন। তাতে জেল কোড তথা জেল আইনের সঙ্গে সঙ্গতি রেখে তিনটি দাবি জানানো হলো। দ্বিতীয় শ্রেণী ও তৃতীয় শ্রেণীর বন্দী নির্বিশেষে সবার জন্য ১. ভাল খাবারের ব্যবস্থা; ২. রাত্রে পর্যাপ্ত আলোর ব্যবস্থা; ৩. নিয়মিত পত্র-পত্রিকা সরবরাহ ও লেখাপড়ার সুযোগ। এই সুযোগগুলো ভারতের বিভিন্ন কারাগারের বন্দীরা পাচ্ছিল অথচ এখানে এসব সুযোগ ছিল না।

কিন্তু চিফ কমিশনার দরখাস্তের উপর লাল কালিতে লিখে পাঠালেন 'No'। অর্থাৎ বন্দীদের সব দাবি নির্বিচারে প্রত্যাখ্যান করা হল।

বন্দীদের মধ্যে এর প্রতিক্রিয়া হল দারুণ। সবাই যেন অসহিষ্ণু ও বেপরোয়া হয়ে উঠলাম। আবার চিফ কমিশনারকে খবর পাঠানো হলো যে মে মাসের মধ্যে দাবি মানা না হলে বন্দীরা দলে দলে আমরণ অনশন শুরু করবে। কিন্তু জেলারের মাধ্যমে খবর জানা গেল যে, চিফ কমিশনার কোন দাবিই মানবেন না। বরং তিনি নাকি জেলারকে জানিয়েছিলেন, বন্দীদের মৃতদেহ সমুদ্রে ভাসলে ভাসুক।

সুতরাং বারোই মে থেকে আমরণ অনশন শুরু হলো। দলে দলে বন্দীরা অনশনে যোগ দিল। দ্বিতীয় শ্রেণীর অধিকাংশ এবং তৃতীয় শ্রেণীর সবাই এই অনশন ধর্মঘটে যোগ দিল। এই সময় যে সব দাবি আমরা করলাম তা হল ১. সিগ্রিগেশন তুলে নিতে হবে; ২. নিয়মিত সংবাদপত্র সরবরাহ করতে হবে ও লেখাপড়ার সুযোগ দিতে হবে; ৩. রাতে সবার জন্য আলোর ব্যবস্থা করতে হবে; ৪. লোনাজলের পরিবর্তে মিঠা জলে স্নানের ব্যবস্থা করতে; ৫. রাত্রে পায়খানা-প্রস্রাবের সুব্যবস্থা করতে হবে; ৬. নিত্য পুঁইশাক ইত্যাদির পরিবর্তে হার্ড ভেজিটেবল যেমন আলু, বেগুন, পটল ইত্যাদি তরিতরকারি খাবার হিসেবে সরবরাহ করতে হবে; ৭. মাছ, মাংস, ডিম ইত্যাদি আমিষ জাতীয় খাদ্য নিয়মিত পর্যাপ্ত পরিমাণে বরাদ্দ করতে হবে; ৮. ইনডোর ও আউটডোর খেলাধুলার ব্যবস্থা করতে হবে; ৯. চিকিৎসার পর্যাপ্ত সুযোগ ও হাসপাতালের ব্যবস্থা করতে হবে ইত্যাদি।

অনশন শুরু হতেই বন্দীদের জামা-কাপড় এবং দ্বিতীয় শ্রেণীর বন্দীদের দাঁত মাজার ব্রাশ ইত্যাদি সুযোগ সুবিধা কেড়ে নেওয়া হল। সকলকেই জাঙ্গিয়া কোর্তা পরিয়ে দেওয়া হল। প্রথম প্রথম সকালে বিকালে সেল-গুলো খুলে দিলেও এবং স্নান করার সময় সেলের বাইরে যাওয়ার সুযোগ

দিলেও পরে সব বন্ধ করে দেওয়া হল। অনশনকারী সকল বন্দীকে নিয়ে যাওয়া হল ৫ নম্বর ওয়ার্ডে। একমাত্র পায়খানা প্রস্রাবের সময় ছাড়া চব্বিশ ঘণ্টা সেলের দরজা বন্ধ করে রাখার ব্যবস্থা হল। বাইরে অদূরে কখনও উত্তাল তরঙ্গায়িত ও অশান্ত এবং কখনও মৃদু হিল্লোলিত শান্ত সমুদ্র ছাড়া দেখবার ও জানবার কিছু ছিল না।

দূরে বহুদূরে বাংলাদেশ তথা ভারতবর্ষ। পনেরো দিন পর পর বাংলাদেশ ও মাদ্রাজ থেকে 'মহারাজ' জাহাজখানা আন্দামান যাতায়াত করতো। কিন্তু কোন খবর পাওয়া যেত না, যেন দুনিয়ার বাইরে এক অদ্ভুত জগতে আমরা বসবাস করছি।

তখন বাংলাদেশে জন এণ্ডারসনী সন্ত্রাসী রাজত্ব কায়েম হয়েছে। কেউ টুঁ শব্দটি করতে পারছিল না। বিপ্লবী আন্দোলন চললেও জাতীয় আন্দোলন নিষ্পেষিত হাজার হাজার রাজনৈতিক কর্মী জেলে আটক, পত্র-পত্রিকার মুখ বন্ধ। চারিদিকে শ্বাসরুদ্ধকর পরিস্থিতি চলছিল। ঐ রকম একটা পরিস্থিতিতে আমরা অনশন চালিয়ে যাচ্ছিলাম। আমাদের হাতে গোপনে আনা টাকা পয়সা যা-কিছু ছিল তা দিয়ে গোপনে ভারতে সংবাদ পাঠানো হল। জানতাম না, সে সংবাদ দেশের মাটিতে পৌঁছাত কিনা!

তিনটি মৃত্যু

একদিন দু'দিন করে পাঁচ-ছয়দিন কেটে গেল। বন্দীদের শরীর দুর্বল হয়ে পড়লো। কিন্তু তবু কেউ অনশন ভাঙ্গলো না। এভাবে প্রায় বারো দিন কাটানোর পর বন্দীদের শারীরিক অবস্থা যখন খুব খারাপের দিকে মোড় নিতে লাগলো তখন কর্তৃপক্ষের টনক নড়লো। তারা জবরদস্তির সঙ্গে বন্দীদের নাকের ভেতরে পাইপ ঢুকিয়ে তরল খাবার খাওয়াবার চেষ্টা চালাতে লাগলো। উদ্দেশ্য কোন রকমে বন্দীদের বাঁচিয়ে রাখা

সেই যন্ত্রণাময় দিনগুলোর কথা আজও মনের তাড়নায় স্পষ্ট দেখতে পাচ্ছি। জেলের একমাত্র ডাক্তার ও কম্পাউণ্ডার যমদূতের মত বিশাল দেশী কয়েদীদের নিয়ে প্রত্যেকটি সেলে জোর করে ঢুকছে। তাদের উদ্দেশ্য সরকারের নির্দেশমত অনশনরত বন্দীদের নাকে নল ঢুকিয়ে তরল খাবার জোর করে পেটে ঢুকিয়ে দেওয়া। দেখা গেল, জবরদস্তিকারী দলটি যাতে সেলে ঢুকতে না পারে সে জন্যে কোন কোন সেলের দরজা কাঠের তক্ত-পোষ দিয়ে আটকে রাখার চেষ্টা হচ্ছে। কিন্তু অনশনক্লিষ্ট বন্দীরা ক্ষয়মান শক্তি দিয়ে কতক্ষণই বা এক দল জোয়ান লোককে আটকে রাখতে পারে। তারা এক একটা ধাক্কায় প্রতিরোধ সরিয়ে এক একটা সেলে ঢুকতে লাগলো। তারপর সবাই মিলে জোর করে অনশনরত বন্দীকে মেঝে বা

বিছানাতে আছড়ে ফেলে, কেউবা মাথা চেপে ধরে, কেউবা বুকের উপর বসে পড়ে তাকে কাবু করে ফেলল। আর সেই সুযোগে ডাক্তার তার নাকের ভেতর রবারের নল ঢুকিয়ে দিয়ে তার ভেতর দুধ ঢেলে অনশনরত বন্দীকে খাবার খেতে বাধ্য করলো। খাওয়া শেষ হলে রবারের নল টেনে বের করে নিলে দেখা গেল, কারো কারো নাক দিয়ে রক্ত ঝরছে। এভাবে কয়েকজনের নাক জখম হল। এবং ঐ জবরদস্তিমূলক ব্যবস্থায় অনশনরত সব বন্দীকে তরল খাবার গেলানো হতে লাগলো।

ঐ যখন অবস্থা তখন একদিন সন্ধ্যার পর কানাঘুষা শুনতে পেলাম, তিনজন বন্দী হাসপাতালে। শুনলাম, জোর করে নাক দিয়ে দুধ খাওয়াতে গিয়ে তিনজনের ফুসফুসে দুধ গিয়ে ঢুকেছে। এরা হলেন, লাহোর ষড়যন্ত্র মামলার আসামী মহাবীর সিং, অস্ত্র আইন মামলায় অভিযুক্ত মোহিত মৈত্র এবং ময়মনসিংহ ডাকাতি মামলার বন্দী মোহন কৃষ্ণ নমোদাস। তাদেরকে নাকি হাসপাতালে পাঠানো হয়েছে। সম্ভবত এই ঘটনার আগেই মাদ্রাজ থেকে ডাক্তার এসে পৌঁছেছিল।

কানাঘুষা চলতে লাগলো। কিন্তু সঠিক কোন সংবাদ পাওয়ার উপায় নেই। ফুসফুসে দুধ ঢোকার অর্থ মৃত্যু। কিন্তু তাদের মৃত্যুর কোন সংবাদ জানা গেল না।

সতেরো দিনের দিন হাসপাতালের কয়েদীদের মাধ্যমে ফালতু ও একজন সিপাহী মারফত এ ধরনের একটা সংবাদ এলো যে, ওরা তিনজনই মারা গেছে এবং ওদের লাশ নাকি পাথর বেঁধে সাগরে ডুবিয়ে দেওয়া হয়েছে।

এ খবর সবার মধ্যে ছড়িয়ে পড়লো স্নানের সময়, তখন সকলকে স্নানের জন্য করিডোরে আনা হয়েছিল। সবাই খবর শুনে দুঃখে শোকে মোহ্যমান হলেও বিক্ষোভে ফেটে পড়লাম আগুনে বোমার মত। ব্রিটিশ সাম্রাজ্য-বাদের নিপাত কামনা করে শ্লোগানও উঠলো। আমরা সবাই ঠিক করলাম জেল কর্তৃপক্ষ যদি অবিলম্বে সঠিক খবরাখবর না জানায় তবে বন্দীদের কেউই সেলে ঢুকবেন না, লক আপে যাবেন না। শ্লোগান উঠলো, মহাবীর সিং জিন্দাবাদ, মোহিত মৈত্র জিন্দাবাদ, মোহন দেব জিন্দাবাদ, ইনকিলাব-জিন্দাবাদ ইত্যাদি। আমাদের এই তৎপরতা ছিল জেল আইনে জেল-বিদ্রোহ।

তাই জেল কর্তৃপক্ষ সঙ্গে সঙ্গে সতর্ক হয়ে গেল। পাঠান, পাঞ্জাবী, বাঙালি, বালুচ সেপাই ও কয়েদিদের সঙ্গে সঙ্গে সেখানে জমায়েত করলো। প্রত্যেক সেলের গোড়ায় গোড়ায় কয়েকজন করে লাঠি হাতে দাঁড় করিয়ে দিল।

জেল কর্তৃপক্ষ অবিলম্বে সকল রাজবন্দীকে নিজ নিজ সেলে চলে যাওয়ার হুকুম দিলেন। কিন্তু বন্দীরা অটল। সাথী বন্দীদের সঠিক সংবাদ না পাওয়া পর্যন্ত তারা সেলে যাবে না। প্রয়োজনে সবাই একসঙ্গে মরতে প্রস্তুত।

অনেক রাতে জেলার সাহেব এলেন। তিনি জানালেন তিনজনই মারা গেছেন। চতুর্দশ দিনে ফুসফুসে দুধ ঢুকে পাঞ্জাবের মহাবীর সিং মারা যায়। পাবনার মোহিত মৈত্র মারা যান পনেরো দিনের দিন। আর ষোড়শ দিনে মারা যান ময়মনসিংহের মোহন দেব। সবার চোখ জলে ভরে গেল। সবাইকে নিয়ে যাওয়া হল সেলে। এরপর অনশন শেষ না হওয়া পর্যন্ত আর সেলের দরজা খোলে নি।

ঐ রাতেই ইউরোপীয় মেডিক্যাল অফিসার দলবল সহ সেলের দরজায় দরজায় 'হাউ ডু ইউ ডু, আর য়্যু ফিলিং বেটার?' (কেমন আছো, একটু ভালো লাগছে তো? বলে বলে যাওয়ার সময় আমি আর চুপ করে থাকতে পারি নি। আমার সেলের সামনে এসে দাঁড়িয়ে ও কথা জিজ্ঞেস করাতে আমি রুক্ষ কণ্ঠে জবাব দিলাম, 'আই ডোণ্ট লাইক টু টক উইথ ইউ, এজ ইয়োর ম্যান হ্যাজ কিল্‌ড থ্রি অব মাই ফ্রেণ্ডস্' (তোমার সঙ্গে আমার কথা বলতে ইচ্ছে হয় না। কারণ তোমার সাঙ্গোপাঙ্গরা আমার তিন বন্ধুকে মেরে ফেলেছে।)

সে কোন জবাব দিল না। কিন্তু মনের আয়নায় দেখতে পেলাম তাঁর চোখ দুটো জ্বলে উঠেছে। আমার সেলের সামনে থেকে এগিয়ে যাওয়ার সময় তার চলার ভঙ্গি দেখে বুঝলাম সে খুবই ক্ষেপেছে।

ফল ফলতে দেরি হল না। আমার গরম মাথা ঠাণ্ডা করার জন্য ব্যবস্থাপত্র দেওয়া হল। দুদিন স্যালাইন ডুস্ দেওয়া হল এবং ঐ দুদিনের জন্য আমাকে হাতকড়া পরিয়ে রাখার ব্যবস্থা হল।

শহীদ মহাবীর সিং

ঠাকুর মহাবীর সিং ১৯৩০-এর লাহোর ষড়যন্ত্র মামলায় যাবজ্জীবন দ্বীপান্তর দণ্ডে দণ্ডিত হন। উত্তর প্রদেশের ঠাকুর পরিবারের এই সন্তান যৌবনের দ্বারপ্রান্তে এসে উত্তর ভারতের বিপ্লবী সংগঠন হিন্দুস্তান স্যোসালিস্ট রিপাবলিকান পার্টির সক্রিয় সদস্য হন। পরিণতিতে শহীদ ভগৎ সিং, রাজগুরু ও সুখদেব-এর সঙ্গে ঐ একই মামলায় অভিযুক্ত হয়ে যাবজ্জীবন দ্বীপান্তর দণ্ডে দণ্ডিত হন।

লম্বা, বলিষ্ঠ, জোয়ান চেহারা ছিল মহাবীর সিং-এর। একজোড়া পাকানো গোঁফ রাজপুত বীরের ছাপ এঁকে দিয়েছিল তাঁর চেহারায়।

অথচ, মিটি মিটি চাউনি আর শিশুর সরল হাসি এক আশ্চর্য মানবিকতার প্রলেপ বুলিয়ে দিয়েছিল তাঁর চোখে-মুখে ও হাব-ভাবে।

সেলুলার জেলের অমানবিক বর্বর ব্যবস্থার বিরুদ্ধে আমাদের আমরণ অনশনের প্রথম দিন থেকেই মহাবীর অনশনে সামিল হয়েছিলেন। ৫ নম্বর হলের তেতলার শেষ দিকের এক কুঠরিতে তালাবদ্ধ অবস্থায় তাঁর অনশন-রত দিনগুলো কাটছিলো। পাশেই ছিলো সহবন্দী সিরাজুল হক ও মনোরঞ্জন গুহ ঠাকুরতার সেল। বদ্ধ কুঠরি থেকেই তাঁদের সঙ্গে কথা-বার্তা আর হাসি ঠাট্টার বিনিময় চলছিল অনশন-দিনগুলোতেও। বহু অনশনে শাণিত ও পোড়খাওয়া মহাবীর সে সময়েও অনশনের ক্লেশকে উপেক্ষা করে যন্ত্রণাময় দিনগুলিকে একে একে পাড়ি দিচ্ছিলেন।

১৭ই মে দুপুর বেলা থেকে কর্তৃপক্ষ জোর করে খাওয়াবার পালা শুরু করলে একদল সেপাই তাঁর কুঠরির তালা খুলেই তাঁর উপর ঝাঁপিয়ে পড়েছিল। মহাবীর আগে থেকেই প্রস্তুত ছিলেন। শুরু হয় প্রচণ্ড ধস্তাধস্তি। দেড় ডজন সেপাইয়ের দলটি প্রথমে একটু হিমশিম খেলেও কিছুক্ষণের মধ্যেই মহাবীর সিংকে কাবু করে ফেলে কয়েকজন তাঁর বুকে, পেটে, হাঁটুতে চেপে বসে এবং মাথাটাকে একজনের দুই হাঁটুর মাঝখানে এমনভাবে চেপে ধরে যেন সে একটুও মাথা নাড়াতে না পারে। কিন্তু তবু চলে মহাবীরের নিষ্ফল প্রতিরোধ। তাঁর মুখে তরল খাবার ঢোকা-বার জন্য রাবারের নল ঢুকিয়ে দেওয়া হল। মহাবীর তা দাঁত দিয়ে কামড়ে কামড়ে কেটে ফেলে। হিংস্র সেপাইদল এত প্রচণ্ড ক্ষিপ্ত হয় যে তাদের বর্বরতা ও জবরদস্তি চরমে ওঠে। কোন রকম ভ্রুক্ষেপ না করে এমন জোর করে তারা মুখের মধ্যে নল ঢুকিয়ে দেয় যে তা গলনালী দিয়ে না ঢুকে শ্বাসনালীতে ঢুকে যায়। ফুসফুস ফেটে গিয়ে মহাবীরের দেহ যন্ত্রণায় চিৎকার করতে থাকে।

যন্ত্রণাকাতর মহাবীর জ্ঞান হারাবার আগে পাশের সেলের সহবন্দী সিরাজুল ও মনোরঞ্জনের কাছে তার চরম কষ্টকর অবস্থার কথা ব্যক্ত করলেও কুঠরিতে তালাবদ্ধ সাথীরা কিছুই করতে পারে নি।

অবশ্য কিছুক্ষণ পরে এসেই জল্লাদ সেপাইদল অজ্ঞান মহাবীরকে কুঠরি থেকে বের করে নিয়ে যায়। সে রাতেই আমাদের সবার অগোচরে মহাবীর সিং শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেন। কাপুরুষ জেল কর্তৃপক্ষ মহা-বীরের কোন চিহ্নই রাখেনি। গোপনে রাতের আঁধারে জেল থেকে তাঁর মৃতদেহ বের করে নিয়ে ভারী পাথর বেঁধে তা সমুদ্রগর্ভে ডুবিয়ে দেওয়া হয়েছিল।

শহীদ মোহন কিশোর

মোহন কিশোর নমোদাস ১৯৩৩ সালের জঙ্গি অনশন সংগ্রামের দ্বিতীয় শহীদ।

তপশীলী নমঃশূদ্র সম্প্রদায়ের এক গরীব কৃষকের সন্তান ছিলেন মোহন কিশোর। ময়মনসিংহ জেলার কিশোরগঞ্জ মহকুমার সরারচর গ্রামে ছিল তাঁর বাড়ি।

সাধারণ লম্বা ও একটু ভারী গড়ন ছিল মোহন কিশোরের। গোলগাল মুখখানায় মাঝে মাঝে বসন্তের দাগ। চেহারায় হাবভাবে গ্রামের সারল্য। ছোটবেলা থেকেই মোহন কিশোর মানুষের সেবার কাজে অগ্রণী ভলান্টিয়ার। অবশেষে অনুশীলন দলে যোগ দিয়ে বিপ্লবী কাজকর্মে আত্ম-নিয়োগ করেন।

নেত্রকোণা সোয়ারীকান্দা গ্রামে ডাকাতির অভিযোগে অন্যান্যদের সঙ্গে মোহন কিশোরও ১৯৩২ সালে গ্রেফতার হন। গ্রেফতারের পর অমানুষিক নির্যাতন সহ্য করে মোহন কিশোর সেই অগ্নিপরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন। বিচারে তাঁর সাত বছর কারাদণ্ড হয়। এবং কিছুদিন পর তাঁকে আন্দামান সেলুলার জেলে পাঠানো হয়।

অনশন সংগ্রাম শুরু হলে মোহন কিশোরও অন্যান্যদের সঙ্গে এই জঙ্গি লড়াইয়ে যোগ দেন। মহাবীর সিংয়ের সঙ্গে একই দিনে একই রকম বর্বরতার শিকার হলেন তিনি। ফুসফুসে দুধ ঢুকে যাওয়ায় তিনি প্রচণ্ড অসুস্থ হয়ে পড়েন। অসুস্থ অবস্থায় তাকে জেল হাসপাতালে স্থানান্তরিত করা হয়। দ্রুত তিনি নিমোনিয়ায় আক্রান্ত হন। জেল হাসপাতালে সতর্ক পাহারায় সহবন্দীদের সাহচর্য থেকে বঞ্চিত অবস্থায় গুরুতর অসুস্থ অথচ অনশনরত মোহন কিশোর ১৭ই মে থেকে ২৬শে মে পর্যন্ত মৃত্যুর সঙ্গে লড়াই করেছেন। লক্ষ্য ও সংগ্রামে অবিচল মোহন কিশোর স্বেচ্ছায় এক ফোঁটা ওষুধ কিংবা এক চামচ খাবারও গ্রহণ করেন নি। ২৬শে মে মোহন কিশোর সেই সেলুলার হাসপাতালে মৃত্যুবরণ করে শহীদ হন।

গ্রেফতার হওয়ার মাত্র তিন দিন আগে মোহন কিশোর বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হয়েছিলেন। কিন্তু বিপ্লবী জীবনের এক বন্ধনহীন গ্রন্থিতে আবদ্ধ হয়ে তিনি এগিয়ে গিয়েছিলেন। জীবন সর্বস্ব দিয়ে তিনি এগিয়ে গিয়েছিলেন, স্বাধীনতা সংগ্রামের চরম অগ্নিপরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয়ে গেছেন। মোহন কিশোরের সেদিনের সেই কিশোরী সহধর্মিনী আজ আর বেঁচে নেই। কিন্তু অনশন যজ্ঞে আত্মাহুতি দিয়ে মোহন কিশোর আজও অমর হয়ে রয়েছেন।

শহীদ মোহিত মৈত্র

পাবনা জেলার নতুন ভারেঙ্গা গ্রামে ছিল মোহিত মৈত্রের পূর্বপুরুষের বাসস্থান। গ্রামের পাশ দিয়ে বয়ে গেছে যমুনা নদী। ছেলেবেলা থেকেই ঐ নদীর প্রশস্ততা ও উদার-উদাস পরিবেশ ছিল মোহিতের নিত্যসঙ্গী।

ফরসা ধারালো চেহারার মোহিতের সুন্দর মুখের আদল, তাঁর প্রাণোচ্ছল কথাবার্তা, তাঁর হাসিখুশি ভাবভঙ্গি, তাঁর গলার সুকণ্ঠ সঙ্গীত সবাইকে মুগ্ধ করতো। সঙ্গীত ও সুন্দরের সাধনায় নিবেদিত প্রাণ মোহিত যৌবনের দ্বার প্রান্তে এসে বিপ্লবের অগ্নিবীণায় সুর সাধতে চঞ্চল হয়ে উঠেছিলেন। যুগান্তর দলের রংপুর গ্রুপের সঙ্গে তাঁর ঘনিষ্ঠতা গড়ে উঠলে এক সময় তিনি স্বাধীনতা সংগ্রামে আত্মনিয়োগের পবিত্র সিদ্ধান্ত নেন।

১৯৩২ সালের ২রা ফেব্রুয়ারি তিনি যখন একটি আগ্নেয়াস্ত্র কিনে ফিরছেন তখনই পুলিশের হাতে ধরা পড়েন। অস্ত্র আইনে তাঁর পাঁচ বছর সশ্রম কারাদণ্ড হয়। কারাদণ্ডের প্রায় এক বছর কাল আলিপুর জেলে স্বাধীনতা সংগ্রামী অন্যান্য রাজবন্দীদের সঙ্গে তাঁর দিন কাটে। সে সময়ে সবাই গানে গল্পে হাসিতে উচ্ছ্বাসে মোহিতের প্রাণোচ্ছলতার পরিচয় পান।

মোহিত ছিলেন সকলের বন্ধু—অজাতশত্রু। জেল জীবনের কর্কশ ক্লেশকে মোহিত গানে গানে সরস করে তুলতেন। সুকণ্ঠ মোহিত কখনো একা গাইতেন, কখনো দল বেঁধে গাইতেন। গানের আসরে টেনে আনতেন সবাইকে। গান ছিল মোহিতের প্রাণ; তাঁর প্রাণ ছিল গানময়।

অনশন সংগ্রাম শুরু হবার মাত্র কয়েকদিন আগে মোহিত আলিপুর জেল থেকে সেলুলার জেলে আসেন। এসেই তিনি অনশন সংগ্রামে ঝাঁপিয়ে পড়েন। ১৭ মে তারিখে জোর করে খাওয়ানোর নামে যে বর্বরতা চলে মোহিত তারই শিকার হন। ফুসফুসে দুধ ঢোকানোতে প্রথমে যন্ত্রণা, তারপর জ্বর, তারপর নিমোনিয়া। জেল হাসপাতালে মোহন কিশোরের পাশাপাশি আলাদা একটা কেবিনে তাঁর যন্ত্রণাকাতর দেহ মৃত্যুর সঙ্গে লড়াই চালিয়ে গেছে পুরো বারোটি দিন। বন্ধু-প্রিয় মোহিত সেই মৃত্যুপথের দিনগুলিতে তাঁর প্রিয় মুখগুলির কথা বার বার মনে করেছে। সিরাজুল হক, কালিদাস রায়—এদের নাম ধরে ডেকেছে মৃত্যুর আগে। গানের সুর ভেজেছে। সেই যমুনা পারের উদাসী হাওয়ায় লালিত মোহিতের কণ্ঠে অস্ফুট বেজেছে তাঁর প্রিয় গানের কলি—'চৈতী রাতের উদাস হাওয়ায়···'। তারপর ২৮শে মে গানের কণ্ঠ ক্ষীণ হতে ক্ষীণতর হয়ে একসময় তাঁর জীবন প্রদীপের যবনিকা টেনে দিয়েছে।

শহীদ মোহিতের জন্যও অন্ত্যেষ্টির ব্যবস্থা হয়নি। লোকচক্ষুর আড়ালে তাঁর জীবনহীন দেহটি ভারী পাথরে বেঁধে কসাইয়ের দল এবারডিন উপকূলে গভীর সমুদ্রে হাঙ্গরের মুখে ছুঁড়ে দিয়েছিল। কিন্তু সুদর্শন সুগায়ক প্রাণোচ্ছল মোহিত মৈত্র শহীদ হয়ে আমাদের অন্তরে চিরজীবী হয়ে আছেন।

অনশন বিশেষজ্ঞ বার্কার সাহেব

সে-সময়কার সেই অবর্ণনীয় যন্ত্রণাময় দিনগুলোর কথা ভাবলে এখন আশ্চর্য হয়ে যাই যে, কীভাবে ঐ কষ্টসাধ্য অনশনের দিনগুলো একে একে কাটিয়ে এসেছিলাম। জেল কর্তৃপক্ষ খাবার খাওয়াতে চায় আর আমরা স্বেচ্ছা অনশনে সামিল হয়ে কিছুই না খাওয়ার জন্য প্রতিজ্ঞাবদ্ধ। দিন-রাত প্রতিমুহূর্তে ক্ষুধার সে কী অসহনীয় তাড়না। খাবার না পেয়ে নাড়ি-ভুড়ি, হাড়-মাংস সব যেন হজম হয়ে যাচ্ছিল। প্রায় প্রত্যেকেই মৃত্যুর মুখোমুখি এসে দাঁড়িয়ে। কিন্তু অটল আমাদের প্রতিজ্ঞা। ভাঙবো, তবু মচকাবো না।

এভাবে প্রায় ৩৬ দিন যাওয়ার পর শোনা গেল যে, পাঞ্জাবের জেলখানাগুলোর ইন্‌সপেক্টার জেনারেল কর্নেল বার্কার আমাদের সঙ্গে দেখা করতে আসছেন। সে নাকি অনশন বিশেষজ্ঞ। তাই সরকার অবস্থা সরেজমিনে দেখা ও পরিস্থিতি মোকাবেলার জন্য তাকে এখানে পাঠাচ্ছে।

কিন্তু বার্কার সাহেব এসে মাত্রই আমাদের কাবু করার জন্য এক মারাত্মক খেলা শুরু করলো। সে এসেই আমাদের কয়েকজনের জল খাওয়া দিল বন্ধ করে। ৩৬ দিন অনশনের পর জল খাওয়া বন্ধ করা। অনশন চলাকালে সামান্য জল খাওয়া নিয়মের মধ্যেই পড়ে। কিন্তু তৃষ্ণার্ত ক্ষুধার্ত বন্দীদের সেলে এক ফোঁটা জলও আর রইলো না। ধূর্ত বার্কারের নির্দেশে কর্তৃপক্ষ সেলের ভেতরে জলের পরিবর্তে দুধ রেখে দিয়ে যেতে লাগলো। যেন জলের তৃষ্ণায় বন্দীরা দুধ খেতে বাধ্য হয়। কিন্তু কেউ তা ছুঁয়েও দেখলো না। রাজ কর্তৃপক্ষ সেলে বাটিতে করে দুধ দিয়ে যেত এবং সকাল বেলা এসে দেখতো, যে-দুধ সেরকমই রয়ে গেছে। এই রকম অবস্থায় নিরঞ্জন সেন ও আরও দু তিন জন প্রায় মুমূর্ষু অবস্থায় এসে পড়লো। নারায়ণদাকে হাসপাতালে নেওয়া হলো! আমরা অনশনকারী রাজবন্দীরা বুঝতে পারলাম ক্রমেই মৃত্যুর ভয়াল সাপ এগিয়ে আসছে।

জল খাওয়ানোর উপর নিষেধাজ্ঞা আরোপের তৃতীয় দিনে চীফ মেডিক্যাল অফিসার এলেন। আমার সেলের সামনে আসতেই তাকে দেখে আমার মাথায় আগুন দাউ দাউ করে উঠলো। আমি চিৎকার করে

জানতে চাইলাম, আমাদের জল দেওয়া হবে কি না? কিন্তু কোন ভ্রূক্ষেপ না করে নিষ্ঠুর অবজ্ঞায় সাহেবকে সিগারেটের ধোঁয়া ছাড়তে দেখে আমার মাথায় যেন খুন চেপে গেল। আমি দুধের পাত্রটা তার দিকে ছুঁড়ে মারলাম। তার জামা প্যান্টে দুধ ছড়িয়ে পড়লো। রেগে আগুন হয়ে সাহেব অবিলম্বে হাতকড়া লাগাবার নির্দেশ দিলেন। সঙ্গে সঙ্গে যমদুত সেপাইরা আমার হাত বেঁধে আমাকে চিৎ করে শুইয়ে ফেললো। এবং জোর করে পাইপ ঢুকিয়ে পেটের মধ্যে ক্যাস্টর অয়েল ঢুকিয়ে দিল।

পরদিন অনশনরত বন্দীদের দেহের ওজন নিতে এসে জেল হাসপাতালের লোকজন সত্যিই শঙ্কিত হয়ে উঠলো। অনশনরত বন্দীদের শরীরের ওজন অস্বাভাবিক রকম কমে গেছে। তাদেরকে বেশ চিন্তিত মনে হল।

এর পরদিন যখন প্রত্যেক বন্দীদের দু আউন্স করে জল দেওয়া হল তখন বুঝতে পারলাম কর্তৃপক্ষ একটু নরম হয়েছে! পরে শুনতে পেলাম, অনশন বিশেষজ্ঞ বার্কার সাহেব কিছু করতে না পারায় শেষ পর্যন্ত দিল্লী ফেরৎ যাচ্ছেন।

বার্কার সাহেব চলে যাওয়ার পরপরই আমরা অনশনরত বন্দীরা আবার ইচ্ছামত জল পেতে শুরু করলাম। সেদিন সবার অন্তরের দৃঢ় আত্মপ্রত্যয়ের জয় হল। মৃত্যুর সঙ্গে যারা পাঞ্জা ধরে এসেছে এবং আমরণ অনশনে নেমে পড়েছে তাদের যে ভয় দেখিয়ে নিরস্ত ও আত্মসমর্পণ করানো যাবে না, তা বোধ হয় কর্তৃপক্ষ বুঝতে পারলো। সেদিন যদি কেউ অনশন ভঙ্গ করতো তবে তা হতো সমস্ত বন্দীদেরই অপমান এবং ব্রিটিশ বিরোধী জেহাদের অবমাননা এবং তার ফলে রক্তে লেখা স্বাধীনতা সংগ্রামের ইতিহাসে হয়তো কিছুটা কালির দাগ লেগে থাকতো।

অনশনে বিজয়

অনশনের পঁয়তাল্লিশ দিন পার হবার পর নারায়ণ দার মাধ্যমে একটা গোপন সংবাদ পাওয়া গেল। আমরা জানতে পারলাম জেলার সাহেব নাকি নারায়ণ দাকে গোপনে বলেছে যে, বার্কার সাহেবের ব্যর্থতার সুযোগ নিয়ে চিফ কমিশনার নিজেই অনশনের একটা মীমাংসা করে সরকারের প্রশংসা পেতে চায়।

ঐ সময় আরো সংবাদ পাওয়া গেল এগারসনী শ্বেত সন্ত্রাসের ভেতরও বাংলাদেশ ও ভারতের কোন কোন জায়গায় আন্দামান বন্দীদের মুক্তির দাবিতে ও অনশন আন্দোলনের সমর্থনে কিছু কিছু আন্দোলন শুরু হয়েছে। পত্র-পত্রিকায় কিছু কিছু খবরাখবর ছাপা হচ্ছে এবং সংবাদপত্রের চাপে

পড়ে সরকার বাধ্য হয়ে আন্দামানে তিন জন বন্দীর মৃত্যু-সংবাদ স্বীকার করেছে। তবে সরকার সত্যিকার ঘটনাকে আড়ালে রেখে তাঁদের মৃত্যুকে অসুস্থতাজনিত মৃত্যু বলে প্রচার করেছে।

আরো শোনা গেল, ভারত থেকে আন্দামানে অনেক টেলিগ্রাম এসেছে আর স্বয়ং রবীন্দ্রনাথ নাকি বন্দীদের টেলিগ্রাম করেছেন, 'বাংলাদেশ বাংলার ফুলগুলোকে শুকিয়ে যেতে দিতে পারে না। অনুরোধ অনশন ভঙ্গ কর।'

সম্ভবতঃ সরকারের উপর প্রচণ্ড চাপ, বার্কারের ব্যর্থতা, বন্দীদের অনমনীয় দৃঢ়তা সব মিলিয়ে পরিস্থিতি আমাদের অনুকূলে চলে এলো। রাত্রে মেডিক্যাল অফিসারের মাধ্যমে চিফ কমিশনার প্রস্তাব পাঠালেন, আমরা যা দাবি করেছি তার চেয়েও বেশি সুযোগ সুবিধা পাব। তবে একটা কাজ আমাদের সেজন্যে করতে হবে। আগে অনশন প্রত্যাহার করতে হবে। কিন্তু এটাও যে একটা শর্ত। অন্যান্যদের সঙ্গে আলাপ আলোচনা ছাড়া কারো পক্ষে তো এ ব্যাপারে সিদ্ধান্ত দেওয়া সম্ভব নয়।

অনশনের ছেচল্লিশ দিনের দিন দুপুর বেলা অনশনব্রতী বন্দীদেরকে তেতলার বারান্দায় জড়ো করা হলো। অনশনের সময় যে-সব বন্দীদের বিচ্ছিন্ন করে রাখা হয়েছিল তাদের সকলকে একজন একজন করে নিয়ে আসা হল স্ট্রেচারে করে।

জেলার, সুপারিন্টেণ্ডেণ্ট, মেডিক্যাল অফিসার, চিফ কমিশনারের প্রতিনিধি হিসেবে এসিস্ট্যান্ট কমিশনার—সবাই আমাদের প্রতিশ্রুতি দিলেন অনশন ভঙ্গ করা হলে আমাদের সব দাবি দাওয়া মানা হবে।

এ নিয়ে আলাপ আলোচনা চললো। শেষে সিদ্ধান্ত নেওয়া হল অনশন ভঙ্গ করার। তখন সকলকে অনশন ভঙ্গের জন্য শরবত দেওয়া হলো। কিন্তু এসিস্ট্যান্ট কমিশনার তখন হঠাৎ বলে উঠলেন, 'রিমেম্বার, ইট ইজ আনকনডিশনাল সারেণ্ডার (মনে রেখো, এটা একেবারে নিঃশর্ত আত্মসমর্পণ)'। তখনই আবার পুরো পরিস্থিতি ঘুরে গেলো। না, না, এভাবে আত্মসমর্পণ করে কেউ অনশন ভঙ্গ করতে রাজি নই।

ওদিকে মেডিক্যাল অফিসার এসিস্ট্যান্ট কমিশনারকে ওখান থেকে সরিয়ে নিয়ে গেল। তারপর ফিরে এসে আমাদের জানালো, আমরা যেন চিন্তা না করি। অনশন ভঙ্গ করলে আমাদের সব দাবিই মানা হবে।

জেলার ও সুপারিন্টেণ্ডেণ্টও সে কথায় সায় দিলেন।

অনশনব্রতীদের দৃঢ়তা শেষ পর্যন্ত সফল হল। আমাদেরই জয় হল। আমরা সবাই অনশন ভঙ্গ করলাম। সেদিন ছিল ১৯৩৩ সালের ২৬শে জুন।

জীবন-মৃত্যুর দোলায় দোলানো অনশন ভঙ্গ হলো। কিন্তু পরদিনই আমরা জানতে পারলাম সকল অনশনব্রতীকে তিন মাসের সাজা দেওয়া হয়েছে। আমাদের অপরাধ—আমরা জেল আইন ভঙ্গ করে বে-আইনী কাজ করেছি। এ কাজ বিদ্রোহের শামিল। আমাদের সব দাবি মানা হলেও এবং আরও কিছু বাড়তি সুযোগ সুবিধা দেওয়া হলেও জেল আইন ভঙ্গ করার জন্য তিন মাস আমাদের ঐ সব সুযোগ সুবিধা দেওয়া হবে না।

তিন মাসের সাজা শেষ হল। আমাদের ওপর সিগ্রিগেশন তুলে নেওয়া হয়। আমাদের দ্বিতীয় শ্রেণীর বন্দীদের সরিয়ে নেওয়া হল ৩নম্বর ওয়ার্ডে। জেলের সমস্ত ওয়ার্ডগুলো বৈদ্যুতিক আলোকে আলোকিত হয়ে উঠলো। পায়খানা-প্রস্রাব ও স্নানের জলের সুব্যবস্থা হল। খাওয়া-দাওয়ারও মোটামুটি চলনসই ব্যবস্থায় আসা গেল। পুঁইশাকের বদলে এখন লাউ, কুমড়ো, আলু ইত্যাদি তরিতরকারি নিয়মিত সরবরাহের ব্যবস্থা হল। ঐ ধরনের তরিতরকারি আগে মাদ্রাজ কিংবা কলকাতা থেকে আনা হত কেবল সাহেব-সুবো অফিসারদের জন্য। বন্দীদের ভাগ্যে জুটতো শুধু শাক-সব্জী—একমাত্র পুঁইশাক। এখন সামুদ্রিক মাছও সরবরাহ হতে লাগল। খেলাধুলার সাজ-সরঞ্জামও সরবরাহ করা হল। ব্যায়াম চর্চার হল সুব্যবস্থা—ফুটবল খেলার মাঠ, ভলি খেলা ও ব্যাটমিন্টনের নির্দিষ্ট জায়গার ব্যবস্থা হল। প্যারালেল বার হরাইজেন্টল বার, গদা ঘুরানো, ডাম্বেল ইত্যাদির ব্যবস্থা হল। পিং পং, দাবা, তাস ইত্যাদির ব্যবস্থাও বাদ গেল না। বিভিন্ন পত্র-পত্রিকা আনারও সুযোগ সুবিধা পাওয়া গেল। অবশ্য ভারত থেকে একমাত্র সাপ্তাহিক "সঞ্জীবনী", সাপ্তাহিক "স্টেট্‌স-ম্যান" ও 'ইলাস্ট্রেটেড উইক্‌লি" ছাড়া অন্য কোন সাপ্তাহিক বা দৈনিক পত্রিকা আনা যেত না। দ্বিতীয় ও তৃতীয় শ্রেণীর বন্দীদের এক সাথে এক রান্নায় খাওয়া-দাওয়ার অসুবিধাগুলোও দূর করা হ'ল। একমাত্র ৪নম্বর ওয়ার্ড ছাড়া বন্দীদের অবাধ ঘোরাফেরার স্বাধীনতা পাওয়া গেল সমগ্র জেলখানা জুড়ে।

এণ্ডারসনী সন্ত্রাস সঙ্কুল শাসনকালে বিশেষ করে সারা ভারতবর্ষে প্রতি-ক্রিয়াশীল এক পরিস্থিতিতে এ ধরনের সুবিধাগুলো লাভ করা ছিল জেল-খানায় আমাদের সংগ্রামের এক বিরাট সাফল্য।

এই সাফল্য আন্দামানের বন্দী শিবিরে রাজনৈতিক জীবন গড়ে তুলতে যথেষ্ট সাহায্য করেছিল।

তের

সেল্‌লার জেলে রাজনৈতিক বিশ্ববিদ্যালয়

বন্দীদের প্রতি জেল কর্তৃপক্ষের আচরণ উদার হল। সশ্রম দণ্ডের জন্য যে সব কাজ দেওয়া হত তাও হয়ে এল বেশ হালকা ও সহনীয়। রাত্রে সেলে লক আপের সময়ও পিছিয়ে গেল। এবং এই সুযোগে আমরা বন্দীরা নিজেদের নতুন এক জীবনের জন্য তৈরি করে নিতে শুরু করলাম। আন্দোলন জেল-জীবনের এক নতুন অধ্যায় শুরু হল।

পড়াশোনা, তর্ক-বিতর্ক, আলাপ আলোচনার ভেতর দিয়ে আমাদের নতুন এক শিক্ষা জীবন শুরু হলো। দেশ-বিদেশ থেকে নিয়মিত পত্র-পত্রিকা নিয়ে আসা হতে লাগলো। কয়েক হাজার বই মিলিয়ে সেখানে গড়ে উঠলো একটা সাধারণ পাঠাগার। কংগ্রেসের উচ্চ-পর্যায়ের নেতা বাবু রাজেন্দ্রপ্রসাদ পাঠালেন এনসাইক্লোপিডিয়া ব্রিটানিকা (সবগুলো খণ্ড মিলে প্রায় ২৬টি) এবং জ্ঞানগর্ভ গ্রন্থরাজি ও বিভিন্ন ধরনের উপন্যাস। তত্ত্বগত বইগুলোর জন্য এরকম আর একটি ছোট আলাদা লাইব্রেরী প্রতিষ্ঠিত হল। শেষোক্ত লাইব্রেরীর পাঠক-সংখ্যা ক্রমাগত বেড়েই চললো। এক একটা বইকে দু'ভাগ তিনভাগ করে দেড় ঘণ্টা, দু'ঘণ্টার জন্য পড়তে দেওয়া হ'ত। ঐভাবে বইগুলো দিন রাত বিভিন্ন পাঠকের হাতে অনবরত ঘুরতো।

নিজেদের হাতের লেখা পাক্ষিক ও মাসিক পত্রিকা বের করা হল। আগ্রহ ভরে প্রায় সকলেই তা পড়তেন। সে সময়ে আমাদের হাতে যে-সব তত্ত্বগত বই ছিল সেগুলোর মধ্যে ছিল, বুখারিনের দ্বন্দ্বমূলক ও ঐতিহাসিক বস্তুবাদ, মার্কসের ডাস ক্যাপিটাল ও ক্রিটিক অব পলিটিক্যাল ইকনমি, বগদানভের অর্থনৈতিক বিজ্ঞানের সংক্ষিপ্তসার (A Short Course of Economic Science), লেপিডাসের পলিটিক্যাল ইকনমি এঙ্গেলসের জার্মানীতে কৃষক যুদ্ধ, কাল্পনিক ও বৈজ্ঞানিক সমাজতন্ত্রবাদ, বিজ্ঞান ও মার্কসবাদ, লেনিনের সংক্ষিপ্ত গ্রন্থরাজি, নাদেজদা ক্রুপসকায়ার লেনিনের স্মৃতিচারণ, লিয়েনটিয়েভের পলিটিক্যাল ইকনমি, লেনিনের অভিজ্ঞতার

সমালোচনা, স্টালিনের লেনিনবাদের সমস্যা, ট্রট্স্কির লেখা রুশ-বিপ্লব (মোট তিন খণ্ডে), এঙ্গেলসের ইংলণ্ডের শ্রমিক শ্রেণীর অবস্থা, কমিউনিস্ট ম্যানিফেস্টো, লেনিনের প্যারিস কমিউন, প্রথম আন্তর্জাতিকের ইতিহাস এবং মার্কস, এঙ্গেলস, লেনিন ও স্টালিনের জীবনী ইত্যাদি।

দুনিয়া, সমাজ ও দেশকে জানার একটা দুর্নিবার আগ্রহ যেন বন্দীদের পেয়ে বসেছিল। একটা অব্যক্ত উন্মাদনার ছোঁয়া যেন সকলকে স্পর্শ করেছে।

কঠিন অধ্যয়ন জীবন শুরু হল। নানা বিষয়ে জানার এক আকুল নেশা আমাদের পেয়ে বসলো। আমাদের মধ্যে যাঁরা লেখাপড়ায় ভালো ছিলেন, অধ্যয়ন ও অধ্যাপনায় যাঁরা পারদর্শী ছিলেন, তাঁরা নিলেন অধ্যাপনার দায়িত্ব। অন্যেরা হলাম শিক্ষার্থী। সকাল থেকে রাত পর্যন্ত কাজ, খেলাধুলো ইত্যাদির ফাঁকে ফাঁকে অফুরন্ত জিজ্ঞাসা আর জবাবের আদান-প্রদানের মধ্য দিয়ে কাটতে লাগলো আমাদের নতুন জীবন। শত শত বন্দী শিক্ষার্থীর আনাগোনা, জিজ্ঞাসামুখর কর্মতৎপরতায় আন্দামানের বন্দী শিবিরে জন্ম নিল এক নতুন শিক্ষা নিকেতন—সেলুলার জেল যেন একটা রাজনৈতিক বিশ্ববিদ্যালয়ে পরিণত হতে চললো।

উপমহাদেশে কংগ্রেসের আন্দোলন তখন স্তিমিত হয়ে পড়েছে। বিপ্লবী আন্দোলনও তখন উত্তেজনা কাটিয়ে ক্রমে ঝিমিয়ে পড়তে শুরু করেছে। এমন একটা অবস্থায় আবদ্ধ বন্দীদের মধ্যে তাঁদের অতীত কর্মতৎপরতা নিয়ে প্রশ্ন দেখা দিল। শুরু হল বিচার-বিশ্লেষণ। ভারতের অতীত ও সমকালীন ঘটনাবলীর প্রভাব এবং বাইরের প্রচারিত সমাজতান্ত্রিক সাহিত্য, বই-পুস্তক বা প্রগতিশীল রচনাবলী বিশেষভাবে রুশ-বিপ্লবের প্রভাব বন্দীদের কারো কারো মনে বেশ দাগ কাটলো। উপরন্তু মার্ক্সীয় তত্ত্ব ও সাহিত্য ইত্যাদি কঠোরতা ডিঙ্গিয়ে জেলের ভেতরে ঢোকার সুবিধা পাওয়ায় বন্দীদের একটা অংশ সাম্যবাদী আদর্শ গ্রহণ করলো এবং মার্কসীয় তত্ত্বে সজ্জিত হয়ে বিভিন্ন জগাখিচুড়ি মতাদর্শের বিরুদ্ধে সংগ্রামে লিপ্ত হল। তর্ক, আলোচনা, পড়াশোনা, ক্লাশ, মেলামেশা—ঐসব কৌশলের মারফত সন্ত্রাসমূলক বিপ্লববাদী ধ্যান-ধারণার সঙ্গে বৈজ্ঞানিক সমাজতন্ত্রবাদের সংঘাত চলতে থাকে। তবে সংঘাতের মূল ভিত্তি হল, জাতীয় মুক্তি আন্দোলনের ক্ষেত্রে বুর্জোয়া ও জাতীয়তাবাদের ধারণার সাথে দেশব্যাপী জোরদার গণ-আন্দোলনের ধারক ও বাহক কমিউনিজমের ধ্যান-ধারণার। ধীরে ধীরে জেলখানাগুলো হয়ে উঠল মার্কসীয় বিদ্যালয়। ঐ মতাদর্শগত সংগ্রামের ফলে প্রায় সব ক'টি বিপ্লববাদী দল ভেঙ্গে ভেঙ্গে টুকরো টুকরো হয়ে যাচ্ছিল। কেউ কেউ বা কোন কোন দল নানাভাবে

আত্মরক্ষার চেষ্টা চালালেও পরিণামে সে-সব ব্যর্থতায় পর্যবসিত হয়ে পড়ছিল। ফলে, ১৯৩২ সালের আন্দামান আর ১৯৩৬ সালের আন্দামানের মধ্যে ঘটে গিয়েছিল আকাশ-পাতাল তফাৎ—সে ব্যবধান এতই ব্যাপক ছিল যে, একটা বিপ্লব ঘটে গিয়েছিল। এ রকম একটা পরিস্থিতিতে বিরামহীন চলেছে আমাদের শিক্ষা-জীবন। ক্রমেই আমরা হয়ে উঠছি এক একজন নতুন মানুষ।

নিকট অতীতের সন্ত্রাসী বিপ্লবী তৎপরতার মূল্যায়নের ব্যাপারটা ছিল আমাদের নতুন শিক্ষাজীবনের একটি বিশেষ অঙ্গ। ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদের মহাপরাক্রমশালী ক্ষমতা-দুর্গের বিরুদ্ধে আমাদের নিঃস্বার্থ আত্মদানের সাহসী প্রচেষ্টার ইতিবাচক মূল্যায়নের পাশাপাশি জনগণের সঙ্গে সম্পর্কহীন এই সন্ত্রাসী-বিপ্লববাদের ক্ষুদ্র শক্তির সীমাবদ্ধতার মূল্যায়নের চেষ্টাও চললো। তারই পাশাপাশি মানব ইতিহাসের ধারা থেকে শিক্ষা নিয়ে আমরা তার সঙ্গে নিজেদের সংগ্রামের মর্মবস্তু ও পদ্ধতিকে তুলনা করে দেখলাম। এবং এই তুলনা, এই মূল্যায়নের পেছনে ফল্গুধারার মত বহমান এখানকার শিক্ষাজীবন ক্রমে মানব-মুক্তির নতুন পথ-নির্দেশিকা আমাদের সামনে তুলে ধরলো। আজ ভেবে আশ্চর্য হই, সেদিন দেশ ও দেশের মানুষের কাছ থেকে অনেক দূরে দ্বীপান্তরের বন্দীজীবনে থেকে কীভাবে ধীরে ধীরে আমাদের মনোজগতে এক অবিশ্বাস্য রূপান্তর ঘটে গেল! আমরা এক নতুন পথের পথিক হয়ে উঠলাম! সে পথ মুক্তির লক্ষ্যে জনগণের এক বিপ্লবী আন্দোলনের পথ, সে পথ শোষণমুক্ত সমাজ গঠনের পথ। আমরা হয়ে উঠলাম সমাজতন্ত্রে বিশ্বাসী, সাম্যবাদে বিশ্বাসী। ব্যক্তি সাহসের বদলে আমরা হয়ে উঠলাম জনগণের সাহস, শক্তি ও সংগ্রামে আস্থাশীল। অথবা স্বপ্ন দেখতে লাগলাম, মুক্তির দিগন্ত সমাজতন্ত্রে পৌঁছুবার।

অতিবাম ঝোঁক

কমিউনিস্ট আদর্শ গ্রহণ করার পর উৎসাহের আতিশয্যে বাস্তব অবস্থাকে যান্ত্রিক দৃষ্টিতে বিচারের ফলে বা বাইরের ও ভেতরকার অবস্থা এক করে দেখার ফলে অতিবাম পথে চলার একটা ঝোঁকও দেখা গিয়েছিল। পড়াশোনা, আলোচনা চলছিল বেশ জোরেশোরে। হঠাৎ একদিন প্রশ্ন উঠলো, সংগঠনে অর্থাৎ কনসোলিডেশনে ধর্মীয় সংস্কারের কোন স্থান আছে কিনা? ঘটনাটা এ-রকম: বিহারী রাজনৈতিক বন্দীদের কেউ কেউ উপবীত ধারণ ও ঈশ্বরে বিশ্বাস নিয়ে সংস্থার সদস্য হয়েছিলেন। এটা আদৌ অনুমোদন-যোগ্য কি না, তা বিবেচনার জন্য সংস্থার বৈঠক ডাকা হল। আলাপ-

আলোচনা, তর্ক-বিতর্ক চলতে লাগলো। লেনিনের গ্রন্থরাজি থেকেও অনেক উদ্ধৃতি পেশ করা হতে লাগল, কিন্তু সমস্যার কোন সমাধান খুঁজে পাওয়া গেল না। অবশেষে কনসোলিডেশন তিনটি ভাগে বিভক্ত হয়ে পড়লো। ব্যক্তিগত প্রভাবে পড়ে আমিও একটার সদস্য বনে গেলাম। পরে নিজেদের ভুল উপলব্ধি করে এবং বাইরের হস্তক্ষেপে আবার আমরা সকলে মূল সংস্থায় ফিরে এলাম। ভুলটা ছিল এখানে যে, কনসোলিডেশন সংস্থাটা হল কমিউনিস্ট বানাবার একটা সংস্থা, উৎসাহের আতিশয্যে কমিউনিস্ট আদর্শ ও প্রোগ্রাম গ্রহণ করে অনেকেই কনসোলিডেশনের সদস্য হয়েছিলেন। বিভিন্ন সদস্যের বিভিন্ন ধরনের সংস্কারও ছিল—তার মধ্যে ধর্মীয় সংস্কারও ছিল অন্যতম। সমাজ-জীবনের চেতনা ও সংস্কার সবটুকু নিয়েই তাঁরা নিজেরা কমিউনিস্ট বলে নিজেদের মনে করতেন। বহু লেখা-পড়া, তর্ক, আলোচনা, আন্দোলনে অংশগ্রহণ—এক কথায় বাস্তব কাজের ভেতর দিয়েই ঐ সব সংস্কার থেকে মুক্ত হওয়া যেত। সেদিক থেকে কনসোলিডেশন হল পড়াশোনা, তর্ক, বিতর্ক বা আলাপ-আলোচনা মারফত অবচেতন থেকে চেতনার স্তরে নিয়ে যাবার একটা সংস্থা, অর্থাৎ শোধন করবার একটা সংস্থা বলা চলে, যাতে সকলেরই একটা বৈজ্ঞানিক ধারণা জন্মে এবং জেলের বাইরের কমিউনিস্ট পার্টির সদস্য হওয়া সহজতর হয়। সংস্কার—তা সে শ্রেণীগত সংস্কারই হোক, কিংবা ধর্মীয় সংস্কারই হোক—যথাযথ বৈজ্ঞানিক শিক্ষার ভেতর দিয়ে না গেলে তা থেকে মুক্ত হওয়া যায় না। সংস্কার-মুক্ত নতুন মানুষ হিশেবে নিজেকে গড়ে তুলতে হলে, তার জন্য একটা ব্যবস্থা দরকার। জেলখানার ভেতরে কনসোলিডেশনই হল সেই রকমের একটা সংস্থা। ভবিষ্যতে জেলের বাইরে কমিউনিস্ট পার্টির সদস্যভুক্ত হওয়ার যোগ্য করে গড়ে তোলার যথাযথ প্রস্তুতির পর্ব ছিল কনসোলিডেশন। আমরা তা বুঝতে না পেরে, তখন অনেকেই অতিবাম বিচ্যুতির শিকার হয়ে পড়েছিলাম।

যাই হোক, আন্দামান সেলুলার জেলে তখন আমাদের অনেকের মধ্যে সমাজতন্ত্রমুখীন ভাবধারার প্রভাব ক্রমেই প্রগাঢ়তর হতে থাকলেও, অন্যান্য মতাদর্শের বন্দীরাও সেখানে ছিলেন। এঁদের মধ্যে তত্ত্বগত সংগ্রাম চলছিল। মতাদর্শগত ভিন্নতার কারণে দ্বন্দ্ব-বিরোধ থাকা সত্ত্বেও সে সময়ে রাজবন্দীদের মধ্যে পারস্পরিক সৌহার্দ্য ছিল চমৎকার। হাউস কমিটিগুলিতে সব দল বা গ্রুপের প্রতিনিধিত্ব ছিল। খাওয়া-দাওয়া, চলা-ফেরা, খেলাধুলো ইত্যাদি সবকিছুতেই ছিল ভ্রাতৃত্বমূলক সম্পর্ক। আমার ধারণা, সে সময়ে এই বন্দী শিবিরে ভারতের অন্যান্য বন্দী শিবিরের তুলনায় প্রখর মতাদর্শগত সংগ্রাম চলা সত্ত্বেও এখানকার পরিবেশ ছিল

অনেক প্রীতিময় ও সৌহার্দ্যপূর্ণ এবং পরবর্তীকালে সমগ্র ব্রিটিশ রাজত্বেও এই সৌহার্দ্যপূর্ণ পরিবেশ এখানে অব্যাহত ছিল। এবং সবচেয়ে বড়ো কথা, ঐ সুস্থ ও সৌহার্দ্যপূর্ণ পরিবেশ বজায় থাকার ফলেই সে সময়ে প্রায় সমস্ত রাজনৈতিক বন্দীকে মার্কসীয় আদর্শে প্রভাবান্বিত করা সহজতর হয়েছিল।

চেতনায় বিপ্লবী পরিবর্তন

ডালহৌসী স্কোয়ার বোমার মামলায় যাবজ্জীবন দ্বীপান্তর দণ্ডে দণ্ডিত ডাঃ নারায়ণ রায় ও অন্যান্যের সাথে মেলামেশার ভেতর দিয়ে আমরা সম-মতাবলম্বীরা এক ক্ষুদ্র গ্রুপে দলবদ্ধ হয়ে থাকতাম। পড়াশোনা, ক্লাশ ইত্যাদি বেশ চলছিল। সকাল থেকে বিকেল পর্যন্ত ক্রমাগত ক্লাশ চলত। শুধু মাঝে মাঝে বিরতি মিলত। ডাঃ রায় সাধারণত 'দ্বন্দ্বমূলক ও ঐতিহাসিক বস্তুবাদ' ও 'ক্যাপিটালের' ক্লাশ নিতেন। দ্বন্দ্বমূলক বস্তুবাদের নিয়মগুলো যখন দৃষ্টান্তসহ তিনি তুলে ধরতেন, তখন বিশ্ব সম্পর্কে এবং তার অংশ মানব সমাজ সম্পর্কেও নতুন ভাবধারা বা নতুন দৃষ্টিভঙ্গির সন্ধান মিলেছে মনে করতাম, আমাদের সকলের মনে সৃষ্টি করত জানবার একটা উদগ্র আকাঙ্ক্ষা। আমরা কয়েকজন ঐ সব ক্লাশে নিয়মিত যোগ দিয়েছিলাম।

নারায়ণ দা' বোঝাতেন যে, প্রকৃতি, সমাজ ও মানব মনের বিকাশের অতি সাধারণ নিয়মগুলো এবং দুনিয়ার বৈপ্লবিক পরিবর্তনের উপায়গুলো শিখবার যে বিজ্ঞান, তাই হল মার্কসীয় দর্শন বা মার্কসবাদ। মার্কসবাদের একটি দিক হল, দ্বন্দ্বমূলক বস্তুবাদ। এই দ্বন্দ্বমূলক বস্তুবাদের সার কথা হল, এই দর্শন মনে করে, জীবন, জগৎ ও চেতনার মূলে রয়েছে বস্তু এবং তার বিকাশ দ্বন্দ্বমূলক।

নারায়ণ দা' আমাদেরকে ঐতিহাসিক বস্তুবাদও পড়াতেন। ঐতিহাসিক বস্তুবাদ হল মানব সমাজের বিকাশের নিয়ম, তার চালিকা শক্তি এবং পরিবর্তনের সাধারণ তত্ত্বের বিজ্ঞান। এই ঐতিহাসিক বস্তুবাদই সামাজিক মানুষের সঙ্গে সামাজিক চেতনার সম্পর্ক বিচার করে। মার্কসবাদী দর্শনের এও একটি বিশেষ দিক।

সে সময়ে ঐ সব রাজনৈতিক ক্লাশের মাধ্যমে নারায়ণ দা' আমাদের উপলব্ধিতে এটা আনতে চেষ্টা করতেন যে, বস্তুই হল আদিম, বস্তুর একটা পর্যায়ে চিন্তা, চেতনা, বুদ্ধির উদ্ভব। মানুষের বিকাশ পূর্বেকার জীবনের বিকাশ থেকে উদ্ভূত। মানুষের এই বিকাশ থেকেই চিন্তা-চেতনাশীল ক্রিয়ার হল আবির্ভাব। মন বা চেতনার আগেই বস্তু বা বাহ্যিক বস্তুর

অস্তিত্ব ছিল, তা' ছিল স্বাধীনভাবে বিরাজিত। তিনি বলতেন প্রকৃতি ও সমাজের ক্রিয়া ও প্রতিক্রিয়ার ফল হিশেবে চিন্তা, বুদ্ধি ও চেতনার উৎপত্তি। দুনিয়া এবং সমাজ ঐ দু'য়ের সংঘাত ও মিলন—ঐ দু'য়ের মধ্য দিয়ে নতুন নতুন রূপে বিকাশ লাভ করছে। ঐ বিকাশের ধারায় বস্তু বা সমাজ উল্লম্ফনের মাধ্যমে নতুনত্ব প্রাপ্ত হয়ে চলেছে। ঐ অধ্যয়নের মাধ্যমে আমরা এক নতুন দৃষ্টিভঙ্গি ও এক নতুন জীবনের সন্ধান পেলাম।

এই দৃষ্টিভঙ্গির মূল কথা হল, প্রকৃতি ও সমাজ এক বিরাট পরিবর্তনের প্রবাহে প্রবাহিত; পৃথিবী ও জীবন চিরকাল ধরে বিকশিত ও পরিবর্তিত হয়ে চলেছে। ঐ জগতে সবই অস্থির, স্থির বলে কিছুই নেই। প্রত্যেক বস্তু বা ঘটনা চিরস্থায়ীও নয়, চিরন্তনও নয় বা চিরসত্য বলে কিছুই নেই। নদীর জলে একবার স্নান করলে সে নদী আর পূর্বের নদী থাকে না—নদীর জল আর পূর্বের জল একই থাকে না, সব কিছু "হাঁ" আবার একই সময়ে "না"-তে পরিবর্তিত হয়ে চলে। এমিবা থেকে ক্রমবিকাশের ধারায় মানুষ, আবার মানব সমাজের আদিম কমিউনিস্ট সমাজ, দাস সমাজ, সামন্তবাদী সমাজ অতীতের ঘটনায় পর্যবসিত, বুর্জোয়া সমাজ ব্যবস্থাও মুমূর্ষ অবস্থায়, সমাজতান্ত্রিক সমাজের উদ্ভব ও অগ্রগতি, ঐ সবই পরিমাণগত থেকে আকস্মিক গুণগত পরিবর্তনে পরিবর্তিত হয়ে আবার বিকশিত হয়ে চলেছে। জন্ম যেমন নতুনের আকস্মিক উদ্ভব, তেমনই মৃত্যুও এক আকস্মিক ঘটনা—এ দুটোই হলো বিপ্লব। আমরা দৈনন্দিন জীবনে এ-সত্য চাক্ষুষ উপলব্ধি করি। সব কিছুরই মূল হল গতিশীল বস্তুরই ক্রিয়া। এই গতিই পরিবর্তন ঘটায়। ঐ গতি শুধু স্থান পরিবর্তন নয়, এমন কি চিন্তা করাটাও হল গতিশীল বস্তুরই ক্রিয়া। বস্তুর অস্তিত্ব হল তার গতিশীলতা, ঐ গতিশীলতা হল বস্তু বা ঘটনার পরিবর্তন ঘটান। অবশ্য প্রকৃতি ও সমাজ পরিবর্তনের নিয়মগুলো আলাদা আলাদা হলেও বস্তু বা ঘটনার পরিবর্তন চিরসত্য বা সাধারণ নিয়ম। তাই, শোষক সমাজেরও পরিবর্তন অবশ্যম্ভাবী এবং নতুন সমাজ সমাজতান্ত্রিক সমাজের উদ্ভব অনিবার্য।

দ্বন্দ্বমূলক ও ঐতিহাসিক বস্তুবাদের ক্লাশ করার সঙ্গে সঙ্গে শারীরতত্ত্ব ও জীবতত্ত্বের বিষয়ে মোটামুটি একটা ধারণা গড়ে তোলার প্রয়োজন দেখা দিল। তাই দিনের একটা নির্দিষ্ট সময়ে শারীরতত্ত্বের ক্লাশ নেয়া নির্দিষ্ট হল। এই সব ক্লাশে চেতনার সঙ্গে মস্তিষ্কের যে সম্পর্ক, সে বিষয়ে নারায়ণ দা' মোটামুটি একটা ধারণা দিলেন। তিনি আমাদের উপলব্ধিতে আনতে চেষ্টা করলেন যে, মানুষ বিকশিত ও উন্নত মস্তিষ্কের অধিকারী। তাই সে চিন্তা করতে পারে। মন, চিন্তা, অনুভূতি, ইচ্ছা ইত্যাদি মনের একটা বিরাট জগৎ— মস্তিষ্কের ক্রিয়ার ওপরই নির্ভর করে। এ-থেকে বোঝা যায়

যে, সমস্ত আধ্যাত্মিক জগৎ, তথা মনোজগৎ বস্তুজগতের ক্রিয়াশীলতার ওপর নির্ভর করে বিদ্যমান থাকে। বিজ্ঞান প্রমাণ করেছে যে, মস্তিষ্ক ছাড়া চিন্তা করার অন্য কোন যন্ত্র নেই। মানব মস্তিষ্কের মতো উচ্চতরভাবে সংগঠিত বস্তুই চেতনা সৃষ্টি করতে সক্ষম। মস্তিষ্ক ছাড়া চেতনার জন্ম হতে পারে না, তার অস্তিত্বও থাকে না।

নারায়ণ দা'র ক্লাশ করে আমরা আরও জানতে পারলাম, মস্তিষ্ক চিন্তা করতে সক্ষম হলেও, আমাদের মানস গঠনের মূলে সমাজ ও পরিবেশের ভূমিকাও অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। জগৎ ও জীবন সম্পর্কে আমাদের যে জ্ঞান, তা কেবল মস্তিষ্কের দান নয়, মস্তিষ্কের চিন্তাশক্তি ও চারপাশের জীবন এবং জগৎ—দুইয়ের যোগফলই হল জ্ঞান।

আমরা এ-ভাবে আরও জানতে পারলাম যে, আমাদের হাত-পা, রক্ত-মাংস, চোখ-কান ইত্যাদি প্রকৃতি জাত এবং জৈবিক। কিন্তু চেতনা কেবল প্রকৃতি জাত ও জৈবিক নয়, তা সামাজিক ভিত্তির ওপরও প্রতিষ্ঠিত। চেতনার বিকাশে মানবিক পারিপার্শ্বিকতা ও মানব সমাজের মধ্যেকার সামাজিক জীবন যাপনের ব্যাপারটা যথেষ্ট গুরুত্বপূর্ণ। তাই মানুষের চেতনা সেই অর্থে সামাজিক। অসামাজিক জীবন, সামাজিক ক্রিয়াকলাপ ও সামাজিক মেলা-মেশা ছাড়া মানুষের চেতনা গড়ে উঠতে পারে না। শিশু মানুষ হিশেবে গড়ে উঠতে ও ব্যক্তিত্ব লাভ করতে পারে তখনই, যখন সে মানব সমাজের ভেতরে বসবাস করে।

এইভাবে নারায়ণ দা'র হাতে আমাদের নতুন ধরনের রাজনৈতিক শিক্ষার হাতে খড়ি হল। ক্লাসগুলি করার পর মনে হল, জীবন ও জগৎ সম্পর্কে আমাদের চিন্তার জগতে এক আমূল বৈপ্লবিক পরিবর্তন ঘটে গেল।

চৌদ্দ

ব্রিটিশ ভারতের বাস্তিল

অনশন ধর্মঘটে সফলতা ও বিজয়ের পর কঠোর নিয়ন্ত্রণ অনেক শিথিল হওয়ায় আমরা সেলুলার বন্দীশিবিরের অনেক কিছুই ক্রমে ক্রমে দেখতে ও জানতে পারলাম।

৪ নং ও ১ নং ওয়ার্ড ছাড়া বাকি চারটি ওয়ার্ডই রাজনৈতিক বন্দীদের জন্য দেয়া হল। আর ঐ দুটো ওয়ার্ডে রাখা হল তৃতীয় শ্রেণীর সাধারণ কয়েদীদের। রাজনৈতিক বন্দীরা রইলেন দোতলায় আর এক তলা নির্দিষ্ট রইলো সাধারণ কয়েদীদের জন্য।

সমগ্র জেলখানায় বলতে গেলে এখন আমাদের অবাধ গতি; কোন-রকম বাধা-বিঘ্ন নেই।

জেলখানার ভেতরে গেটের সামনে রয়েছে হাসপাতাল। সাইকেলের স্পোক্‌গুলো যেমন করে একটা কেন্দ্রে এসে যুক্ত হয়ে একটা বৃত্ত রচনা করে, আন্দামান সেলুলার জেলখানাও অনেকটা তেমনি। জেলের মাঝখানে রয়েছে সেন্ট্রাল টাওয়ার। এই চারতলা সেন্ট্রাল টাওয়ারে চারদিক থেকে সাতটি তিনতলা ব্লক মিলেছে। মাঝখানের ঐ গোল জায়গাটা অর্থাৎ সেন্ট্রাল টাওয়ারের পরিসর হবে প্রায় ২৫-৩০ হাতের মতো। এখানেই সিপাই, জমাদাররা বসে বিশ্রাম করে। এক ওয়ার্ডের দরজা দিয়ে অন্য ওয়ার্ডে ঢোকার সংযোগকেন্দ্র এটাই। এই কেন্দ্রীয় জায়গাটা গম্বুজের মত সোজাসুজি ওপরের দিকে উঠে গিয়েছে। দোতলা ও তেতলায় তা কেন্দ্রীয় চত্বরের মত—ঐ চত্বর দিয়েই প্রত্যেক তলার ওয়ার্ডগুলোতে যাতায়াত চলে। তবে ওখানে আমাদের যাওয়ার সুযোগ ছিল না।

তেতলার চত্বরের ওপর তলায় ছিল কেন্দ্রীয় টাওয়ার। চারদিক দেয়াল দিয়ে ঘেরা। এখানেই রয়েছে সেন্ট্রি বক্স। আবার এটি ঘণ্টা-ঘরও বটে। ওপর থেকে ঝোলানো ঘণ্টা থেকে প্রতি ঘণ্টায় ঘণ্টা বাজিয়ে সময়-সঙ্কেত দেয়া হত। সেন্ট্রিরাই ঐ দায়িত্ব পালন করতো।

দিন-রাত চব্বিশ ঘণ্টা নিরবচ্ছিন্ন পাহারা চলতো। তবে নির্দিষ্ট সময়ের ব্যবধানে পাহারা বদল হতো। প্রহরীরা দেয়ালের ভেতর দিকে চারপাশে অনবরত টহল দিয়ে ফিরতো। দেয়ালের চারপাশে সারি সারি ছিদ্র ছিল, যেন দরকার হলে দেয়ালের আড়ালে নিরাপদে থেকে ঐ ছিদ্রগুলোর ভেতর দিয়ে মেশিনগান বা রাইফেলের নল বের করে গুলি ছোঁড়া চলতে পারে। ঐ সেলুলার জেলের একমাত্র হাসপাতালের অংশটি ছাড়া, সবগুলো ওয়ার্ডই হলো সেলপুঞ্জ। সেলগুলোর সংখ্যা প্রায় ৭০০-র মতো হবে। পরে অবশ্য ছয় নম্বর ওয়ার্ডের ২০টি সেলকে সংস্কার করে ১০টি সেলে পরিণত করা হয়।

বাংলার জেলখানাগুলোর মতো সেলুলার জেলটিও চারপাশে উঁচু দেয়াল দিয়ে ঘেরা। কিন্তু এ-রকম দীপান্তরের বন্দীশালা ভারতবর্ষে আর কোথাও ছিল না। ঐ জেলখানার বাইরে-ভিতরে সব মিলে ছিল এক নিষ্ঠুর বীভৎস রূপ, তা সবার মনে জাগাতো আতঙ্ক।

ফরাসী দেশে অষ্টাদশ শতকে রাজতন্ত্রের বিরুদ্ধে সাম্য, মৈত্রী ও স্বাধীনতা প্রতিষ্ঠার সংগ্রামের সৈনিকদের যে বন্দীশালাটিতে রাখা হত, তার নাম ছিল বাস্তিল। ঐ বন্দীশালায় কাউকে একবার ঢোকানো হলে তার আর বের হওয়ার আশা থাকতো না। বাইরের মুক্ত আলো-বাতাস ছিল তাদের কাছে স্বপ্ন। অন্ধকার কুঠুরিতে ঐ সব বন্দীর জীবন কাটতো যুগ যুগ ধরে। রোগ, পঙ্গুত্ব, মৃত্যুই ছিল ঐ সব ভাগ্যহত বন্দীদের ললাট-লিখন। তারপর একদিন যেন ভূমিকম্প হল। বিদ্রোহী জনতার পদভারে প্যারিসের তথা সমগ্র ফ্রান্সের মাটি কেঁপে উঠলো। জনতার রুদ্ররোষে ভৈরব নৃত্যের তালে তালে বাস্তিল কারাগার পড়লো ভেঙ্গে চৌচির হয়ে মিশে গেল কালের বাতাসে। সঙ্গে নিয়ে গেল রাজতন্ত্র—ষোড়শ লুইকে খতম করা হল গিলোটিনে।

মনে হল, এই সেই বাস্তিল। ভারতের বাস্তিল। বিস্মৃতির অতল থেকে বিদ্যুৎ-ঝলকের মত জেগে উঠলো লাহোর ষড়যন্ত্র মামলায় দ্বীপান্তরের বন্দী গদর পার্টির অন্যতম বিদ্রোহী এবং অমর শহীদ ভান সিংহের কথা। সামান্য প্রতিবাদ করায় এই সেলুলার জেলে তাঁকে নৃশংসভাবে পিটিয়ে হত্যা করা হয়েছিল। খুব সামান্য ধর্মীয় অধিকার আদায়ের সংগ্রামে মান্দালয় ষড়যন্ত্র মামলার আসামী পণ্ডিত রামরক্ষা এখানে অনশনে আত্মাহুতি দিয়েছিলেন। বার্মা, মালয়, সিঙ্গাপুরে ব্রিটিশ সেনাদলে বিদ্রোহ সংগঠনে শরিক হওয়ায় ১৯১৫ সালে যাবজ্জীবন দীপান্তর দণ্ড দিয়ে তাঁকে আন্দামানের এই বন্দীশালায় পাঠানো হয়। সেখানে তাঁর উপবীত কেড়ে নিতে চাইলে তিনি বাধা দিয়েছিলেন এবং খুবই আহত হয়েছিলেন। তারপর তিন মাস অনশনের পর ১৯১৯ সালে তাঁর মৃত্যু হয়।

শুনেছি আলীপুর ষড়যন্ত্র মামলার অন্যতম আসামী উপেন ব্যানার্জি, বারীন ঘোষ ও উল্লাসকর দত্ত এবং অনুশীলন সমিতির প্রথম যুগের নেতা পুলিন বিহারী দাস ও মহারাজ ত্রৈলোক্যনাথ চক্রবর্তী এবং আরো অনেকেই ছিলেন আন্দামানের এই সেলুলার বন্দীশিবিরে। তাঁরা ছিলেন হয়তো আমাদের চেয়েও আরও নিষ্ঠুরতা, নির্যাতন, সন্ত্রাস ও বীভৎসতার মধ্যে। নির্মম ভ্রূকুটি ও নির্দয় আচরণের মধ্যে তাঁরা দিন কাটিয়েছেন। হয়তো আজো খুঁজলে দেয়ালে দেয়ালে পাওয়া যাবে বন্দীদের অশ্রু, শুকিয়ে যাওয়া রক্তের দাগ। দেয়ালগুলো যদি কথা বলতে পারতো, তবে জেনে নিতাম, তাঁদের প্রতিটি মুহূর্ত এখানে কেটেছে কীভাবে! সঙ্গীবিহীন, বইপত্র-সংবাদপত্র থেকে বঞ্চিত তাঁদের বন্দীজীবন যে কতটা অসহনীয় ছিল, তা অনুমান করে মনে মনে শঙ্কায় কেঁপে উঠি। ভারতবর্ষের জনগণ তখনও অনেক পশ্চাতে; সমর্থন ও সহানুভূতি যদি তাঁরা পেয়ে থাকেন, তবে তা নিতান্তই সামান্য। তাই বন্দীজীবন তাঁদের প্রাণরস নিঙড়ে নিয়েছিলো অনেকখানি। উল্লাসকর দত্ত পাগল হয়ে গিয়েছিলেন। কেউ কেউ হয়েছিলেন পঙ্গু ও রোগগ্রস্ত। অকালে তাঁদের মাথার ওপরে নেমে এসেছিল মৃত্যু। কিন্তু তবুও তাঁরা সেদিন আত্মসমর্পণ করেন নি; নতি স্বীকার করেন নি; মনে মনে তাঁদের উদ্দেশে সালাম, শ্রদ্ধা ও অভিনন্দন জানালাম।

শ্রম, ঘাম আর বন্দীত্বের কথকতা

তিন নম্বর ওয়ার্ডের তেতলার ১২১ নং সেলে থাকতাম আমি। অন্যান্য দিনের মত সেদিনও চোখে পড়লো তেলের ঘানিগুলো। দোতলা ও তেতলা মিলে সবশুদ্ধ ঘানি ছিল ১১৬টা। প্রত্যেক সেলের সামনে দরজার পাশে দেয়ালের সঙ্গে লাগানো ছিল সেগুলো। কয়েদীরা সেলে আটক অবস্থাতেই ভেতর থেকে হাতল ঘুরিয়ে ঘানি চালাতে পারতো। এ-ভাবেই সরিষা পেষার কাজ চলতো। সেলের বাইরে ঘানির সঙ্গে লাগানো বালতিতে তেল এসে জমা হতো। প্রত্যেক কয়েদীকে প্রতিদিন আলাদা আলাদাভাবে নির্দিষ্ট পরিমাণ সরিষা বরাদ্দ করা হত। সকাল সাতটা থেকে বিকেল চারটা পর্যন্ত ঐ সরিষা পিষে তেল তৈরি করতে হতো কয়েদীদের। মাঝখানে শুধু খাওয়ার জন্য সময় ছিল ঘণ্টাখানেক। মনের পর্দায় কল্পনায় ভেসে উঠলো সে-সব দৃশ্য। দেখলাম, কয়েদীরা দিনের পর দিন তিলে তিলে ঢেলে দিচ্ছে নিজেদের শক্তি ঐ ঘানিতে, রক্ত নিঙড়ে নেয়া শ্রমে ও বন্দীত্বের যন্ত্রণায় ক্রমেই তাদের দেহ ভেঙ্গে পড়ছে, একে একে

তারা হয়ে পড়ছে অকেজো। তারপর ছুঁড়ে ফেলে দেয়া হয়েছে তাদের আবর্জনার মত।

মনে পড়ে গেল, আলিপুর জেলের কথা। সেখানকার কয়েদী জীবন যেন অনেকটা দাসযুগেরই গোলামি জীবন। দাসযুগে ছিল মালিকের ইচ্ছাই আইন। আর সেখানে কর্তৃপক্ষের ইচ্ছাই আইন। তবে জেলের আইনের একটা ভরসা—বন্দীকে মেরে ফেলা চলে না আইনত; আবার সাজা শেষে মুক্তি পাওয়া চলে। কিন্তু বাস্তবে দেখা যায়, আইনত মেরে ফেলা না গেলেও নিষ্ঠুর বন্দীজীবনে অনেকেই মৃত্যুর কোলে ঢলে পড়ে। আর মুক্তি যদি মেলে, তবে তা মেলে অনেক মূল্যে—রক্ত, ঘাম, যন্ত্রণা আর অশ্রুর বিনিময়ে। আলিপুর জেলে সরকারের দালালেরা প্রচার চালাতো—কালাপানির জীবন হল এক মুক্ত জীবন; বাইরের আলো-বাতাসে অবাধে বেড়ানো চলে; মাসিক ছয় টাকা করে বেতন পাওয়া যায়; চার-পাঁচ বছর বন্দী জীবন কেটে গেলে দেশ থেকে পরিবার নিয়ে আসা যায় এবং সপরিবারে আরামে থাকা যায়; উপরন্তু পরিবারের জন্য আরও দশ টাকা ভাতা বরাদ্দ হয় ইত্যাদি। শুধু তাই নয়, সেখানে সাত-আট বছর কাটিয়ে দিতে পারলে একেবারে মুক্ত-স্বাধীন জীবন; ইচ্ছে করলে দোকান-পাট, ব্যবসা ইত্যাদি খুলে দিব্যি জীবন কাটিয়ে দেয়া চলে। দালালদের প্ররোচনায় ও ছলনার প্রলোভনে পড়ে অনেক কয়েদী একটুখানি মুক্ত জীবনের আশায় পরিবারসহ বসবাসের রঙিন কল্পনায় বিভোর হয়ে পড়ে। তারা স্বপ্ন দেখে, মাত্র কয়েক বছর কষ্টে-সৃষ্টে কাটিয়ে দিতে পারলে মুক্ত জীবনের অনাবিল আস্বাদ পাওয়া যাবে। স্বপ্নের আকাশে বিচরণ করতে করতে একদিন কালাপানি গমনেচ্ছুদের তালিকায় তারাও নাম লেখায়।

কয়েদী কালাপানি গেল। আইন মোতাবেক মাত্র তিন মাস কাটাতে হবে জেলের ভেতরে; তারপর সে যাবে জেলের বাইরের 'মুক্ত জীবনে'।

জেলে আসার পরদিন থেকেই শুরু হলো ছোবড়া পিটিয়ে আঁশ বের করার কাজ। প্রায় দু'সেরের মতো ছোবড়া বের করার কাজ বরাদ্দ হল। সকাল থেকে বিকেল চারটা পর্যন্ত চললো ছোবড়ার ওপর অনবরত মুগুরের ঘা, হাত দুটো অবশ হয়ে এলো কয়েদীর। তবু কয়েদী ভাবে, আর কয়েকটা দিন কাটাতে পারলেই সে কোন রকমে রেহাই পাবে। বাইরের 'মুক্ত জীবনে' যাওয়ার আশায় তার বুক ফুলে ওঠে। আর সঙ্গে সঙ্গে নতুন উদ্যমে দ্রুত হাতুড়ি চালায় সে।

ঘাম, রক্ত নিঙড়ানো শ্রম দিয়ে বহু কষ্ট সয়ে একদিন দু'দিন করে তিনটি মাস কাটিয়ে দিল সে জেলের ভেতর। কাটিয়ে দিল অনেক আশা নিয়ে, অনেক স্বপ্ন নিয়ে। এবং শেষ পর্যন্ত সে সুযোগ পেল 'মুক্ত জীবন-এ' যাবার।

কিন্তু বাইরের জীবনে এসে কয়েদীতো অবাক! হাড় ভাঙ্গা, রক্ত নিঙড়ানো শ্রম থেকে তারতো মুক্তি হলো না। স্বপ্ন ভেঙ্গে গেলো খান খান করে। তাকে পাথর ভাঙ্গতে হল, দুরমুজ পেটাতে হল। কখনো ছোবড়া পেটানো, কখনো কাঠ চেরাই করা, যখন যেমন—তাদের অমানুষিক পরিশ্রম করতে হল। পেছনে পেছনে রইলো জমাদার। তার শ্যেন-দৃষ্টির সামনে ফাঁকি দেয়ার কোন জো নেই। দুপুর বেলা শুধু একটুখানি কাজের বিরতি। কিন্তু তখনও নিজের হাতে রান্নাবান্নার কাজ সারতে হল তাকে। আবার কাজের পালা হল শুরু।

সন্ধ্যার আগে খাওয়া-দাওয়া সারা হলে আবার তাকে সেলে হতে হল তালাবন্ধ।

এভাবে কিছুদিন কাটলো। ক্রমে মাস শেষ হলে বরাদ্দ করা ছয়টা টাকা তার হাতে এলো। কিন্তু সে টাকাও পুরোপুরি তার নিজের কাজে লাগাবার উপায় নেই। মেহনতের প্রখরতা ও নির্মমতা থেকে একটু শ্বাস ফেলার সুযোগের আশায় ঐ টাকার একটা অংশ নজরানা হিশেবে তুলে দিতে হল জমাদারের হাতে। হয়তো বা অন্যেরাও এর হিস্সা পাবে। যা হোক, এর ফলে একটুখানি রেহাই যে মিললো না, তা নয়। এখন একটু কাজ কম করলে চলে। কিন্তু বরাদ্দ করা ছ'টাকায় পেট যে চলে না! অভাবের তাড়নায় মাঝে মাঝে তাকে উপবাস পালন করতে হয়। তাই মরিয়া হয়ে সে অপরাধ করে বসে। আবার সে জেলের ভেতরে ঢোকে। নিজেকে সে প্রবোধ দেয়—জেলের ভেতরে অন্তত দু'বেলা খাবারতো জুটবে।

হায়রে 'মুক্ত জীবন'!

নতুন করে সাজা হওয়ায় আবার তাকে কঠোর শ্রম করতে হল জেলের ভেতরে। তারপর আবার সে বের হয়ে এল 'মুক্ত জীবন-এ'। কিন্তু আবারও সেই 'মুক্ত জীবন' তার স্থায়ী হয় না, আবার ঢুকতে হয় বন্দী-শালায়। এ-ভাবেই হয়তো চলতে থাকে অচ্ছেদ্য চক্র।

এ-ভাবে কষ্ট আর যন্ত্রণায় কোন রকমে আশায় আশায় বছর চারেক পার হলে পরিবার নিয়ে আসার অনুমতি পেল সে। বাড়িতে সে চিঠি লিখলো আত্মীয়দের কাছে। তাদের কেউ পৌঁছে দিয়ে গেল বৌটাকে। তার মাইনেও বাড়লো আরো দশ টাকা। কিন্তু মোট ষোল টাকা হাতে এলেও অভাব তার ঘুচলো না।

যে বউ নিয়ে এল তার জন্য বরং নতুন এক মুসিবত দেখা দিল। আন্দামানে স্ত্রী-লোকের অভাব। সবার পক্ষে বৌ আনা সম্ভব নয়। অনেকের বৌ আসতেও চায় না। ফলে যার বৌ এল, হয়তো দেখা গেল,

তার বৌ নিয়ে শুরু হয়ে গেল টানাটানি। হয়ত তাকে নিয়ে গেল অন্ত কেউ বা অন্যেরা। স্বামীর গেল বুক ভেঙ্গে। তার সংসার ভাঙ্গলো, স্বপ্নও ভেঙ্গে হল খান খান। সে বুক চাপড়াতে লাগলো, হায়, কেন সে লোভে পড়ে কালাপানিতে এল ; কেন সে আগে বোঝেনি যে, 'মুক্ত জীবন' আসলে মিথ্যে ; বোঝেনি বৌ নিয়ে কালাপানিতে সংসার করা যায় না ; বোঝেনি যে, সে মরীচিকার পেছনেই ছুটেছে।

কোন রকমে যদি আরও কয়েকবছর কাটিয়ে দেয়া গেল, অর্থাৎ সাত-আট বছর, তা হলে সে হল মুক্ত। কিন্তু সেখানে দোকান-পাট করে ব্যবসা করার মোহ ততদিনে তার কেটে গেছে। হয়তো দু-একজন থেকেই গেল, সামান্য ছোটখাট দোকান-টোকান দিয়ে বসলো গত্যন্তর নেই বলে। কিংবা মুক্তি পেয়ে কয়েদী ফিরে গেল নিজ দেশে। আট-নয় বছর পর ফিরলো সে রোগগ্রস্ত হয়ে ; জরাগ্রস্ত, পঙ্গু হয়ে। ধুঁকে ধুঁকে কয়েকটা বছর সে বাঁচলো ; তারপর এক সময় মৃত্যুর কোলে ঢলে পড়লো।

আর ভাগ্য যাদের নিতান্তই সুপ্রসন্ন, কিছুটা স্বাস্থ্য নিয়ে ফিরলো তারা দেশে ; স্বাস্থ্য নিয়ে বাঁচলো তারা আরো কয়েক বছর। এদের সংখ্যা হাতে গোণা।

এই হল কালাপানি। এই হল আন্দামান সেলুলার জেল। এই হল 'ভারতীয় বাস্তিল' কারাগার—কয়েদীদের বাসভূমি, মনুষ্যত্বের এক বিরাট অপমান, বর্বরতার এক চরম নিদর্শন।

অনেক লেখালেখি, অনেক আন্দোলন হয়েছে এই সেটলমেন্ট তুলে দেয়ার জন্য। ব্রিটিশ রাজ জনমতের চাপে বাধ্য হয়েছিল তা তুলে দিতে। কয়েদখানা কয়েক বছর ছিল বন্ধ। বিশেষ করে রাজনৈতিক বন্দীদের আন্দামানে পাঠানো স্থগিত ছিল। কিন্তু সন্ত্রাসবাদী বিপ্লবী আন্দোলনের উত্তুঙ্গ ঢেউ যখন হিমালয়কেও ছাড়িয়ে যাবার উপক্রম হয়েছিল, ব্রিটিশ ভারত যখন টলমল করে উঠেছিল, তখনই আবার আন্দামানের কয়েদী সেটলমেন্টের পুনঃপ্রবর্তন হল। ১৯৩২ সাল থেকে রাজনৈতিক বন্দীদেরকে আবার সেখানে নির্বাসন দণ্ড দেয়া শুরু হল ; তাদেরকে নির্বাসিত করা হল।

ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদ তার বিরুদ্ধে আন্দোলন দমানোর জন্য এই উপযুক্ত জায়গা বেছে নিয়েছে রাজবন্দীদের জন্য। স্বদেশ থেকে বহুদূরে নির্বাসিত করে তারা নিরাপদ থাকতে চায়।

বাংলাদেশের পার্বত্য চট্টগ্রাম ও পাকিস্তানের সীমান্ত প্রদেশের কিছুটা অনুরূপ একটা আনরেগুলেটেড এলাকা এই আন্দামান। ভারতীয় আইন এখানে চলবে না ; ঐ আইনের প্রবেশ এখানে নিষিদ্ধ। এখানে রয়েছে

ভারত সরকারের সরাসরি অধীনে কর্মরত একজন চিফ কমিশনারের একনায়কত্বমূলক শাসন। তার ইচ্ছাই হল এখানকার আইন। অপরাধী বা নিরপরাধীর বিচার এখানে সংক্ষিপ্ত। আপিল চলবে না, আবেদন-নিবেদন চলবে না। বেত্রদণ্ড, ক্রসবার ফেটার্স, ডাণ্ডাবেড়ী, শেকল বেড়ী, খাড়া হাত কড়া, পেছনে হাত কড়া, রাতে হাত কড়া, পেনাল ডায়েট, সেলবাস, খুশিমত সাজা, মৃত্যুদণ্ড—এ সবই হলো কয়েদীদের ভাগ্য লিখন।

কিন্তু অনশনে বিজয় এনে দিয়েছে আশাবাদ। এতো নয় বারীণ ঘোষের আমল। এ হল ১৯৩৩-৩৪ সাল। ঘুমন্ত ভারতের কুম্ভকর্ণের ঘুম ভাঙ্গছে। জেগে উঠছে ভারতের জনগণ। তারাই যে একদিন লণ্ডভণ্ড করে দেবে ব্রিটিশ শাসন, কালের ইতিহাস থেকে যে একদিন মুছে যাবে এই 'ভারতীয় বাস্তিল'—সেই আশায়, সেই স্বপ্নে বুক ভরে উঠলো।

বন্দী শিবিরের বাইরে

তেতলার সেলের ভেতর থেকেই দেখা যেত অসীম সমুদ্র তরঙ্গে তরঙ্গে নেচে চলেছে ঢেউয়ের পর ঢেউ হয়ে—কয়েক হাত মাথা উঁচু করে। আবার কখনো কখনো চোখে পড়তো সমুদ্রের শান্ত মৃদু হিল্লোল; কখনো বা তা নিথর, স্তব্ধ, অনড়, প্রশান্ত। বৈচিত্র্যময় অপরূপ সে-সব দৃশ্য।

এক বৃষ্টির দিনে সেলের বাইরের বারান্দায় দাঁড়িয়ে আছি। দেখলাম, দুরে, বহুদূরে সমুদ্রের জলরাশি আকাশ পর্যন্ত এক বিরাট স্তম্ভের মত মাথা উঁচু করে দাঁড়িয়ে রয়েছে। বড় অদ্ভুত মনে হল। জিজ্ঞেস করে জানতে পারলাম, এর নাম জলস্তম্ভ। কে একজন যেন বললো, এ তুফানের খেলা।

যখনই বারান্দায় এসে দাঁড়াতাম, চোখে পড়তো, মাইল খানেক দূরের পোর্ট ব্লেয়ারের প্রায় মুখোমুখি পাহাড়ের চূড়া নিয়ে খাড়া হয়ে আছে আর একটা দ্বীপ। দুটো দ্বীপের মাঝখান দিয়ে বয়ে গেছে সমুদ্রেরই একটা ফালি। ঐ পাহাড়টার চূড়াতেই রয়েছে চিফ কমিশনারের বাংলো—শ্বেত-শুভ্র দেয়ালগুলোর ওপর সুন্দর ছাউনি বসানো। আর পাহাড়ের বাকি যে অংশটুকু দেখা যায়, তার সবটুকুই সবুজ ঝোপ-ঝাড় আর পত্র-পল্লবে ঢাকা—সাগর আর আকাশের পটভূমিতে সেখানে যেন অপূর্ব এক সৌন্দর্যের সমারোহ। ঐ পাহাড়েরই নিচের দিকে সমুদ্রের গা ঘেঁষে মাইলের পর মাইল দেখা যায় নারকেল গাছের সারি। ঐ পাহাড়টাই হল মাউন্ট হেরিয়েট।

ঐ পাহাড়ময় দ্বীপটা দেখতে দেখতে এক এক সময় মন চলে যেত অতীতের পাতায়। ফিরে যেতাম যেন ১৮৭২ সালের একটা দিনে। ভারতের

বড়লাট লর্ড মেয়ো আন্দামান পরিদর্শন করে ফিরে চলেছেন। ওয়াহাবি আন্দোলনের দীর্ঘমেয়াদী নির্বাসিত বন্দী পাঠান শের আলি একবার পেছনে, একবার পাশে, ঝোপের আড়ালে বাঘের মত গুড়ি মেরে চলেছেন। শিকার বুঝি ফসকে যায়! জোন্সটাউন জেটির কাছে লর্ড মেয়ো জাহাজের সিঁড়ি বেয়ে উঠতে যাবেন, অমনি শের আলি বাঘের মত লাফিয়ে ছুরি বসিয়ে দিলেন লর্ড মেয়োর কলজের মাঝখানে। ভারতের ইতিহাসে সেই প্রথম নিহত হলেন কোন ভাইসরয়। সেখানেই অবশ্য ধরা পড়ে গেলেন শের আলি। কিছুদিনের মধ্যেই ফাঁসিতে প্রাণ দিতে হল পাঠান বীর শের আলিকে।

প্রায় ছ'শো দ্বীপ নিয়ে গড়ে উঠেছে আন্দামান দ্বীপপুঞ্জ। পোর্ট ব্লেয়ার ঘিরে আছে অনেকগুলো দ্বীপ—ইতঃস্তত বিক্ষিপ্ত, নিকোবর পর্যন্ত। নিকোবর দ্বীপপুঞ্জ হল আরো দক্ষিণে, একেবারে ভারত মহাসাগরের মধ্যে। আন্দামানের দ্বীপগুলোর মধ্যে সবচেয়ে উন্নত হল রস দ্বীপ।

সবগুলো দ্বীপই পাহাড় ও টিলাময়—ঝোপ-ঝাড়, গাছ-পালায় ঢাকা। কোন কোনটি ঘন বন-জঙ্গলে পূর্ণ। জঙ্গল পরিষ্কার করে কোন কোন দ্বীপ আবাদ করা হয়েছে। ছ'একটা অংশে লোক-বসতিও দাঁড় করানো হয়েছে। তবে সে-সব লোকালয়ের পাশেই ঘন জঙ্গলের শুরু। সে-সব জঙ্গলেও অবশ্য মানুষ বসবাস করে। তবে তারা সভ্য ছনিয়া থেকে আগতরা নয়, তারা এখানকার আদিবাসী—আদিম মানবের বংশধর এক মানবগোষ্ঠী—অস্ট্রেলীয় মানবের সঙ্গে সম্পর্কযুক্ত। এদের গায়ের রং কালচে—তবে ঘন কালো নয়। বহিরাগতদের লোকালয়ের সঙ্গেও এদের সম্পর্ক গড়ে উঠেছে। এরা লেংটি পরে। আগুনের ব্যবহার জানে। ফলমূল, মাছ-মাংস ছাড়াও কিছু কিছু আধুনিক আহার্যও তাদের জোটে। তারা তীর-ধনুকের ব্যবহার জানে। মৎস্য শিকারেও অভ্যস্ত। ব্রিটিশ সরকার এদের নিশ্চিহ্ন হওয়ার হাত থেকে বাঁচিয়ে রাখার জন্যে এবং সভ্যতার আলো দেখাবার জন্যে মাঝে মাঝে জঙ্গলের ধারে আহার্য-দ্রব্য, কাপড়-চোপড়, লোহা লক্কড় ইত্যাদি রেখে আসে। আদিবাসীরা এসে সে-সব নিয়ে যায়।

আদিবাসীদের আরও একটা গোষ্ঠী আছে এখানে। তবে তারা থাকে গভীর জঙ্গলে। তাদের গায়ের রং ঘোর কৃষ্ণ বর্ণ। সম্ভবত এরা হবে খাঁটি অস্ট্রেলীয়—এরা উলঙ্গই থাকে। কাঁচা ফলমূল, মাছ-মাংস খায়। এদের প্রকৃতি অনেকটা হিংস্র। লোকালয়ের বা আধুনিকতার সঙ্গে এদের কোন সংস্পর্শ নেই। এদের সংখ্যা দিনকে দিন নাকি কমে যাচ্ছে।

আন্দামানে আবাদী জমির পরিমাণ কম। ফসলের মধ্যে কিছু চাল, গম ও ভুট্টা জন্মায়। ফসলের মধ্যে সবচেয়ে বেশি জন্মায় নারকেল, তারপর

পেঁপে। যে-সব তরকারি হয়, তার মধ্যে পুঁইশাকই প্রধান; কখনো কখনো ছু-একটা লাউকুমড়োও হয়। তাই কয়েদীদের ভাগ্যে জোটে। তরকারির মধ্যে ঐ পুঁইশাক; তবে কালে-ভদ্রে কাঁচা পেঁপে। নারকেল প্রচুর জন্মালেও কয়েদীদের কাছে নারকেল খেতে পাওয়া প্রায় স্বপ্নের ব্যাপার। কারণ নারকেল গাছগুলো হল ইজারাদারদেরই একচেটিয়া মালিকানাধীন। ইজারাদাররা সে-সব বিদেশে চালান দিয়ে মুনাফা লোটে। এখানে নারকেলই হল বড়ো রকমের অর্থকরী ফসল। তা'ছাড়া নারকেলের ছোবড়া দিয়ে দড়ি, শাঁস দিয়ে তেল তৈরি হয়। শাঁস দিয়ে ঔষধের মতো কী-একটাও নাকি তৈরি করা হয়ে থাকে।

প্রায় সব ক'টা দ্বীপেই রয়েছে বড়ো বড়ো গাছ। তাই গাছ কাটার প্রয়োজনে একদল কয়েদীকে বানানো হয়েছে করাতী কয়েদী। তাদেরকে দিয়ে গাছ কাটানো, কাঠ চেরানো এবং কাঠের আসবাবপত্র তৈরির কাজ করানো হয়। বন্দীশালার ভেতরে ও বাইরে নারকেলের ছোবড়া দিয়ে দড়ি তৈরির কাজও কয়েদীরা করে। তাদেরকে প্রয়োজনমত নারকেল তেলের ঘানিও টানতে হয়।

পাথর ভেঙ্গে এখানে তৈরি করা হচ্ছে রাস্তা। তা'ছাড়া আরও অন্যান্য কাজের জন্যে এখানে পাথর ভাঙ্গার কাজ চলে। এসব কাজে কয়েদীদের বা মুক্ত হয়ে যাওয়া কয়েদীদেরকে লাগানো হয়। তাদেরকে দিয়ে ক্ষেত-খামারের কাজও কিছু কিছু করানো হয়ে থাকে।

আন্দামানের বন-জঙ্গলে ছোট ছোট অনেকগুলো সুন্দর শহর গড়ে উঠছে। এই শহরগুলো মূলত গড়ে উঠেছে রাজনৈতিক বন্দী কিংবা সাধারণ কয়েদীদের শ্রমে। গড়ে উঠেছে তাদের অনেকের মৃতদেহের স্তূপের ওপর।

পুলিশ, মিলিটারি, অফিস-কর্মচারি, ডাক্তার, দোকানি সব মিলে তখন আন্দামানের লোক সংখ্যা প্রায় সাতাশ হাজারের মত। এদের মধ্যে অর্ধেকের বেশি হল কয়েদী, কয়েদী জীবন থেকে মুক্তি পাওয়া লোক ও তাদের বংশধররা। সে সময়ে--আমাদের বন্দী জীবনকালে—সেখানে বর্মী ও মাদ্রাজী কয়েদীদের সংখ্যাই ছিল বেশি, কিছু ছিল পাঠান কয়েদী।

আন্দামানে আসার সময় আমাদের ইন-চার্জ হয়ে এসেছিল জমাদার লালু সিং। আমাদের তদারকের ভার ছিল তার ওপর। আমাদের সুবিধা-অসুবিধা ইত্যাদি যাবতীয় সমস্যা নিয়ে সে অফিসের সঙ্গে যোগাযোগ রক্ষা করতো। একদিন তাকে জিজ্ঞেস করলাম, 'ক্যা জমাদারজী ইধর গাই কা ছুধ মিলতে নহী (জমাদারজী, এখানে কি গরুর ছুধ পাওয়া যায় না?)?' সে জানালো, 'নেহী জী, ইধর সির্ফ ভৈসাকী ছুধ মিলতে। বহ ছুধ সে ঘি,

মাথ্‌খন উঠাতে হ্যায়। য়ঁহা ভৈসা, ভেড় বৈগরহ জ্যাদা হায়। ভেড়াকা গোস্ত মিলতে, বিকতে' (না মশায়; এখানে কেবল মহিষের দুধই পাওয়া যায়। ঐ দুধ থেকে ঘি, মাখন তৈরি হয়। এখানে মহিষ ও ভেড়া প্রচুর। ভেড়ার মাংস বেচাকেনা চলে)। এই জন্যই আমাদের জন্য মহিষের দুধ ও ভেড়ার মাংস বরাদ্দ ছিল।

এখানকার সাগর বিভিন্ন ধরনের মাছে ভর্তি। অনশনের পর থেকে সপ্তাহে তিন চার বেলা করে মাছ দেয়া শুরু হয়েছিল। অধিকাংশ মাছই একেবারে অচেনা, অদ্ভুত ধরনের। তবে কোন-কোনটা আমাদের দেশের রুই মৃগেলের মতো অনেকটা দেখতে। কতগুলো দেখতে একেবারে দশাসই—আমাদের দেশের মিনি মাছের তুলনায় হাজার গুণ বড়ো—ওজনে প্রায় এক মণ, দেড় মণ হবে। একবার ঐ ধরনের একটা মাছ আমাদেরকে খেতে দেয়া হয়েছিল। কিন্তু খাওয়ার পর কয়েকজন অসুস্থ হয়ে পড়লে সেগুলো বন্ধ করে দেয়া হয়েছিল। কিছু ছোট মাছ ছিল আমাদের দেশের মোলন্দা, পুঁটি, চাপিলা মাছের মত দেখতে। এ-গুলোই খেতে ভালো লাগতো। অন্য মাছগুলো খেতে বিস্বাদ ও দুর্গন্ধময় বলে মনে হত।

আমরা যখন আন্দামানে যাই, তখন বছরে প্রায় ন' মাসই বৃষ্টি হত। বাকি তিনমাস কেবল পাওয়া যেত বৃষ্টি-ছাড়া দিন। আবহাওয়া নাতিশীতোষ্ণ হলেও, ঝোঁকটা ছিল একটু গরমের দিকে। কিন্তু কী আশ্চর্য, আমরা সেখানে থাকতে থাকতেই আন্দামানের আবহাওয়ায় আমূল পরিবর্তন লক্ষ্য করলাম। দেখা গেল, বছরে নয় মাসই রৌদ্রদীপ্ত হয়ে গেছে, আর বৃষ্টি হচ্ছে কেবল তিন মাস—আগের আবহাওয়ার একেবারে ঠিক উল্টোটা। আবহাওয়া আগের চেয়ে বেশ গরম হয়ে গেল—সারা শরীর ঘামে ভিজে যেত; গরমে হাঁসফাঁস করতাম সবাই। অবাক হয়ে ভাবতাম, কেমন করে আবহাওয়ার আমূল পরিবর্তন ঘটে গেল। যুক্তিপূর্ণ জবাব মিলতো না। কেউ কেউ অবশ্য বলতো, জঙ্গল কেটে ফেলার জন্যই বোধহয় বৃষ্টি কমে গেছে। হয়তো তাই হবে; কিংবা অন্য কিছু কারণে। কারণ যাই হোক, শুধু এখনো মনে স্পষ্ট মনে আছে, আন্দামানের আবহাওয়ার সেই বিস্ময়কর পরিবর্তনের কথা।

পনেরো

মুক্তির স্বপ্ন নিয়ে

জেলখানায় কড়াকড়ি কমে যাওয়ার পর থেকে পড়াশোনা যেমন করতাম, তেমনি ব্যায়াম চর্চাও বেশ করতাম। মাঝে মাঝে ভলিবল ও ডেকটেনিস খেলায়ও যোগ দিতাম। হাসপাতালের পেছনে ১নং ওয়ার্ডের সামনে বড় একটা মাঠে নিয়মিত ফুটবল খেলা চলতো। যাবজ্জীবন দ্বীপান্তরের দণ্ডে দণ্ডিতদের নিয়ে 'এ' টিম, 'বি' টিম, 'সি' টিম নামে ফুটবল দল গঠিত হয়েছিল। এ-ছাড়াও লাইফার, বাস্কাম, ভ্যাগাবণ্ড ইত্যাদি অদ্ভুত নাম-ধারী কতগুলো টিম গড়ে উঠেছিল। প্রতিদিন বিকেলে বন্দী-খেলোয়াড় ছাড়াও মাঠে বন্দী দর্শকদের ভিড় জমতো। ফলে খেলাও উঠতো জমে। মাঝে মাঝে লীগ প্রতিযোগিতা হত। যেদিন লীগের খেলা চলতো, সেদিন মাঠ হয়ে উঠতো একেবারে গমগমে। উৎসাহী দর্শকদের গলা-ফাটানো চিৎকার, বাহ্‌বা ধ্বনি আর হাততালিতে মাঠের চারপাশ হয়ে উঠতো সরগরম। ফাইনাল খেলার দিনতো কথাই ছিল না। সবাই যেন হয়ে উঠতো আত্মহারা, আগ্রহে মাতোয়ারা। নামকরা খেলোয়াড়দের মধ্যে ছিলেন বরিশালের নলিনী দাস, এককালে তিনি ছিলেন ইস্ট বেঙ্গল দলের একজন ভালো খেলোয়াড়। আর ছিলেন ময়মনসিংহের 'যুগান্তর' পার্টির নেতৃস্থানীয় সুধীন্দ্র রায় ওরফে খোকা রায়, লোকনাথ বল, ফণীন্দ্র নন্দী, সুবোধ চৌধুরী, নগেন্দ্র সরকার প্রমুখ। ঐ বন্দী জীবনে ফুটবল ছাড়াও ব্যাডমিন্টন, ভলিবল, ডেকটেনিস, পিংপং ইত্যাদি এবং অন্যান্য খেলা নিয়ে প্রতিযোগিতা চলতো।

এ-সব খেলাধুলো ছাড়াও নানারকম শরীর চর্চাও আমরা করার সুযোগ পেয়েছিলাম। বক্সিং, যুযুৎসু, কুস্তি, প্যারালাল বার, হরাইজন্টাল বার, ডন বৈঠক ইত্যাদি নানারকম ব্যায়াম সেখানে নিয়মিত চালু ছিল।

এ-ছাড়াও প্রায়ই লেগে থাকতো ইনডোর গেমস। তাস, পাশা, দাবা হামেশাই খেলা হত বেশি। বেশ কয়েকজন তাস ও দাবার বেশ পারদর্শী

ছিলেন। এ-সব খেলাতেও মাঝে মাঝে যেমন প্রতিযোগিতা চলতো, তেমনি দর্শকরা এসব খেলার মোহে ও আকর্ষণে ঘণ্টার পর ঘণ্টা বসে কাটিয়ে দিতেন।

ঐ সময়ে আর একটা উল্লেখযোগ্য ব্যাপার, ছিল প্যারেড ও ড্রিল—সামরিক কুচকাওয়াজ। আমি প্রথম প্রথম বেশ উৎসাহের সঙ্গে প্যারেড করতাম, পরে অবশ্য ছেড়ে দিয়েছিলাম। প্রথম থেকেই অনন্ত দা' ছিলেন এর উদ্যোক্তা ও প্রাণস্বরূপ। কম্পানি ড্রিল পর্যন্ত করা হত; ব্যাটল ফরমেশন শেখানো হত। শত্রুর মোকাবেলা করতে হলে কীভাবে রেজিমেন্ট নিয়ে এগুতে হয় ও ছড়িয়ে পড়তে হয়, তাও শেখানো হত। প্রথম দিকে কৃত্রিম রাইফেল নিয়ে সামরিক কায়দা-কানুন শেখানো হত। প্যারেডের জন্য আলাদা পোশাকও ছিল। প্রত্যেকের পরনে থাকতো শাদা প্যান্ট ও কোট, পায়ে থাকতো ক্যাম্বিসের শাদা জুতো, কোমরে চামড়ার বেল্ট, বুকে ব্যাচ আঁটা। প্রায় শতাধিক তরুণ যখন মার্চ করে যেত, ব্যাটেল ফরমেশনে এগিয়ে চলতো, তখন কী এক অদ্ভুত উন্মাদনাই না সৃষ্টি হতো! জাগ্রত হতো এক জঙ্গী মনোভাব।

এ-সব নিয়েও আমাদের বন্দী জীবনের দিনগুলো এ-পর্যায়ে অনেকটা আনন্দের মধ্যেই কেটে যাচ্ছিল।

সংবাদ বুলেটিন

জেলখানায় কোন দৈনিক পত্রিকা নেই। ফুলস্কেপ কাগজের এক-অষ্টমাংশ পরিমাপের বিজ্ঞাপনের কাগজের মত চিফ কমিশনারের একটি দৈনিক বুলেটিনে দৈনিক খবরগুলো পেতাম। তবু সেই বুলেটিনের জন্যই আমরা গভীর আগ্রহ নিয়ে উদ্বিগ্নচিত্তে অপেক্ষা করে থাকতাম। স্পেনে ফ্যাসিবাদের বিরুদ্ধে সমাজতন্ত্রী ও কমিউনিস্টদের লড়াইয়ের রক্তাক্ত সংবাদ, চীনে জাপ-বিরোধী ফ্রন্টের খবরাখবর মাঝে মাঝে পেতাম। অন্যান্য খবরের সঙ্গে যদি কোথাও জয়ের কোন খবর পেতাম, তবে হয়ে উঠতাম উৎফুল্ল আর পরাজয়ের সংবাদ পেলে মন হয়ে উঠতো বেদনা ভারাক্রান্ত। মনে হত, সে-সব যুদ্ধ যেন আমাদেরই যুদ্ধ, যেন আমরাই জিতছি বা হারছি। এ-সবের প্রভাব আন্দামানের রাজনৈতিক বন্দীদের জীবনে বেশ গভীরভাবে পড়েছিল। অনন্ত দা এবং সেই সঙ্গে আরো অনেকে স্পেনে জনতার ও আন্তর্জাতিক ব্রিগেডের বীরত্বপূর্ণ সশস্ত্র সংগ্রামে আকৃষ্ট ও মুগ্ধ হয়ে পড়লেন এবং কনসোলিডেশনের খুব নিকটে এসে দাঁড়ালেন। শেষ পর্যন্ত ১৯৩৮ সালের জানুয়ারি মাসে তিনি যখন আলিপুর সেন্ট্রাল জেলে গিয়েছিলেন, তখন নিজেকে বৈজ্ঞানিক সমাজতন্ত্রী বলে ঘোষণা করেছিলেন।

১৯৩৫-৩৬ সালে কংগ্রেস সংগঠন যেমন ভারতবর্ষে গণ-সংগঠনের রূপ নিয়েছিল, তেমনি মুসলিম জনতা, বিশেষ করে মুসলিম মধ্যবিত্ত সম্প্রদায়ের একটা বড়ো অংশ মুসলিম লীগের পতাকা তলে জড়ো হতে শুরু করে। নির্বাচনের পরিপ্রেক্ষিতেই মুসলিম লীগ তখন প্রায় গণ-সংগঠনে পরিণত হবার দিকে পা বাড়িয়েছে। ১৯৩৫ সালের ইণ্ডিয়া এ্যাক্ট অনুযায়ী শাসন-তন্ত্রে দেশীয় রাজ্যগুলো নিয়ে যে ফেডারেল সরকার প্রতিষ্ঠা করার ধারা সন্নিবেশিত ছিল, তার বিরুদ্ধে কংগ্রেস বিরোধিতা করে এবং ঐ ধারা বাতিল না করা পর্যন্ত মন্ত্রিত্বে অংশগ্রহণ করবে না বলে ঘোষণা করে। মুসলিম লীগও ভিন্ন দৃষ্টিভঙ্গি থেকে ঐ ধারার বিরোধিতা করতে থাকে এবং মন্ত্রিত্ব গ্রহণ না করার কৌশল নেয়। অবশেষে বৃটিশ সরকার কংগ্রেস-লীগ বিরোধিতার সামনে নতি স্বীকার করতে বাধ্য হয় এবং ঐ ধারাটি কার্যকর হবে না বলে নিশ্চয়তা দিলে কংগ্রেস ও লীগ প্রাদেশিক সরকার গঠনে রাজি হয়।

১৯৩৭ সালে কংগ্রেস ৭টি প্রদেশে পুরোপুরি সংখ্যাগরিষ্ঠতা লাভ করে এবং সে-সব প্রদেশে মন্ত্রিসভা গঠন করে। লীগ ৪টি প্রদেশে সংখ্যাগরিষ্ঠ হলেও একক সংখ্যাগরিষ্ঠতা পায় কেবল আসাম ও বাংলাদেশে। ফলে এ হু'টি প্রদেশে লীগ মন্ত্রিসভা কায়েম হল।

এরপর দেশজোড়া নতুন শাসন সংস্কার চালু হল। ফলে সুস্থ রাজ-নৈতিক আবহাওয়া সৃষ্টি হওয়ায় দেশে নতুন অনুকূল পরিস্থিতির উদ্ভব হল। আমরা আন্দামানের রাজবন্দীরা বুঝলাম, এই পরিস্থিতিকে আমাদের মুক্তির লক্ষ্যে কাজে লাগাতে হবে। অনুকূল রাজনৈতিক পরিবেশে আন্দামানের দ্বীপান্তরের বন্দীদের মুক্তির প্রশ্নটি দেশবাসীর সামনে তুলে ধরতে পারলে মেয়াদ শেষ হওয়ার আগেই হয়তো দেশে ফেরার একটা সুযোগ এসে যেতেও পারে।

এই প্রেক্ষিতে আমরা অবিলম্বে সকল রাজবন্দীকে মুক্তি দান (Immediate release of all political prisoners), সকল রাজবন্দীর পুনর্বাসন (repatriation), এবং মুক্তি লাভ না করা পর্যন্ত সকল রাজবন্দীকে উচ্চতর ও সমমর্যাদা প্রদান (uniform classification of all political prisoners)—এই তিনটি দাবি নিয়ে আন্দোলনে অগ্রসর হলাম। ১৯৩৭-এর জুলাই মাসে সবাই ঐক্যবদ্ধ অনশন ধর্মঘটে যোগ দিলাম। এবারকার অনশন হল প্রায় পুরোপুরি রাজনৈতিক অনশন। প্রায় হু'শো পঁচাশি জন বন্দী ৩৬ দিন ধরে এই ঐতিহাসিক অনশনে শামিল থেকেছেন।

আন্দামানে আমাদের এই অনশন আন্দোলনের খবর ভারতবর্ষের বিভিন্ন জায়গায় পৌঁছালে আমাদের আন্দোলনকে আরও জোরদার করার জন্যে বাংলার বিভিন্ন জেলখানায় এবং দেউলি ক্যাম্প প্রভৃতি বন্দীশিবিরে আটক রাজবন্দীরা আমাদের সমর্থনে অনশন শুরু করে দিল। সেইসঙ্গে রাজবন্দী-দের দাবি অবিলম্বে মেনে নেয়ার জন্য সরকারকে বাধ্য করার লক্ষ্যে সারা বাংলায় তুমুল গণ-আন্দোলনও শুরু হয়ে গেল। এই আন্দোলনের সামনের কাতারে রইলো ছাত্র-সমাজ। আন্দোলনের ধারায় গড়ে উঠলো জোরদার ছাত্র সংগঠন—ছাত্র ফেডারেশন। শুধু বাংলাদেশ নয়, সারা ভারতবর্ষ কেঁপে টলমল করে উঠলো আন্দোলনের ধাক্কায়। সেই ঢেউয়ের আঘাতে ভারত সরকার হয়ে উঠলো আতঙ্কিত। বাংলার প্রধানমন্ত্রী হক সাহেব ও অন্যান্য নেতা অনশন ভঙ্গ করার জন্যে টেলিগ্রামের পর টেলিগ্রাম পাঠাতে লাগলেন। কিন্তু অনশন ধর্মঘটীরা অনশন চালিয়ে গেলেন। এরপর গান্ধীজী এলেন এগিয়ে। তিনি টেলিগ্রাম করে জানা-লেন, 'সন্ত্রাসবাদ ত্যাগ করেছি'—এই মর্মে বন্দীদের তরফ থেকে ঘোষণা প্রদান করা হলে আমাদের দাবি-দাওয়া আদায় করা তাঁর পক্ষে সহজ হবে। তিনি অনশন ভঙ্গ করার ওপরও জোর তাগিদ দিলেন। কিন্তু তবুও অনশন ভঙ্গ হল না। অবশেষে কমরেড মুজাফ্ফর আহমদের টেলিগ্রাম এসে পৌঁছালে দাবি-পূরণের নিশ্চয়তা সম্পর্কে আমাদের বিশ্বাস হল দৃঢ়তর। আমরা প্রায় ২০০ জন বন্দী পারস্পরিক আলোচনার মাধ্যমে গান্ধীজীর প্রস্তাব মেনে নিলাম। 'সন্ত্রাসবাদ পরিত্যাগ করেছি'—এই মর্মে আমরা আমাদের ঘোষণা টেলিগ্রাম করে দেশবাসীকে জানিয়ে দিলাম গান্ধীজীর মাধ্যমে এবং রাত প্রায় দুটোর সময় সবাই অনশন ভঙ্গ করলাম।

এর তিন মাসের মধ্যেই আমাদের সবাইকে ভারতে ফিরিয়ে নেয়ার ব্যবস্থা হল। ভারতগামী সর্বশেষ গ্রুপটিতে ছিল প্রায় ৫০ জন। তার মধ্যে আমিও ছিলাম।

বিদায় আন্দামান

আন্দামান ত্যাগ করবার মুহূর্তগুলো আজও মনে পড়ে। মনে পড়ে, ঐ ভয়াল, কঠিন, রুক্ষ, অস্পষ্ট লালচে ইটের দেয়ালগুলোর মধ্যে সেলপুঞ্জে আবদ্ধ বন্দীজীবনেও নতুন জীবনের স্পন্দন জেগেছিল; মনোজগতে উন্মেষ ঘটেছিল নতুন চেতনার। স্বপ্ন দেখলাম, ঐ নতুন চেতনা বুঝি একদিন শত সহস্র দল মেলে বিকশিত হয়ে উঠবে, পরিণত হবে এক দুর্বার অপ্রতিরোধ্য শক্তিতে। মনে হল, সত্যিই আন্দামান জন্ম দিয়েছে সত্যিকারের

সাম্রাজ্যবাদ-বিরোধী সৈনিকদের, নতুন শোষণহীন সমাজ গঠনের লক্ষ্যে বীরব্রতী এক অগ্রবর্তী বিপ্লবী বাহিনীর। তাই বাংলায় ফিরে যাওয়ার সেই উৎসাহ-উদ্দীপনাময় মুহূর্তেও কী এক অজানা ব্যথায় মন যেন ভারাক্রান্ত হয়ে উঠলো। আন্দামানের মাটিতে আমার শেষ নিঃশ্বাসটি পরিণত হল দীর্ঘনিঃশ্বাসে। ধীরে ধীরে জাহাজে গিয়ে উঠলাম।

বিদায় আন্দামান, বিদায়!

ষোল

দিন বদলের পালা

বাংলায় ফিরে আসার পর আমরা সকল বিপ্লববাদী বন্দী সমপর্যায়ভুক্ত দ্বিতীয় শ্রেণীর বন্দী হিশেবে গণ্য হলাম বটে, কিন্তু মুক্তি অর্জিত হল না। কয়েকদিন পর মহাত্মা গান্ধী এসে আমাদের সঙ্গে দেখা করলেন। আমরা মুক্ত-জীবনে ফিরে যাবার আকাঙ্ক্ষার কথা তাঁকে জানালাম। কিন্তু, তাঁর কথাবার্তায় রয়ে গেল একটা বড়ো অনিশ্চয়তা। ধারণা হল, মুক্তির পথ সম্ভবত কণ্টকাকীর্ণ।

অবশ্য রাজবন্দী মুক্তির ব্যাপারে সরকারের তরফ থেকে অ্যাডভাইজারি বোর্ড করা হল। ঐ বোর্ডের সুপারিশ অনুযায়ী দু-একজন করে বন্দীদের মুক্তি দেয়াও শুরু হল। এ-ভাবে বেশ কয়েকজন বন্দী মুক্তিও পেল। কিন্তু, যাবজ্জীবন দ্বীপান্তর দণ্ডে দণ্ডিত প্রায় বন্দীরাই ছাড়া পেলেন না।

১৯৩৯ সালের জুলাই মাসে আলিপুর ও দমদম সেন্ট্রাল জেলে রাজ-বন্দীদের আশু মুক্তির দাবিতে আমরা যুগপৎভাবে অনশন ধর্মঘট করলাম। প্রায় তিন সপ্তাহ কেটে যাওয়ার পর মহাদেব দেশাই, প্রফুল্ল ঘোষ, সুরেন্দ্র-মোহন ঘোষ, রবি সেন প্রমুখ কংগ্রেস, যুগান্তর ও অনুশীলন পার্টির নেতা আমাদের দেখতে এলেন। তাঁরা আমাদের জন্য সহানুভূতি জানালেন, আমাদের মুক্তির ব্যাপারে চেষ্টা করার কথা বললেন, কিন্তু কোন নিশ্চয়তা দিতে পারলেন না। ২৯ দিন ব্যাপী অনশন চললো। শেষ পর্যন্ত সুভাষ বাবু ও সোমনাথ লাহিড়ী কিছুটা নিশ্চয়তা দিলেন। তাঁরা কথা দিলেন, আশু মুক্তি দেয়া না হলে রাজনৈতিক বন্দীদের মুক্তির প্রশ্ন নিয়ে বাংলাদেশব্যাপী এমন এক প্রবল আন্দোলন সৃষ্টি করা হবে, যেন সরকার বাধ্য হয়ে সবাইকে মুক্তি দেয়। তাঁদের এই আশ্বাসের ওপর ভিত্তি করে আমরা অনশন ভঙ্গ করলাম।

এর কিছুদিন পর ১ সেপ্টেম্বর থেকে দ্বিতীয় মহাযুদ্ধ শুরু হয়ে গেল। বন্দী মুক্তির প্রশ্নটি হয়ে পড়লো সুদূর পরাহত।

জার্মান বাহিনীর ব্লিৎজক্রিগ আক্রমণে ১৭ দিনের লড়াইতে পোলাণ্ড হল বিপর্যস্ত ও ধরাশায়ী। অল্প কয়েকদিনের যুদ্ধে ফ্রান্সের হল পতন; জার্মান তাঁবেদার ভিসি গভর্নমেণ্ট কায়েম হল ফ্রান্সে। সমগ্র ইউরোপ চলে গেল ফ্যাসিস্ট কবলে। কেবল অসম আকাশ-যুদ্ধ চলতে থাকলো ব্রিটেনের সঙ্গে। সোভিয়েত ইউনিয়নের পশ্চিম সীমান্ত ধরে জার্মান নাজি সৈন্যদল রইল মোতায়েন। ১৯৪১ সালের ২২ জুন আকস্মিক আক্রমণ চালানো হলো সোভিয়েত ইউনিয়নের ওপর। নাজি বাহিনী ঢুকে পড়লো সোভিয়েত ইউনিয়নের শত শত মাইল ভেতরে। বোমার আগুনে শত শত গ্রাম-জনপদ জ্বলে-পুড়ে খাক হলো; পুড়ে গেল শত শত নগর ও শিল্প এলাকা। সমগ্র দুনিয়া হল সন্ত্রস্ত ও আতঙ্কিত—অপরাজেয় জার্মান বাহিনী বুঝি গোটা দুনিয়াকেই পদানত করে ফেলে!

আলিপুর সেণ্ট্রাল জেলে সে-সময় আমাদের দিনগুলো কাটছিল উদ্বেগে, শঙ্কায়। সবেমাত্র আমাদের জন্য দৈনিক পত্রিকা হিশেবে দৈনিক 'স্টেটসম্যান' বরাদ্দ করা হয়েছে। সকাল বেলায় খবরের জন্য উন্মুখ হয়ে বসে থাকতাম। পত্রিকা আসার পর হুমড়ি খেয়ে পড়তাম তার ওপর। শুধু একবার খবর পড়েই আমাদের তৃষ্ণা মিটতো না। বার বার পড়ে তার ওপর আলোচনা করতাম। দৈনিক ঐ পত্রিকাটি তখন আমাদের কাছে নিছক খবরের কাগজ ছিল না, দস্তুরমত অধ্যয়নের বিষয় হয়ে দাঁড়িয়েছিল।

দ্বিতীয় মহাযুদ্ধ শুরু হওয়ার তিন দিনের মধ্যে ভারতীয় প্রতিনিধিদের সঙ্গে কোন আলোচনা না করেই সরকার ভারতকে অন্যতম যুদ্ধলিপ্ত দেশ বলে ঘোষণা করেছিল। এবং তারই প্রেক্ষিতে ভারত রক্ষা আইনের বলে ভারতবর্ষে কেন্দ্রীয় সরকারের শাসন কায়েম হল। কংগ্রেস ব্রিটিশ সরকারের কাছে জানতে চাইলো, ভারতবর্ষের এই যুদ্ধে অংশগ্রহণের পেছনে কী স্বার্থ রয়েছে; এ দেশ স্বাধীন দেশ হিশেবে আচরণ করবে কি না; জনগণের ইচ্ছানুযায়ী পরিচালিত হবে কি না? জবাবে ব্রিটিশ সরকার কথার ম্যারপ্যাচে নঙর্থক ইঙ্গিত দিল।

কংগ্রেস ও ব্রিটিশ সরকারের মধ্যে যখন এসব কূটনৈতিক আলাপ-আলোচনা চলছিল, সে-সময়ে ১৯৩৯ সালের ২ অক্টোবর সাম্রাজ্যবাদী যুদ্ধের বিরুদ্ধে বোম্বাইয়ের নব্বই হাজার শ্রমিক যুদ্ধ ও নির্যাতনের বিরুদ্ধে একদিনের ধর্মঘটে শামিল হয়। সাম্রাজ্যবাদী যুদ্ধ ধ্বংস হোক, স্বাধীন ভারত জিন্দাবাদ, লাল পতাকার জয় হোক, বিপ্লব দীর্ঘজীবী হোক—ইত্যাদি

আওয়াজে সেদিন বোম্বাইয়ের রাজপথ প্রকম্পিত হল। যুদ্ধের বিরুদ্ধে বোম্বের শ্রমিকদের সেদিনকার ধর্মঘট ছিল এক ঐতিহাসিক ঘটনা।

নাজিরা যখন ইউরোপ কব্জা করে অগ্রসর হচ্ছিল, তখন কংগ্রেস ব্রিটিশ সরকারকে এই মর্মে সহযোগিতার প্রস্তাব দেয় যে, ভারতকে স্বাধীনতা দানের অঙ্গীকার করলে কংগ্রেস যুদ্ধে সহযোগিতা করতে রাজি আছে। কংগ্রেসের এই প্রস্তাব ব্রিটিশ ভাইসরয় অস্বীকার করলে গান্ধীজীর নেতৃত্বে ১৯৪০ সালের অক্টোবর মাসে ব্যক্তিগত আইন অমান্য আন্দোলন শুরু হয়। এর পাল্টা ব্যবস্থা হিশেবে সঙ্গে সঙ্গে ব্রিটিশ সরকারও নির্যাতনের পথ বেছে নেয়। প্রায় বিশ হাজার লোককে গ্রেপ্তার করা হল। এমনকি প্রদেশিক ও কেন্দ্রীয় আইন সভার সদস্যবর্গ এবং মন্ত্রীরাও বাদ গেলেন না।

১৯৪২ সালের ৮ মার্চ রেঙ্গুন শহরের পতন হলে ১১ মার্চ ব্রিটিশ পার্লামেন্টে ঘোষণা করা হল যে, শাসনতান্ত্রিক বোঝা-পড়ার উদ্দেশ্যে ব্রিটিশ সরকারের তরফ থেকে ভারতে ক্রিপস মিশনকে পাঠানো হচ্ছে। ক্রিপস মিশন ভারতে আসার পর কংগ্রেস ও লীগ নেতৃবৃন্দের সঙ্গে তাদের আলাপ-আলোচনা চললো। কিন্তু যুদ্ধকালীন পরিস্থিতিতে পূর্ণ ক্ষমতাসহ জাতীয় সরকার গঠনের প্রস্তাবে ক্রিপস মিশন বা ব্রিটিশ ক্যাবিনেটের সমর্থন না থাকায় আলোচনা ব্যর্থ হল। কংগ্রেসের তরফ থেকে বার বার এ প্রস্তাব ওঠানো হল। শেষ পর্যন্ত এই দাবি পুরণ করা না হলে, কংগ্রেস সংগ্রামে অবতীর্ণ হবে—এই মর্মে কংগ্রেসের কার্যনির্বাহী কমিটিতে বিখ্যাত আগস্ট প্রস্তাব পাশ হলে, পরদিনই সকল কংগ্রেস নেতাকে গ্রেপ্তার করা হল।

এর ফলে দিকে দিকে স্বতঃস্ফূর্ত বিক্ষোভের ঢেউ উঠলো। টিয়ার গ্যাস ছোঁড়া হল, গুলিবর্ষণ হল। ৯৪০ জন হল নিহত। আহত হল ১৬৩০ জন। ষাট হাজারের মত লোককে গ্রেপ্তার করা হল এবং বিনা বিচারে আটকে রাখা হল আঠারো হাজার লোককে।

দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের শুরুতে এই যুদ্ধ সম্পর্কে আমাদের ধারণা আর ফ্যাসিবাদী শক্তি সোভিয়েত ইউনিয়ন আক্রমণ করার পর যুদ্ধ সম্পর্কে আমাদের ধারণা ছিল ভিন্নতর। প্রথম দিকে এ যুদ্ধ ছিল সাম্রাজ্যবাদী ব্লকের মধ্যে সাম্রাজ্য ভাগের লড়াই—তা ছিল সাম্রাজ্যবাদী যুদ্ধ। কিন্তু সোভিয়েত ইউনিয়নকে আক্রমণ করায় যুদ্ধের চরিত্র গিয়েছিল বদলে। তা আমাদের দিক থেকে পরিণত হয়েছিল জন-যুদ্ধে—ফ্যাসিবাদ-বিরোধী যুদ্ধে। আমরা মূল্যায়ন করেছিলাম যে, সাম্রাজ্যবাদীদের মধ্যে সবচেয়ে হিংস্র ও যুদ্ধবাজ একনায়কত্বকে, ফ্যাসিবাদী শক্তিকে পরাজিত করে গণতন্ত্র, প্রগতি, শান্তি তথা মানবজাতিকে রক্ষা করা এখন আমাদের নৈতিক দায়িত্ব।

বিভিন্ন দেশের স্বাধীনতা রক্ষা তথা ফ্যাসিবাদের হাত থেকে নিজেদের অস্তিত্ব রক্ষা সবচেয়ে বড়ো প্রশ্ন। তাই আমরা এই যুদ্ধকে জনযুদ্ধ বলে সমর্থন জানালাম।

ঐ সময়ে সুভাষ বসু জার্মান-জাপানের সাহায্য নিয়ে ব্রিটিশের হাত থেকে ভারতবর্ষকে স্বাধীন করার দৃষ্টিভঙ্গি নিয়ে গোপনে প্রথমে জার্মানিতে, পরে জাপানে গিয়ে উঠেছিলেন। তাঁর এই দৃষ্টিভঙ্গি আমাদের সঠিক মনে হয়নি।

যুদ্ধ ক্রমেই ফাসিবাদী আগ্রাসনের রূপ নিচ্ছিল। সোভিয়েত ইউনিয়নের ইউক্রেনের ভেতর দিয়ে যখন জার্মান বাহিনী অভিযান চালিয়ে দ্রুত স্টালিনগ্রাদের দিকে ছুটে চলছিল, ফাসিবাদী জাপানও সে-সময়ে ফিলি-পাইন, ইন্দো-চীন, জাভা-সুমাত্রা, শ্যাম ও ব্রহ্মদেশ ইত্যাদি একের পর এক আক্রমণ করে চলছিল।

ঐ সময়ে আমাকে অন্যান্য কিছু রাজবন্দীর সঙ্গে আলিপুর জেল থেকে ঢাকা সেণ্ট্রাল জেলে নিয়ে আসা হয়। যতদূর মনে পড়ে, সময়টা ছিল ১৯৪২ সাল।

কংগ্রেসের পক্ষ থেকে তখন **'ব্রিটিশ ভারত ছাড়'** আন্দোলন জোরদার রূপ নিয়ে অগ্রসর হচ্ছে। শত শত কংগ্রেস নেতা ও কর্মী গ্রেফতার হচ্ছেন। আন্দোলন ক্রমেই স্তিমিত ও স্তব্ধ হয়ে পড়ছে।

ঐ পরিস্থিতিতে জাপ-বিরোধী সংগ্রামে যোগদানের এবং ঐ সংগ্রামে দেশের কৃষক, শ্রমিক, ছাত্র সাধারণকে সংগঠিত করতে আমাদের সুযোগ দেয়ার জন্যে আমরা আমাদের মুক্তির দাবি জানাই। এরই প্রেক্ষিতে জনাব ফজলুল হক ও জনাব নাজিমুদ্দিন সাহেব আমাদের সঙ্গে দেখা করেন। কিন্তু শেষ পর্যন্ত তাঁরা আমাদেরকে মুক্তি দিতে রাজি হলেন না।

দুর্ভিক্ষের কবলে বাংলাদেশ

জাপানীরা দ্রুত এগিয়ে আসছে। সিঙ্গাপুরে জাপানী বোমায় বিখ্যাত ব্রিটিশ রণতরী প্রিন্স অব ওয়েলস গেল ডুবে। সিঙ্গাপুর, মালয় ও রেঙ্গুনের হল পতন। আকিয়াব ও চট্টগ্রাম সীমান্তে জাপানী বোমা হামলা হল। আসামের কোহিমায় শুরু হল রক্তক্ষয়ী সংগ্রাম। ব্রিটিশও মরিয়া হয়ে লড়াই চালিয়ে যাওয়ার পাশাপাশি সম্ভাব্য জাপানী হামলা মোকাবেলার জন্য প্রস্তুতি নিচ্ছিল।

কিন্তু ভয়াবহ যুদ্ধের প্রেক্ষিতে বাংলাদেশে নেমে এলো দুর্ভিক্ষের করাল ছায়া। অনাহারে, মহামারীতে লক্ষ লক্ষ লোক প্রাণ হারাতে লাগলো।

চালের আকাশ-ছোঁয়া দাম, বাজারে খাদ্য ঘাটতি, মুনাফাখোর ও কালোবাজারিদের দৌরাত্ম্য—সব মিলিয়ে করুণ এক ভয়াবহ পরিস্থিতি দেশকে ঘিরে ধরলো।

দেশপ্রেমিক দলগুলো গ্রামে-গঞ্জে-শহরে লঙ্গরখানা খুলে বিপন্ন অনাহারী মানুষকে বাঁচাবার জন্য আপ্রাণ চেষ্টায় লেগে গেল। আমরা, রাজবন্দীরাও আমাদের বরাদ্দ খাবার থেকে যতটা পারতাম, জেলের বাইরে পাঠিয়ে দিতাম। কিন্তু আমাদের সমর্থন ছিল সীমিত। তাই দুঃখ ও বেদনায় মন আচ্ছন্ন হয়ে থাকতো। সব সময়ই যেন কেমন এক হাহাকার ধ্বনি কানে বেজে আসতো। জেলের ভেতর থেকেই যেন শুনতে পেতাম উপোষী শিশুদের কান্না, একমুঠো ভাতের জন্য বুভুক্ষুর করুণ আর্তনাদ। সর্বনাশা দুর্ভিক্ষে কত প্রাণ যে ধ্বংস হল, তার ইয়ত্তা নেই। লক্ষ লক্ষ গরিব চাষী, জেলে, মজুর, কামার-কুমোর, তাঁতি মৃত্যুর কোলে ঢলে পড়লো। যাঁরা কোনভাবে হয়তো বাঁচলো, তাঁরাও হয়ে পড়লো নিঃস্ব।

১৯৪২ সাল। বাংলাদেশ হয়ে পড়েছিল শ্মশান, হয়ে পড়েছিল গোরস্থান। এক নজিরবিহীন দুঃস্বপ্নের সময় এসেছিল বাংলার বুকে।

যুদ্ধের গতিবিধি

সেই দুঃস্বপ্নের দিনগুলোতে একই সঙ্গে উত্তেজনা ও উৎকণ্ঠায় মন আচ্ছন্ন হয়ে থাকতো যুদ্ধের খবরাখবরে। দিনের বেশ কিছুটা সময় হয়তো ম্যাপ হাতেই কাটিয়ে দিতাম। ম্যাপ দেখে দেখে যুদ্ধের গতিবিধি বোঝার চেষ্টাটা আমাদের অনেককে একেবারে নেশার মতই পেয়ে বসেছিল। এখনও মনের পর্দায় ভেসে ওঠে তার অস্পষ্ট ছবি।

জার্মান বাহিনীর সাঁড়াশী আক্রমণ চলেছে দক্ষিণ রাশিয়ার বুক চিরে চিরে। ভল্গা নদীর তীরে স্টালিনগ্রাদে ইতিহাসের সবচেয়ে এক নির্মম তীব্র রক্তক্ষয়ী সংগ্রাম চলছে। সমগ্র জগৎ বিস্মিত, উৎকণ্ঠিত। প্রতি ইঞ্চি জমিতে মরণপণ বিরামহীন লড়াই, লড়াই চলেছে পথে পথে, প্রান্তরে প্রান্তরে। বোমা-বিধ্বস্ত দেয়ালের আড়ালে, ধ্বংসস্তূপের মাঝখানে, জ্বলন্ত অগ্নিশিখার মধ্যে, রাত্রির অন্ধকারে, আকাশে, শূন্যলোকে। প্রায় তিন মাসে তিন-চতুর্থাংশ স্টালিনগ্রাদ নগরী জার্মান কবলিত। নাজি জার্মানী স্বপ্ন দেখছে, আর অল্প কয়েকদিনের মধ্যেই স্টালিনগ্রাদ এসে যাবে হাতের মুঠোয়। তারপর ককেশাসের বুকের ওপর দিয়ে ইরানের মধ্য দিয়ে তারা এসে পৌঁছাবে প্রাচ্যের মুকুটমণি সমৃদ্ধতম ভারতের রাজধানী দিল্লী নগরীতে। ওদিকে জাপান আসবে এগিয়ে আসামের কোহিমা থেকে

ব্রহ্মপুত্রের তীরে তীরে, বাংলা-বিহারের সুজলা-সুফলা-শস্য-শ্যামলা পরিবেষ্টনের পাশ দিয়ে, এক স্বপ্নময় দেশের মাঝখান দিয়ে ঐ দিল্লী নগরীতে—হাত মেলাবে হিটলার ও তোজো ঐ মহান আকবরের সেকেন্দ্রায়।

কিন্তু সোনার স্বপ্ন মিলিয়ে গেল কর্পূরের মতো। হঠাৎ যেন পাতালের বুক চিরে ভল্গার দু'পাশ দিয়ে যমদণ্ড হাতে মৃত্যুঞ্জয়ী সোভিয়েত বাহিনী নাজি সৈন্যদলকে দলে-পিষে-গুঁড়িয়ে গ্রাস করতে উদ্যত হল। জার্মান জেনারেল পাউলাসের সৈন্যদের তারা ঘিরে ফেললো যেন লৌহ বেষ্টনীর মধ্যে। তাদের আক্রমণ ও আঘাতের পর আঘাতের মুখে জেনারেল পাউলাসসহ তিন লক্ষ সৈন্য আত্মসমর্পণ করতে বাধ্য হল। নাজি জার্মান বাহিনীর মেরুদণ্ড গেল ভেঙে। জাপান স্তব্ধ হয়ে থমকে দাঁড়ালো কোহিমায়।

এরপর জার্মানি পিছু হটতে লাগলো, লেজ গোটাতে লাগলো লণ্ডভণ্ড হয়ে। আর পাল্টা আক্রমণে রাশিয়ার লালফৌজ এগুতে লাগলো মুক্তির বিষাণ বাজিয়ে। তারা সোভিয়েত এলাকা মুক্ত করে এগিয়ে চলল সীমান্ত পেরিয়ে। পোলাণ্ড, রুমানিয়া, বুলগেরিয়া, হাঙ্গেরি, যুগোস্লাভিয়া জেগে উঠলো, উৎফুল্ল জনতার পদভারে কেঁপে উঠলো দেশগুলো। নাজি সৌধ ভেঙে ভেঙে হল গুঁড়ো গুঁড়ো, মুক্তিস্রোত ছুটে চললো দিকে দিকে। লালফৌজ এগিয়ে চললো নাজি বাহিনীর প্রাণকেন্দ্র জার্মানির দিকে। দুর্বার অপ্রতিরোধ্য আঘাতে আঘাতে চৌচির হয়ে গেল ফ্যাসি-বাদের দুর্গ—বার্লিন। বার্লিনের পতন হলে গোয়েবলস্, গোয়েরিং ও হিটলার করলো আত্মহত্যা। পশ্চিম তীর হল নিস্তব্ধ। অব্যক্ত খুশি ও আনন্দে সব ভরে উঠলো।

নাজিবাদের ধ্বংস স্তূপের ওপর পূর্ব ইউরোপের দেশে দেশে জন্ম নিল নতুন ধরনের রাষ্ট্র—জনগণতান্ত্রিক রাষ্ট্র। শ্রমিকশ্রেণীর নেতৃত্বে সমস্ত বিপ্লবী শ্রেণীর বিপ্লবী গণতান্ত্রিক শাসনেরই প্রতিনিধিত্ব করলো এই নতুন ধরনের রাষ্ট্র। একচেটিয়া পুঁজির শাসন আবর্জনার মত ফেলে দিয়ে সামাজিক জীবনের গণতান্ত্রিকীকরণ করে, কৃষিতে কৃষকের স্বার্থে ভূমি সংস্কার করে সমাজতন্ত্রে উপনীত হবার লক্ষ্যে এ-সব দেশ প্রাথমিক পদক্ষেপগুলো গ্রহণ করে অগ্রসর হতে লাগলো।

একদিন পত্রিকায় দেখলাম, আধুনিক বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি ব্যবহার করে মাঞ্চুরিয়ার উত্তর-পশ্চিম সীমান্তব্যাপী গড়া হাজার হাজার মাইল বিস্তৃত জাপানী প্রতিরক্ষা ব্যূহকে গভীর রাতে আক্রমণ করে সেই দুর্ভেদ্য ব্যূহকে ভেঙে গুঁড়িয়ে দিয়ে সোভিয়েত লাল ফৌজ পাহাড়-জঙ্গল-পর্বত ডিঙিয়ে

দুর্বার গতিতে এগিয়ে চলেছে। পরের সংবাদ, দলে দলে জাপানী সৈন্যরা আত্মসমর্পণ করতে লাগলো। অন্যদিকে চীনের মুক্তিফৌজ এগিয়ে এসে হাত মেলালো লাল ফৌজের সঙ্গে। মুক্তি বাহিনী এগিয়ে চললো দুর্বার গতিতে মাঞ্চুরিয়ার দিকে। মাঞ্চুরিয়ার রাজধানী মুকডেনের হল পতন। লালফৌজ ভ্লাডিভস্টক অধিকার করে নিল। অধিকার করলো কয়েকটি দ্বীপ। এবং সে-সময়ে হিরোশিমা-নাগাসাকিতে আমেরিকা আণবিক বোমা নিক্ষেপ করে জাপানী সৈন্যদের মনোবল একেবারে গুঁড়িয়ে দিল।

অন্যদিকে চীনা লালফৌজ এগিয়ে চললো দ্রুত গতিতে। সামনে, পেছনে, পাশে থেকে গেরিলা বাহিনী যোগ দিতে লাগলো মুক্তিফৌজের সঙ্গে। দলে দলে জাপানীরা আত্মসমর্পণ করতে লাগলো। পিকিং, নানকিং, সাংহাই এবং বড় বড় শহরগুলো চীনা মুক্তিফৌজের হাতে এসে পড়লো। চিয়াং কাইসাক-এর সৈন্যরাও এগিয়ে যাচ্ছিলো শহরের পর শহর দখল করে। অবশ্য তাদের লক্ষ্য ছিল আমেরিকান সাম্রাজ্যবাদীদের সঙ্গে হাত মিলিয়ে সরকার গঠনের। কিন্তু চীনা মুক্তিবাহিনীর দুর্বার গতির কাছে তারা হাল ছেড়ে পিছিয়ে পড়লো। অপরাজেয় মুক্তিবাহিনী শেষ পর্যন্ত জাপানের রাজধানী টোকিও অধিকার করে নিল। জাপান আত্মসমর্পণ করলো মিত্রশক্তির কাছে। এবং এ-ভাবেই বিশ্বযুদ্ধের অবসান হলো।

দিকে দিকে বিদ্রোহের বহ্নিশিখা

ফ্যাসিবাদের বিরুদ্ধে বিশ্বজোড়া মুক্তিযুদ্ধের বিজয়ে যেমন সমগ্র বিশ্ব আলোড়িত হয়, তেমনি ভারতেও তার প্রভাবে শুরু হয় এক দুর্বার আলোড়ন।

ভারতের মুক্তিপ্রয়াসে সুভাষ বোস গঠন করেছিলেন আজাদ হিন্দ ফৌজ। ঐ ফৌজ ব্রহ্মদেশের আকিয়াবে এবং ব্রহ্মদেশ সীমান্তবর্তী আসামের কোহিমায়—ভারতের দ্বারদেশে প্রতীক্ষারত ছিল। জাপানের পরাজয়ের ফলে আজাদ হিন্দ ফৌজ বন্দী হল ইংরেজদের হাতে। ঐ ফৌজে ছিল শিখদের সংখ্যাধিক্য। তাছাড়া ব্রহ্মদেশে বসবাসকারী ভারতীয় নাগরিকদের অনেককেই আজাদ হিন্দ ফৌজে সংগঠিত করা হয়েছিল। তাদের যখন ভারতের রাজধানী দিল্লীতে নিয়ে আসা হয়, তখন ভারতবাসী তাদের জানায় আন্তরিক শুভেচ্ছা।

এরপর আজাদ হিন্দ ফৌজের অন্তর্ভুক্ত সামরিক নেতৃবৃন্দের বিচারের চেষ্টা করতেই জনতার দেশপ্রেমের বহ্নিশিখা দাউ দাউ করে জ্বলে ওঠে। গণ-আন্দোলনের জোয়ার ব্রিটিশ সরকারের ভারতীয় সেনাবাহিনীতেও শুরু হয়েছিল।

১৯৪৬ সালের ১৮ ফেব্রুয়ারি নৌ-বিদ্রোহ দেখা দিল। ১৯ ফেব্রুয়ারিতে নৌ-বাহিনীর উপকূলবর্তী বারটি প্রতিষ্ঠানের বিশ হাজার নৌ-কর্মচারি ও পোতাশ্রয়স্থ ২০টি জাহাজ বিদ্রোহে যোগ দেয়। সে-সময়ে বিমান বাহিনীর পাইলট ও ভূপৃষ্ঠ-কর্মচারিদেরও ধর্মঘট চলছিল।

খবর আসতে লাগলো, নৌ-বিদ্রোহ ছড়িয়ে পড়ছে দিকে দিকে। ছড়িয়ে পড়লো মাদ্রাজে, ভিজাগাপত্তম নৌ-ঘাঁটি ও পোতাশ্রয়ে। যুদ্ধজাহাজ 'হিন্দুস্থান অব করাচি' এবং 'নর্মদা' সশস্ত্র সংঘর্ষে জড়িয়ে পড়লো।

মনে পড়ে গেল, রাশিয়ায় ১৯০৫ সালে কৃষ্ণ সাগরে যুদ্ধ-জাহাজ পটেমকিনে বিদ্রোহের কথা। মনে পড়লো, ১৯১৭ সালে যুদ্ধ-জাহাজ 'অরোরা' থেকে ক্ষমতাগ্রহণের ইঙ্গিত প্রদানের কথা ও সেই অনুসারে জারের শীত প্রাসাদে গোলাবর্ষণের ঘটনা আরো মনে পড়লো, জার্মান বিপ্লবের পদধ্বনি হিশেবে কীল নৌ-ঘাঁটিতে বিদ্রোহের ঘটনা। মনে মনে অত্যন্ত আশাবাদী হয়ে উঠলাম। মনে হল, ভারতেও বিপ্লব আসন্ন। নৌ-বিদ্রোহ তারই ইঙ্গিত। অবাক্ত এক আনন্দে মন ভরে উঠলো।

নৌ-বিদ্রোহের সমর্থনে কংগ্রেস তিন-রঙা পতাকা নিয়ে, মুসলিম লীগ অর্ধচন্দ্র খচিত পতাকা নিয়ে, গিরনী কামগর ইউনিয়ন ও ট্রেড ইউনিয়ন লাল পতাকা নিয়ে মিছিলে নামলো। 'জয় হিন্দ', 'বিপ্লব দীর্ঘজীবী হোক', 'হিন্দু-মুসলমান এক হও', 'আজাদ হিন্দ ফৌজের সদস্য ও রাজবন্দীদের মুক্তি দাও', 'নৌবিদ্রোহীদের দাবি মানতে হবে', 'ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদ ধ্বংস হোক', 'ইন্দোনেশিয়া থেকে ভারতীয় সৈন্য ফিরিয়ে আনো'—ইত্যাদি শ্লোগানসহ মিছিলের পর মিছিলে সমবেত হয়ে হাজার হাজার লোক এগিয়ে যেতে থাকে।

অবস্থা বেগতিক ভেবে ব্রিটিশ সরকার গুলি চালানোর আদেশ দেয়। কিন্তু ভারতীয় সৈন্যরা গুলি চালাতে অস্বীকার করে। তখন ব্রিটিশ সৈন্য তলব করা হয়। ক্যাসেল ব্যারাকের সামনে সাত ঘণ্টা ধরে লড়াই চললো। ব্রিটিশ সরকার তার সমস্ত সশস্ত্রবাহিনীকে ভারতীয় নৌ-সেনাদের বিরুদ্ধে লেলিয়ে দিল। এর বিরুদ্ধে বিদ্রোহী নৌ-বাহিনীর ধর্মঘট কমিটি সাধারণ ধর্মঘট ও হরতাল পালনের জন্য সমগ্র জনতার কাছে আহ্বান জানালো।

এ-ব্যাপারে কংগ্রেস ও মুসলিম লীগ নেতৃত্বের বিরোধিতা দেখা গেল। কিন্তু তা সত্ত্বেও বোম্বের ট্রেড ইউনিয়ন ও কমিউনিস্ট পার্টি— এক কথায় শ্রমজীবী সাধারণ মানুষ ব্যাপক হারে নৌ-বিদ্রোহের সমর্থনে এগিয়ে এলো। ফলে বেপরোয়া হয়ে ব্রিটিশ সামরিক বাহিনী ও পুলিশ দল গুলিবর্ষণ শুরু করে দিল। তিন দিন ধরে গুলিবর্ষণ চললো। এবং এর ফলে শত শত লোক আহত ও নিহত হল।

পরিস্থিতি অত্যন্ত সংকটজনক হয়ে উঠলো। এই অবস্থায় 'বিদ্রোহীদের কোনরকম সাজা দেয়া হবে না'—এ-রকম নিশ্চয়তার শর্তে এবং কংগ্রেস ও মুসলিম লীগের সমর্থন পেয়ে 'ব্রিটিশের কাছে নয়, ভারতীয় জনতার কাছে আত্মসমর্পণ' করার কথা ঘোষণা করলো।

দুঃখ, বেদনা ও হতাশায় মন ভরে গেল। নৌ-বিদ্রোহ এগিয়ে যাওয়ার পথ স্তব্ধ করে দেয়া হল।

কিন্তু বিদ্রোহ থেমে গেলে কি হবে, ভারতের দিকে দিকে আন্দোলন অব্যাহত রইলো। ধর্মঘট চলতে থাকলো। ভিয়েতনাম দিবস পালিত হল। পালিত হল রশিদ আলী দিবস। লক্ষ লক্ষ লোকের মিছিল ও শোভাযাত্রা চলতে থাকলো।

কলকাতার রাস্তায় রাস্তায় চললো গুলিবর্ষণ। টিয়ার গ্যাস ছোঁড়া হল মিছিলের ওপর। আহত ও নিহত হল অনেকে। কলকাতার রাজপথ রক্তে লাল হল। প্রতিহিংসা নেয়ার জন্য ভারত গর্জে উঠলো।

নৌ-বিদ্রোহ শুরু হওয়ার পর দিনই ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদের প্রতিনিধি শ্রমিক দলের নেতা মেজর এটলি ভারতে কেবিনেট মিশন পাঠাবার কথা পার্লামেন্টে ঘোষণা করলেন। এই ঘোষণায় উচ্চ শ্রেণী থেকে আগত কংগ্রেস ও লীগ নেতৃবৃন্দের মনে আশার বাতি জ্বলে উঠলো। তাঁরা আন্দোলনের চেয়ে দর কষাকষি করে স্বাধীনতা লাভের চেষ্টায় উদগ্রীব হয়ে উঠলেন।

কেবিনেট মিশন এল। কংগ্রেস ও লীগের নেতৃবৃন্দ ঐক্যবদ্ধভাবে সাম্রাজ্যবাদের মোকাবেলা না করে আলাদা আলাদাভাবে নিজেদের দাবি-দাওয়া আদায়ের জন্য দেন-দরবার ও দর কষাকষি শুরু করে দিলেন। কেবিনেট মিশনের কাছে এই অনৈক্য ধরা পড়ে গেল। এই দুর্বলতার সুযোগ নিয়ে তারাও শুরু করে দিল রাজনৈতিক খেলা।

অবশেষে মুক্তিলাভ

ইতিমধ্যে ১৯৪২ সালের আন্দোলনে আটক সব রাজবন্দী মুক্তি পেয়েছিলেন। কিন্তু যাবজ্জীবন কারাদণ্ডে দণ্ডিত আমাদের প্রায় সকলেরই ষোল বৎসর জেলখানায় কেটেছে। সাধারণত বার বৎসর মেয়াদ খাটা হলে মুক্তিলাভের সুযোগ আসে। কিন্তু আমাদের বেলায় সেটা হল না। যুদ্ধ শেষ হওয়া সত্ত্বেও ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদ আমাদের মুক্তি দিল না।

মার্চ মাসে ভারতব্যাপী সাধারণ নির্বাচনে কংগ্রেস বিজয়ী দল হিশেবে বেরিয়ে এল। দ্বিতীয় বিজয়ী দল হিশেবে বেরিয়ে এল মুসলিম লীগ। কমিউনিস্ট পার্টি প্রথমবারের মত আটটি আসনে জয়ী হল।

মনে হয়, ভারতের বিপ্লবাত্মক পরিস্থিতি ও কংগ্রেসের ঐতিহাসিক বিজয় লাভের ফলে আমাদের মুক্তির পথ অনেকটা সুগম হয়ে উঠলো।

নতুন পরিস্থিতিতে জনমত আমাদের মুক্তির পক্ষে থাকায় ব্রিটিশ সরকার দু-একজন করে বন্দীদের মুক্তি দিতে লাগলো। আসন্ন মুক্তির আশায় দিন গুণছিলাম। জেলখানায় আর সময় কাটছিল না। এই বুঝি মুক্তির খবর আসবে—এ-আশায় সবসময় অধীর হয়ে রইলাম।

হঠাৎ ২৩ জুন সকাল বেলা ডেপুটি জেলার এসে খবর দিলেন, মুক্তির নির্দেশ এসেছে; আমি, হরিপদ ভট্টাচার্য ও বিনয় দে যেন তৈরি হয়ে থাকি।

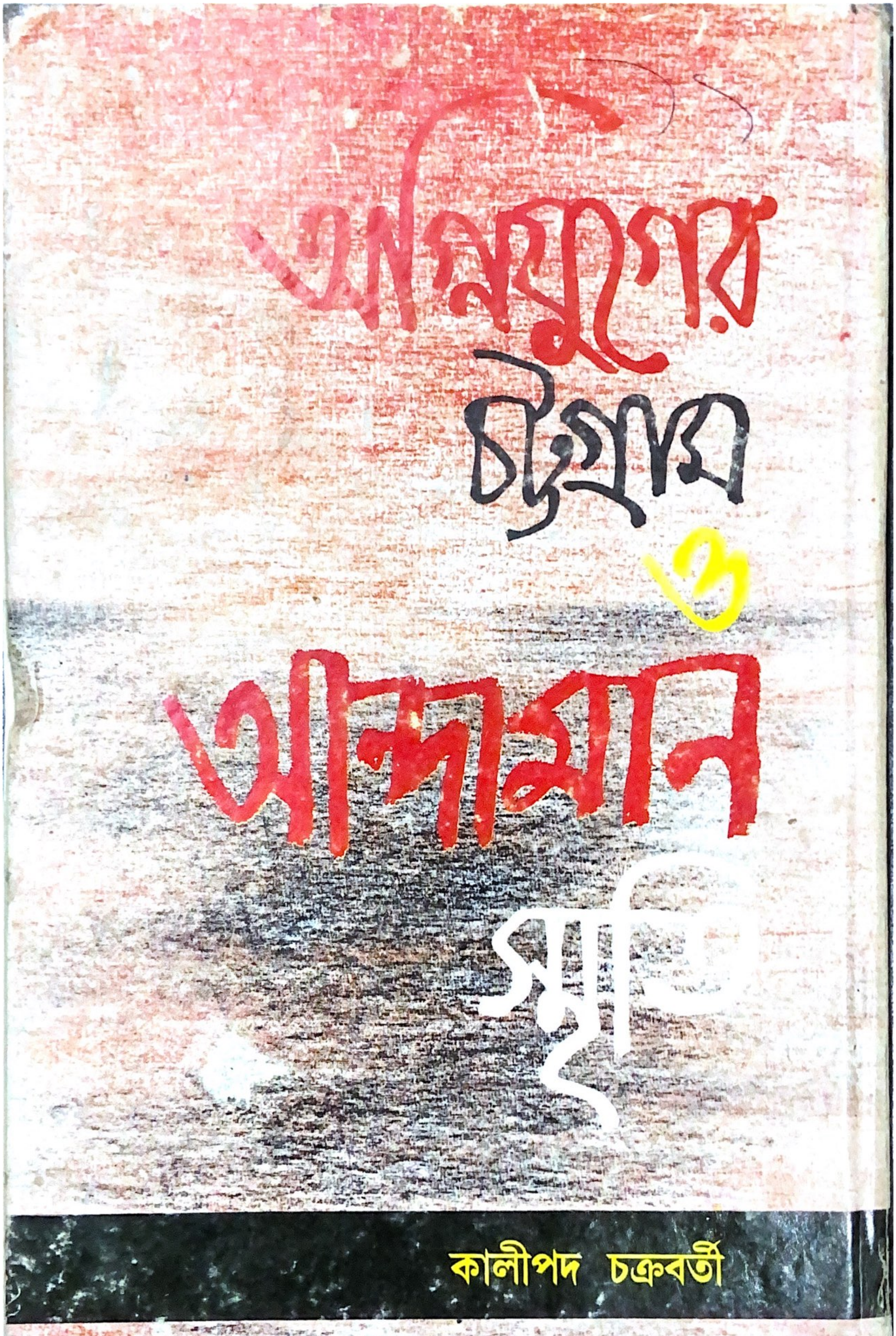
আনন্দে মন ভরে গেল। যাক, তা'হলে সত্যিই এই বন্দীশিবির থেকে বাইরে বের হবার সুযোগ পাব। বাইরের মুক্ত আকাশে বুক ভরে নিঃশ্বাস নিতে পারবো। আত্মীয়-স্বজন, বন্ধু-বান্ধব সবার সঙ্গে আবার দেখা হবে। আহ্ মুক্তি! সে যে কী আনন্দের! কত যে আকাঙ্ক্ষার!

কিন্তু যতই মুক্তির ক্ষণ এগিয়ে আসতে লাগলো, ততই কি যেন এক অজানা ব্যথা ক্রমে মনকে আচ্ছন্ন করতে লাগলো। এতকাল যাঁদের সঙ্গে কাটিয়েছি, তাঁদেরকে ফেলে রেখে যেতে হচ্ছে বলে মনে কেমন যেন দুঃখবোধ জেগে উঠলো। তা'ছাড়া, প্রায় দেড় যুগ পরে বাইরের পরিবর্তিত নতুন এক অবস্থার মধ্যে পড়তে যাচ্ছি, সেখানে কতটা নিজেকে খাপ খাইয়ে নিতে পারবো—এসব ভেবে মনে মনে উদ্বিগ্নও হলাম।

আমরা তৈরি হয়েই ছিলাম। একসময় জমাদার আমাদের নিয়ে যাওয়ার জন্য এলো। আমরা একে একে সকলের কাছ থেকে বিদায় নিলাম।

অবশেষে দীর্ঘ প্রতীক্ষিত মুক্তি এলো। দীর্ঘ ষোল বছর পর বৈজ্ঞানিক সমাজতন্ত্রে বিশ্বাসী একজন নতুন মানুষ হিশেবে এক নতুন পরিস্থিতিতে বাইরের জগতে বেরিয়ে এলাম।

——


অগ্নিযুগের চট্টগ্রাম ও আন্দামান স্মৃতি
কালীপদ চক্রবর্তী